চার্লস ডারউইন

ডিসেন্ট অফ ম্যান

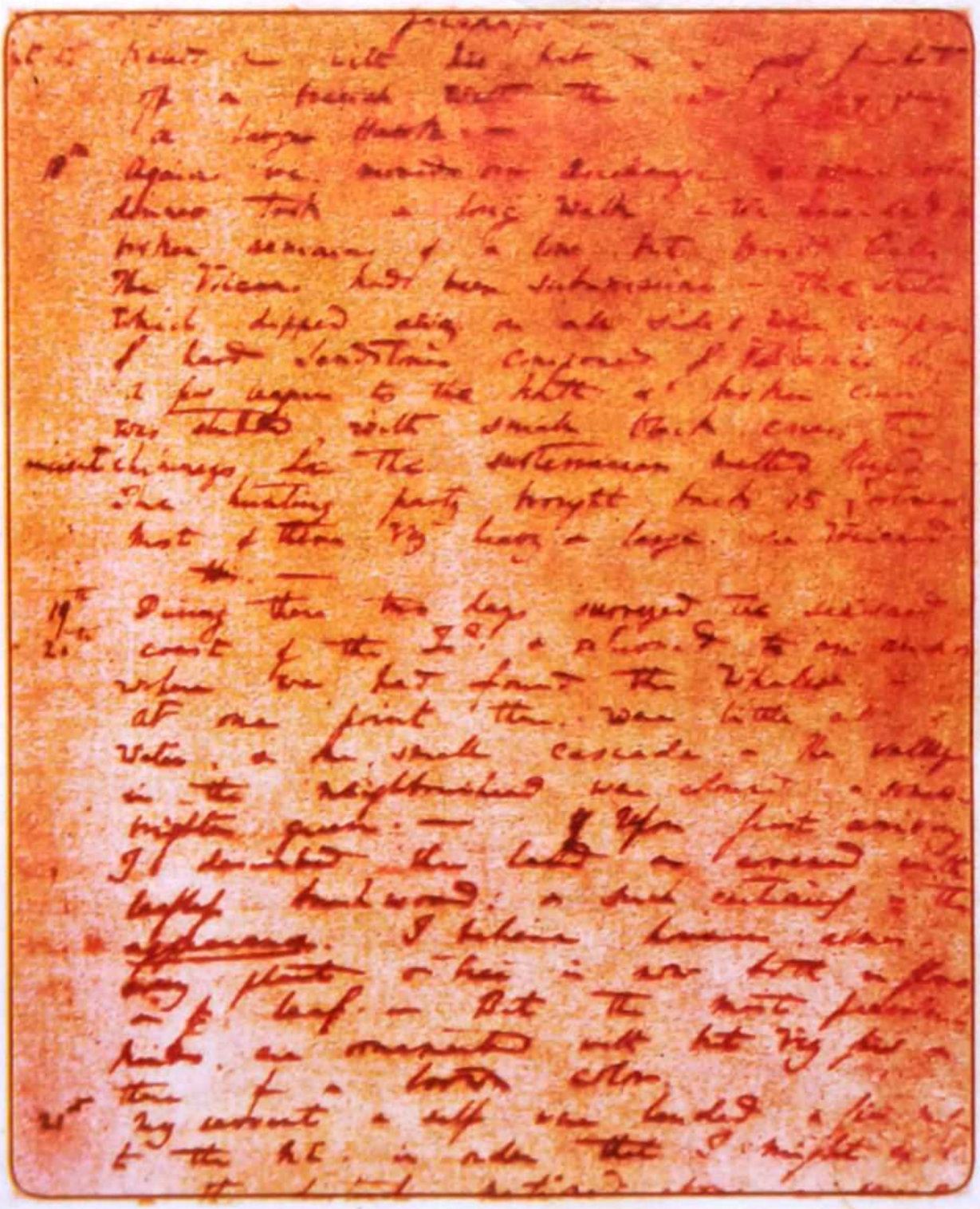

ডিসেন্ট অফ ম্যান

❑ দ্বিতীয় খণ্ড ❑

যৌন নির্বাচন

প্রথম ভাগ ▯ দ্বিতীয় ভাগ

ডিসেন্ট অফ ম্যান

□ দ্বিতীয় খণ্ড □

যৌন নির্বাচন

প্রথম ভাগ □ দ্বিতীয় ভাগ

ভাষান্তর

অসীম চট্টোপাধ্যায়

দীপায়ন □ ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট □ কলকাতা-৭০০০০৯

DESCENT OF MAN
AND
SELECTION IN RELATION TO SEX
by
CHARLES R. DARWIN
First Published : 1871
VOLUME II
Part I & Part II

প্রথম অনূদিত সংস্করণ ▯ প্রথম ভাগ ▯ আষাঢ় ১৪০৪ ▯ দ্বিতীয় ভাগ ▯ আষাঢ় ১৪০৫
তৃতীয় যুক্ত সংস্করণ ▯ মাঘ ১৪১৭ ▯ ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রকাশক ❑ দীপায়ন ❑ ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট ❑ কলকাতা-৭০০০০৯
মুদ্রাকর ❑ তনুশ্রী প্রিন্টার্স ❑ ২১বি, রাধানাথ বোস লেন ❑ কলকাতা-৭০০০০৬
প্রচ্ছদপট ❑ সন্দীপন ভট্টাচার্য
দূরভাষ ❑ ২২৪১-৪১৫০ ❑ E.mail : deepayan07@gmail.com

একশত ষাট টাকা

পিতামহ

ইরাসমাস ডারউইন

প্রকাশনা প্রসঙ্গে

চার্লস ডারউইনের 'ডিসেন্ট অফ ম্যান' বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ অবশেষে প্রকাশিত হল। এই বইয়ের প্রথম খণ্ডের বাংলা অনুবাদ পূর্বেই প্রকাশ করেছি আমরা। উভয় বাংলারই পাঠকসমাজের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে সে-বই। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশের পর অতিক্রান্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি বছর। এই বছরগুলিতে উভয় বাংলার ডারউইন অনুরাগী পাঠকবৃন্দ বারবার আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন—দ্বিতীয় খণ্ডটি কবে প্রকাশিত হবে। মূল ইংরেজি বইটি সংগ্রহ করতে দেরি হওয়ার কারণে ও আমাদের নানান সীমাবদ্ধতার জন্য এতদিন দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশ করে উঠতে পারিনি। অবশেষে প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভবপর হল।

'ডিসেন্ট অফ ম্যান'-এর প্রথম খণ্ডের মতো এই দ্বিতীয় খণ্ডটিও আলোচনার দিক থেকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ। এই খণ্ডে ডারউইন আলোচনা করেছেন যৌন নির্বাচন নিয়ে। এই খণ্ডটির দু'টি ভাগ। প্রথম ভাগে বিভিন্ন ধরনের পশু, পাখি, মাছ, কীটপতঙ্গ ও মানুষের জীবনে ও বিবর্তনে যৌন নির্বাচন কীভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, বিভিন্ন ধরনের প্রাণীদের শরীরে প্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহের পাশাপাশি অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী, এমনকী কীটপতঙ্গের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যগুলি কীভাবে প্রভাবিত করে চলে তাদের জীবনচক্র ও ক্রম-বিবর্তনকে—সবটুকুই আলোচনার পরিধির মধ্যে আনার চেষ্টা করেছেন ডারউইন। মানুষের প্রসঙ্গও মাঝেমধ্যে এসেছে, তবে এই ভাগের মূল আলোচনা মানুষকে ঘিরে নয়। দ্বিতীয় ভাগটি মূলত আলোচিত হয়েছে মানুষের যৌন নির্বাচন নিয়ে।

'ডিসেন্ট অফ ম্যান'-এর তৃতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদও খুব দ্রুতই প্রকাশের চেষ্টা করছি আমরা, এই খণ্ডে জীবজন্তু ও পাখিদের যৌন-নির্বাচনের বিষয়টা এসেছে।

এই খণ্ডটির অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যাপারে নানাভাবেই সাহায্য করেছেন শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা। তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ। সেইসঙ্গেই উল্লেখ করা দরকার উভয় বাংলার পরিচিত-অপরিচিত অসংখ্য পাঠক-পাঠিকাদের কথা, যাঁদের ঐকান্তিক আগ্রহ ছাড়া এ-বই প্রকাশ করা সম্ভবপর হত না।

জুলাই ১৯৯৮

প্রকাশক

❑ মুখবন্ধ ❑

কীভাবে বইটা লেখা হল, সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলে নিলে এই কাজটির প্রকৃতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। বেশ কিছু বছর যাবৎ আমি মানুষের উদ্ভব বা বিবর্তন সম্পর্কিত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করছিলাম, এখনই সেগুলোকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করব এমন কোনও সদিচ্ছা থেকে নয়, বরং প্রকাশ করার অনিচ্ছাই ছিল তখন। কারণ আমি জানতাম এর ফলে আমার মতবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক শোরগোল তোলা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আমার মনে হয় 'অরিজিন অফ স্পিসিস' বইটির প্রথম সংস্করণে এটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট ছিল যে এই বইটিতে 'মানুষের উদ্ভব ও তার বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে' এবং তার অর্থ হল পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির আবির্ভাবের রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে যে-কোনও সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মানুষকেও অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে একই তালিকাভুক্ত করতে হবে। কিন্তু সম্প্রতি এ ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা দিয়েছে। যখন কাল ফখ্‌ৎ-এর মতো একজন প্রকৃতিতত্ত্ববিদ ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে জেনেভার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনের সভাপতি হিসেবে খানিকটা ঝুঁকি নিয়েই বলেন যে, 'অন্তত ইউরোপে কেউ আর এখন বিশ্বাস করে না যে সমস্ত প্রজাতির জীব পৃথকভাবে সৃষ্টি হয়েছে,' তখন এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রকৃতিতত্ত্ববিদদের অন্তত একটি বড় অংশই এখন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন একটি প্রজাতি হল অন্য একটি প্রজাতিরই রূপান্তরিত উত্তরাধিকারী। বিশেষত নবীন এবং উদীয়মান প্রকৃতিতত্ত্ববিদদের ক্ষেত্রে এ-কথা আরও বেশি করে সত্য। অনেকের কাছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের (natural selection) মতবাদটি সমাদৃত হলেও কেউ কেউ জোর দিয়ে বলছেন, আমি নাকি এটার ওপর বড় বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছি। বিচারকর্তা হিসেবে শেষ সিদ্ধান্ত অবশ্য ভবিষ্যৎই টানবে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অভিজ্ঞ এবং সম্মানীয় ব্যক্তিরা এখনও পর্যন্ত সবরকমে বিবর্তনতত্ত্বের বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছেন।

অধিকাংশ প্রকৃতিতত্ত্ববিদ কর্তৃক এই মতবাদটি গৃহীত হওয়ার ফলে (সব ব্যাপারের মতো এক্ষেত্রেও শেষপর্যন্ত যাঁরা বিজ্ঞানী নন তাঁরাও ব্যাপারটা মেনে নেবেন) আমি আমার সংগৃহীত তথ্যগুলি সাজিয়ে নিলাম, যাতে দেখতে পারি আমার আগেকার রচনার সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি মানুষের ক্ষেত্রে কতখানি প্রযোজ্য। এটা করার দরকারও ছিল,

কারণ আমি কখনও কোনও-একটি বিশেষ প্রজাতির ওপর আলাদাভাবে এই মতবাদ প্রয়োগ করে দেখিনি। আমরা যখন কোনও-একটি প্রজাতির ওপর আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করি, তখন প্রকৃতির সংযুক্তি-প্রবণতা থেকে উদ্ভূত জোরালো যুক্তিগুলি এসে আমাদের চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটায়। এই সংযুক্তি-প্রবণতা জীবজগতের সমস্ত বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে—যেমন অতীত ও বর্তমান সময়ে তাদের ভৌগোলিক বিভাজন এবং তাদের ভূতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার। আমাদের দৃষ্টির সান্নিধ্যে এসে পড়া কোনও প্রজাতি—তা সে মানুষ বা অন্য প্রাণী যা-ই হোক না কেন—তাদের গঠনের সাদৃশ্য, ভ্রূণের বিকাশ ও প্রাথমিক পর্যায়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সবকিছুই বিচার করে দেখা উচিত। তবে আমার মনে হয় এই সুপ্রচুর তথ্য এখন সুস্পষ্টভাবেই বিবর্তনবাদের ভিত্তিকে জোরদার করে তুলেছে। একই সঙ্গে বিবর্তনের সপক্ষে অন্যান্য তথ্য থেকে পাওয়া জোরালো যুক্তিগুলিও মনে রাখতে হবে।

এই বইটির মুখ্য উদ্দেশ্য হল এটা বিচার করে দেখা যে, প্রথমত, মানুষ অন্যান্য সমস্ত প্রজাতির মতো পূর্বোদ্ভূত কোনও জীব থেকে সৃষ্ট কি না ; দ্বিতীয়ত, কীভাবে তার ক্রমোন্নতি ঘটেছে; এবং তৃতীয়ত, মানুষের তথাকথিত জাতিগুলির মধ্যে পার্থক্যের তাৎপর্য কী। এই বিষয়গুলির মধ্যেই আমার বর্তমান আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখব বলে বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যেকার পার্থক্য প্রসঙ্গে অহেতুক কোনও গভীর বিশ্লেষণে যাব না। কারণ এ এক বিশাল কাজ এবং অনেক মূল্যবান গবেষণায় ব্যাপকভাবে আলোচিতও বটে। মানুষের অস্তিত্ব যে বহু প্রাচীন, সেটা সম্প্রতি প্রথমত মঁসিয়ে বুসার দ্য পার্থের প্রচেষ্টায় এবং পরে একদল সুপণ্ডিত ব্যক্তির বিপুল পরিশ্রমের ফলে উদ্ঘাটিত হয়েছে। মানুষের উদ্ভবকে বোঝার পক্ষে এ-সবই অপরিহার্য উপাদান। সেইজন্য এই সিদ্ধান্তকে গ্রাহ্য বলে ধরে নিয়ে পাঠকদের আমি স্যর চার্লস লাইয়েল্, স্যর জন লুবক এবং অন্যদের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলি পড়ে দেখতে অনুরোধ করব। মানুষের সঙ্গে বনমানুষের তফাত সম্বন্ধে সামান্য কিছু উল্লেখ করা ছাড়া আমি আর কিছু বলব না এই রচনায়, কারণ অধ্যাপক হাক্সলি (বহু গবেষক ও সমালোচক তাঁর মতামত মেনেও নিয়েছেন) নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন—প্রতিটি দৃশ্যমান বিষয়ে মানুষের সঙ্গে উচ্চশ্রেণির বানরদের যতটা তফাত, তার থেকে উচ্চশ্রেণির বানরদের সঙ্গে নিম্নশ্রেণির বানরদের তফাত অনেক বেশি।

মানুষ সম্পর্কে মৌলিক কোনও তথ্য এখানে খুব কমই আছে। কিন্তু মোটামুটি একটা খসড়া করার পর আমি যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম, তা আমার বেশ মনমতো হয়েছিল এবং ভেবেছিলাম অন্যদেরও তা কৌতূহলী করে তুলবে। অনেকসময় খুব জোর দিয়ে বলা হয়—মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে কখনওই কিছু জানা যাবে না। আসলে অজ্ঞতা সবসময়েই

প্রকৃত জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়। সেইজন্য যারা জানে তারা নয়, বরং যারা কিছু জানে না বা বোঝে না তারাই খুব জোর দিয়ে বলে যে এই সমস্যাটা বা ওই সমস্যাটা কিছুতেই বিজ্ঞানের সাহায্যে সমাধান করা সম্ভবপর নয়।

প্রাচীনকালের কোনও নিম্নতর এবং বর্তমানে বিলুপ্ত কোনও জৈবিক গঠনের থেকেই যে অন্যান্য কিছু প্রজাতির সঙ্গে মানুষও উদ্ভূত হয়েছিল—এই সিদ্ধান্তটি আদৌ কোনও নতুন সিদ্ধান্ত নয়। লামার্ক বহুদিন আগেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু বিশিষ্ট প্রকৃতিবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকও এই মত সমর্থন করেছেন। যেমন—ওয়ালেস, হাক্সলি, লাইয়েল, ফখ্‌ৎ, লুবক, বুখনার, রল্‌[১] প্রমুখ এবং বিশেষত হ্যাকেল। হ্যাকেল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'জেনারেল মরফোলজি' (১৮৬৬) ছাড়াও সম্প্রতি (১৮৬৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৭০-এ) প্রকাশ করেছেন 'Naturiliche Schopfungs geschicte' রচনাটি। এতে তিনি মানুষের বংশবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আমার প্রবন্ধটি লেখা হওয়ার আগে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে আমি হয়তো কোনওদিনই আমার প্রবন্ধটি শেষ করে উঠতে পারতাম না। আমি যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তার প্রায় প্রত্যেকটিই সমর্থিত হয়েছে এই প্রকৃতিবিজ্ঞানীর রচনায়। অনেক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান আমার থেকে অনেক বেশি, অনেক পূর্ণাঙ্গ। অধ্যাপক হ্যাকেল-এর রচনা থেকে কোনও তথ্য বা দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করার সময় আমি সর্বদাই সরাসরি তাঁর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি। অন্যান্য বিবৃতিগুলি আমার পাণ্ডুলিপিতে যেমন ছিল তেমনই রেখেছি, শুধু অনিশ্চিত বা কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও পাদটীকায় তাঁর রচনার কথা উল্লেখ করেছি।

বহু বছরের পর্যবেক্ষণের ফলে আমার মনে হয়েছে মানুষের বিভিন্ন জাতিতে ভাগ হয়ে যাওয়ার পিছনে যৌন নির্বাচন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু 'অরিজিন অফ স্পিসিস'-এ এই বিশ্বাসের কথাটুকু শুধু উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থেকেছি আমি। মানবজাতিকে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিচার করতে বসে আমি বুঝতে পারি যে

১। এখানে উল্লেখিত প্রথমদিকের লেখকবৃন্দের নাম ও রচিত গ্রন্থসমূহ সর্বজনপরিচিত। আমি ওইসব পরিচিত গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি না, কিন্তু পরের দিকে উল্লেখিত লেখকবৃন্দের নাম অবশ্য ইংল্যান্ডে খুব সুপরিচিত নয়। আমি তাঁদের আমার বইয়ের ফরাসি ও জার্মান অনুবাদের কপি দুটি উপহার দিয়েছি। যাঁরা আমার মানুষের উদ্ভব ও বিবর্তন সম্পর্কে মতের সাথে একমত তাঁদের সবাইকে সেসব তথ্য দেবার প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করছি না। যেমন জি. ক্যানাসট্রিনি মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে মৌলিক সূত্রসংক্রান্ত অত্যন্ত কৌতূহলব্যঞ্জক একটি গবেষণাপত্র (১৮৬৭) প্রকাশ করেছেন। ডঃ ফ্রানসিস্‌কো ব্যাবেগো ইতালীয় ভাষায়—'মানুষ শুধুমাত্র ঈশ্বরের আদলে তৈরিই নয়, লেজহীন বানরদের আদলেও তৈরি'—এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করেছেন (১৮৬৯)।

সমগ্র বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার।[২] ফলস্বরূপ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি, যেখানে যৌন নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা প্রথম খণ্ডের তুলনায় অত্যধিক দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। এছাড়া অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। মানুষ এবং নিম্নতর শ্রেণির প্রাণীদের বিভিন্ন আবেগের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছে ছিল। বহু বছর আগে স্যর চার্লস বেল্-এর গুরুত্বপূর্ণ রচনাটি পড়ার পরই এই বিষয়টির প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এই বিশিষ্ট শারীরতত্ত্ববিদের মতে, মানুষের শরীরে এমন কিছু পেশী আছে যেগুলি শুধুমাত্র আবেগ প্রকাশ করার জন্যই ব্যবহৃত হয়। এই ধারণাটি স্পষ্টতই অন্য কোনও নিম্নতর জৈবিক গঠন থেকে মানুষের উদ্ভব সংক্রান্ত ধারণার বিরোধী। তাই এ-বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। মানুষের ভিন্ন ভিন্ন জাতির সদস্যদের আবেগ প্রকাশের মধ্যে কতটা সাদৃশ্য আছে, তা-ও দেখানোর ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের আয়তনের কথা ভেবে ওই প্রবন্ধটিকে আলাদাভাবে প্রকাশ করার জন্য রেখে দিতে হল।

১৮৭১ চার্লস ডারউইন

২। এই রচনাটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখনও পর্যন্ত অধ্যাপক হ্যাকেলই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি 'অরিজিন অফ স্পিসিস' প্রকাশিত হওয়ার আগে যৌন নির্বাচন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং বিষয়টির গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে তাঁর বিভিন্ন রচনায় চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন তিনি।

❑ বিষয়সূচি ❑

প্রথম পরিচ্ছেদ
যৌন নির্বাচনের নীতি
(১৭-৮৮)

অপ্রধান যৌন প্রকৃতি—যৌন নির্বাচন—কার্যপদ্ধতি—পুরুষদের অমিতাচার—বহুগামিতা—যৌন নির্বাচন মারফত সাধারণত শুধু পুরুষরাই পরিবর্তিত হয়েছে—পুরুষদের ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা—পুরুষদের পরিবর্তনশীলতা—নারীদের পছন্দ-অপছন্দ—প্রাকৃতিক নির্বাচনের সঙ্গে যৌন নির্বাচনের তুলনা—জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, বছরের বিভিন্ন মরশুমে এবং যৌনতার দ্বারা সীমায়িত বংশগতি—বংশগতির বিভিন্ন ধরনের মধ্যেকার সম্পর্ক—যৌন নির্বাচন মারফত একটি বিশেষ লিঙ্গের প্রাণীরা এবং অল্পবয়সীরা পরিবর্তিত হয়নি কেন—সমগ্র প্রাণীজগতে দুটি লিঙ্গের আনুপাতিক সংখ্যা প্রসঙ্গে—প্রাকৃতিক নির্বাচনের আলোয় নারী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ
(৮৯-১১০)

নিম্নতম শ্রেণীগুলির মধ্যে এইসব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না—উজ্জ্বল রঙ—মল্যাস্কা বা শম্বুক জাতীয় কোমলাঙ্গ প্রাণিবিশেষ—অ্যালেলিড বা কেঁচো, জোঁক জাতীয় প্রাণী—চিংড়ি, কাঁকড়া জাতীয় কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণী, যাদের মধ্যে অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যগুলি অত্যন্ত প্রকট ; ডাইমরফিজ্‌ম্ বা দ্বিরূপতা ; রঙ ; পরিণত হয়ে না-ওঠা যে-বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা দেয় না—মাকড়সা, লিঙ্গভেদে রঙের তফাত ; পুরুষ-মাকড়সাদের কর্কশতা—মিরিয়াপডা বা বৃশ্চিক, কেন্নো জাতীয় বহুপদ সরীসৃপ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
কীটপতঙ্গের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ
(১১১-১৫৫)

স্ত্রী-প্রাণীদের আয়ত্তে আনার জন্য পুরুষ-প্রাণীদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ—স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেকার পার্থক্য, যেগুলোর অর্থ এখনও দুর্বোধ্য—স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীদের আকারগত পার্থক্য—থাইসেনিউরা —ডিপ্‌টেরা— হেমিপ্‌টেরা— হোমোপ্‌টেরা, এদের কেবলমাত্র পুরুষ-প্রাণীদেরই সাঙ্গীতিক ক্ষমতা থাকে— অর্থোপ্‌টেরা, পুরুষ-প্রাণীদের সাঙ্গীতিক অঙ্গ, সেগুলির গঠনকাঠামোর বিভিন্নতা ; যুদ্ধপ্রিয়তা, গাত্রবর্ণ—নিউরোপ্‌টেরা,স্ত্রী-পুরুষের গাত্রবর্ণের পার্থক্য—হাইমেনোপ্‌টেরা, যুদ্ধপ্রিয়তা ও গাত্রবর্ণ— কোলিওপ্‌টেরা, গাত্রবর্ণ ; এদের বড় বড় শুঙ্গ থাকে, আপাতভাবে যেগুলিকে অঙ্গসজ্জা বলেই মনে হয় ; লড়াই ; উচ্চনাদবিশিষ্ট কর্কশ শব্দসৃষ্টির অঙ্গ, যেগুলি সাধারণত স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের শরীরেই দেখা যায়।

দ্বিতীয় খণ্ড ❑ দ্বিতীয় ভাগ

❑ বিষয়সূচি ❑

প্রথম পরিচ্ছেদ
মানুষের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ
(১৫৭-১৯৬)

নারী-পুরুষের মধ্যেকার পার্থক্য—এইসব পার্থক্য এবং নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণ—যুদ্ধের নীতি—মানসিক ক্ষমতা এবং কণ্ঠস্বরের পার্থক্য—মানুষের বিবাহে সৌন্দর্যের প্রভাব—অলংকারের প্রতি বন্য মানুষদের আকর্ষণ—নারীদের সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাদের ধারণা—প্রতিটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যকে বাড়িয়ে দেখানোর প্রবণতা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মানুষের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ—পূর্বানুবৃত্তি
(১৯৭-২২৬)

প্রতিটি জাতির মধ্যে সৌন্দর্যের ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠি অনুযায়ী নারীদের অবিরাম নির্বাচন প্রসঙ্গে—সভ্য ও বর্বর জাতিগুলির মধ্যে যৌন নির্বাচনের ব্যাপারে যে-সব কারণগুলি বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেগুলি প্রসঙ্গে—আদিম যুগে যৌন নির্বাচনের অনুকূল শর্তাবলী—মানবজাতির ক্ষেত্রে যৌন নির্বাচন কীভাবে সক্রিয় হয়—বর্বর জাতিগুলির নারীদের স্বামী-নির্বাচনের কিছু ক্ষমতা থাকে—- শরীরে রোমের অনুপস্থিতি এবং দাড়ির বিকাশ—ত্বকের রঙ—সারসংক্ষেপ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সারসংক্ষেপ এবং উপসংহার
(২২৭-২৪৫)

আমাদের প্রধান সিদ্ধান্ত হল, নিম্নতর কোনও জীব থেকেই উদ্ভূত হয়েছে মানুষ—বিকাশের ধরন—মানুষের বংশবৃত্তান্ত—মননগত ও নৈতিক গুণ—যৌন নির্বাচন—উপসংহার।

সংযোজন
(২৪৭-২৫৪)

বানরদের ক্ষেত্রে যৌন নির্বাচন প্রসঙ্গে

ডিসেন্ট অফ ম্যান

দ্বিতীয় খণ্ড ❑ প্রথম ভাগ

❑ প্রথম পরিচ্ছেদ ❑

যৌন নির্বাচনের নীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

যৌন নির্বাচনের নীতি

অপ্রধান যৌন প্রকৃতি—যৌন নির্বাচন—কার্যপদ্ধতি—পুরুষদের অমিতাচার—বহুগামিতা—যৌন নির্বাচন মারফত সাধারণত শুধু পুরুষরাই পরিবর্তিত হয়েছে—পুরুষদের ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা—পুরুষদের পরিবর্তনশীলতা—নারীদের পছন্দ-অপছন্দ—প্রাকৃতিক নির্বাচনের সঙ্গে যৌন নির্বাচনের তুলনা—জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, বছরের বিভিন্ন মরশুমে এবং যৌনতার দ্বারা সীমায়িত বংশগতি—বংশগতির বিভিন্ন ধরনের মধ্যেকার সম্পর্ক—যৌন নির্বাচন মারফত একটি বিশেষ লিঙ্গের প্রাণীরা এবং অল্পবয়সীরা পরিবর্তিত হয়নি কেন—সমগ্র প্রাণীজগতে দুটি লিঙ্গের আনুপাতিক সংখ্যা প্রসঙ্গে—প্রাকৃতিক নির্বাচনের আলোয় নারী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাত।

যে-সব প্রাণীদের মধ্যে নারী-পুরুষ আলাদা আলাদা ভাবে বিদ্যমান, তাদের মধ্যে পুরুষদের জনন সংক্রান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর নারীদের জনন সংক্রান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পরের থেকে পৃথক ধরনের হয়ে থাকে। এগুলোই হচ্ছে তাদের মুখ্য বা প্রাথমিক যৌন প্রকৃতি। কিন্তু হান্টার যেগুলোকে অপ্রধান যৌন প্রকৃতি বলেছেন, যেগুলো জননপ্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়, সেগুলোর ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের মধ্যে প্রায়শই নানান পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, অনুভূতির বা স্থানান্তরে গমনের জন্য পুরুষদের শরীরে এমন কতকগুলো ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ থাকে যেগুলো নারীদের শরীরে থাকে না, অথবা নারীদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে এইসব ইন্দ্রিয় বা অঙ্গগুলো অনেক উন্নত অবস্থায় থাকে যাতে করে প্রয়োজনের মুহূর্তে তারা নারীদের খুঁজে নিতে পারে কিংবা তাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। পুরুষদের শরীরে কোনও কিছুকে আঁকড়ে ধরার উপযোগী কিছু বিশেষ অঙ্গও থাকে যেগুলোর সাহায্যে তারা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারে নারীদের। এই শেষোক্ত অঙ্গগুলো বহু ধরনের হয়ে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে প্রায় মুখ্য অঙ্গের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠে। অনেক সময় মুখ্য অঙ্গগুলোর থেকে এগুলোকে আলাদা করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। পুরুষ-পতঙ্গদের পেটের উপরের দিকে যে যৌগিক উপাঙ্গগুলো থাকে, সেগুলোর মধ্যে এর স্পষ্ট প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়। 'মুখ্য' অভিধাটিকে শুধুমাত্র জননসংক্রান্ত গ্রন্থির (gland) ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখলে আলাদা কথা, কিন্তু তা নাহলে কোন্ অঙ্গগুলোকে মুখ্য আর কোন্ অঙ্গগুলোকে অপ্রধান অঙ্গ বলা হবে তা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব।

আবার নারীদের শরীরে সন্তানদের খাওয়ানো বা তাদের রক্ষা করার জন্য অনেক সময় এমন কতকগুলো অঙ্গ থাকে যেগুলো পুরুষদের শরীরে থাকে না, যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে স্তনগ্রন্থি এবং অঙ্কগর্ভ (marsupial—ক্যাঙারু জাতীয়)

প্রাণীদের ক্ষেত্রে পেটের থলি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এ ধরনের কিছু অঙ্গ পুরুষদের শরীরে থাকে কিন্তু নারীদের শরীরে থাকে না, যেমন কয়েক জাতের পুরুষ-মাছের মধ্যে ডিম্বাণু ধারণের আধার দেখা যায়। কয়েক জাতের পুরুষ-ব্যাঙেদের মধ্যেও সাময়িকভাবে এই আধার গড়ে ওঠে। বেশির ভাগ প্রজাতির স্ত্রী-মৌমাছিদের শরীরে পরাগ সংগ্রহ করা ও তা বহন করার উপযোগী একটা বিশেষ অঙ্গ থাকে এবং শূককীটকে আর গোটা দলটাকে রক্ষা করার জন্য তাদের ডিম্বধারকটি (ovipositor) একটি হুলে পরিণত হয়। এ-রকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কিন্তু এখানে তার কোনও প্রয়োজন নেই। তবে মুখ্য জননাঙ্গগুলোর সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন অন্য কিছু পার্থক্যও নারী-পুরুষের মধ্যে থাকে এবং আমাদের আলোচনায় সেগুলোই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এইসব পার্থক্যের মধ্যে থাকে নারীর তুলনায় পুরুষের বড় আকৃতি, বেশি শক্তি ও যুদ্ধপ্রিয়তা, প্রতিদ্বন্দ্বীদের আক্রমণ করার জন্য পুরুষদের অস্ত্র কিংবা আত্মরক্ষা করার উপায়, পুরুষদের উজ্জ্বল রঙ, নানান চাকচিক্য, গান গাওয়া বা শিস্ দেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত মুখ্য ও অপ্রধান লিঙ্গগত পার্থক্যগুলো ছাড়াও কোনও কোনও প্রাণীর পুরুষ আর নারীদের মধ্যে শারীরিক গঠনকাঠামোর পার্থক্যও দেখা যায়। এই পার্থক্যগুলো গড়ে ওঠে জীবনধারণের ভিন্ন ভিন্ন অভ্যাসের ফল হিসেবেই। প্রজনন সংক্রান্ত কাজকর্মের সঙ্গে এগুলোর কোনও সম্পর্ক নেই, থাকলেও তা নিতান্তই পরোক্ষ সম্পর্ক। যেমন কয়েক জাতের মাছিদের (Culicidae আর Tabanidae) নারীরা রক্তশোষক হয়, কিন্তু তাদের পুরুষরা ফুলের মধু খেয়ে জীবন ধারণ করে বলে তাদের মুখে কোনও নিম্নচোয়াল (mandible) থাকে না। কয়েক ধরনের পুরুষ-মথ এবং কঠিন খোলাযুক্ত কয়েক ধরনের প্রাণীর (যেমন Tanais) পুরুষদের মুখটা অসম্পূর্ণ ও সঙ্কীর্ণ হয়, ফলে তারা কাউকে খাইয়ে দিতে পারে না। কুঞ্চিত শুঙ্গবিশিষ্ট (Cirripede) কয়েক ধরনের প্রাণীর পূরক (complemental) পুরুষরা পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের মতো হয় স্ত্রী-আকারে নয়তো উভলিঙ্গ আকারে জীবনযাপন করে এবং তাদের মুখ ও আঁকড়ে ধরার অঙ্গ থাকে না। এইসব ক্ষেত্রে পুরুষরাই পরিবর্তিত হয়েছে এবং কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হারিয়েছে, যে-অঙ্গগুলো স্ত্রী-প্রাণীদেরই থাকে। আবার অন্য কিছু ক্ষেত্রে স্ত্রী-প্রাণীরাই তাদের কোনও কোনও অঙ্গ হারায়। যেমন স্ত্রী-জোনাকিদের কোনও ডানা থাকে না। অনেক স্ত্রী-মথেরও ডানা থাকে না এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন কখনোই নিজেদের গুটি থেকে বেরিয়ে আসতেও পারে না। কঠিন খোলাযুক্ত পরজীবী বর্গের অনেক স্ত্রী-প্রাণী তাদের সন্তরক পা (অর্থাৎ সাঁতার কাটার পা) হারিয়েছে। কয়েক ধরনের গুব্‌রে পোকার (Curculionidae) পুরুষ আর স্ত্রীদের মধ্যে ঠোঁট বা তুণ্ডের (snout) দৈর্ঘ্যে বিপুল

পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু এই পার্থক্য এবং এ ধরনের অন্য অনেক পার্থক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝে ওঠা দুষ্কর। জীবনধারণের ভিন্ন ভিন্ন অভ্যাসের দরুন স্ত্রী আর পুরুষ প্রাণীদের গঠনকাঠামোর মধ্যে যে-পার্থক্যগুলো দেখা যায় সেগুলো সাধারণত নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে কয়েক ধরনের পুরুষ-পাখির ঠোঁট স্ত্রী-পাখিদের ঠোঁটের থেকে অন্যরকম হয়। নিউজিল্যান্ডের হুইয়া পাখিদের স্ত্রী আর পুরুষের মধ্যে এই পার্থক্যটা বিরাট। ডঃ বুলার বলেছেন যে পচা কাঠকে খুঁটে খুঁটে ভেতর থেকে কীটপতঙ্গের শূককীট বার করে আনার জন্য পুরুষ-পাখিরা তাদের মজবুত ঠোঁটটাকে কাজে লাগায়, আর স্ত্রী-পাখিরা তাদের অনেক বড়, বেশি বাঁকানো এবং নমনীয় ঠোঁটটা ঢুকিয়ে দেয় কাঠের নরম অংশগুলোর মধ্যে। এইভাবে পরস্পরকে সাহায্য করে তারা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনও প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের গঠনকাঠামোর পার্থক্যটা কম-বেশি প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত থাকে সেই প্রজাতির বংশবিস্তারের সঙ্গে। স্ত্রী-প্রাণীদের বেশ কিছু ডিম্বাণুকে পুষ্টি জোগাতে হয় বলে পুরুষদের তুলনায় বেশি খাদ্য প্রয়োজন হয় তাদের, ফলে সেই খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ কিছু উপায় থাকারও দরকার হয় স্ত্রী-প্রাণীদের। পুরুষ-প্রাণীরা, যারা খুব বেশিদিন বাঁচে না, তারা হয়তো অব্যবহারের ফলে তাদের খাদ্য সংগ্রহ করার অঙ্গগুলো হারিয়ে ফেলতে পারে এবং তার জন্য তাদের তেমন কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু তাদের স্থানান্তরে গমনের অঙ্গ বা সঞ্চরণ-অঙ্গগুলো একেবারে যথাযথ অবস্থাতেই থাকে, কারণ স্ত্রী-প্রাণীদের কাছে পৌঁছনোর জন্য ওই অঙ্গগুলো তাদের পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে স্ত্রী-প্রাণীরাও তাদের ওড়ার, সাঁতার কাটার বা চলাফেরার অঙ্গগুলো হারিয়ে ফেলতে পারে যদি তাদের জীবনধারণের অভ্যাসটা এমন হয় যেখানে এইসব শক্তির কোনও প্রয়োজনই হয় না।

তবে এখানে আমরা কেবলমাত্র যৌন নির্বাচন নিয়েই আলোচনা করতে চাইছি। শুধুমাত্র প্রয়োজনের ব্যাপারে একই প্রজাতির এবং একই লিঙ্গের অন্যান্যদের তুলনায় কয়েকজন যে-বিশেষ সুবিধেটা পায়, তার ওপরেই এই ব্যাপারটা নির্ভর করে। উপরোল্লিখিত ঘটনাগুলোর মতো যে-সব ক্ষেত্রে জীবনধারণের ভিন্ন ভিন্ন অভ্যাসের দরুন স্ত্রী-পুরুষের গঠনকাঠামোর মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়, সেইসব ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের পথ বেয়েই তাদের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটেছে এবং একটি লিঙ্গের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো শুধু সেই লিঙ্গের প্রাণীরাই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। একইভাবে, মুখ্য যৌনাঙ্গগুলো আর বাচ্চাদের লালনপালন করা বা রক্ষা করার অঙ্গগুলোর ওপরেও একই প্রভাব ক্রিয়া করে। যারা নিজেদের সন্তানদের সবথেকে ভালভাবে জন্ম দিতে বা লালনপালন করতে পারে, তারাই তাদের উৎকৃষ্টতার উত্তরাধিকারী হিসেবে সবথেকে বেশি সংখ্যক সন্তান-সন্ততি রেখে

যেতে সক্ষম হয়। আর যারা নিকৃষ্টভাবে সন্তানের জন্ম দেয় বা লালনপালন করে, তারা তাদের দুর্বলতার উত্তরাধিকারী হিসেবে খুব কম সন্তান-সন্ততিই রেখে যেতে পারে। পুরুষদেরকে নারীদের খুঁজে নিতে হয় বলে তাদের শরীরে স্থানান্তর গমনের ও অনুভূতির অঙ্গ থাকা দরকার হয়। কিন্তু এই অঙ্গগুলো যদি জীবনের অন্যান্য ব্যাপারেও কাজে লাগত (যেটাই সাধারণত হয়ে থাকে), তাহলে সেগুলো বিবর্তিত হত প্রাকৃতিক নির্বাচনের পথ বেয়েই। পুরুষ-প্রাণীরা যখন স্ত্রী-প্রাণীদের খুঁজে পায়, তখন তাদের ভালভাবে ধরার জন্য অনেক সময় আঁকড়ে ধরার উপযোগী বিশেষ অঙ্গের প্রয়োজন হয় পুরুষদের। যেমন ডঃ ওয়ালেস আমাকে জানিয়েছেন যে কিছু কিছু পুরুষ-মথের গোড়ালি বা পায়ের পাতা ভাঙা থাকলে তারা স্ত্রী-মথেদের সঙ্গে মিলন করতে পারে না। কঠিন খোলাযুক্ত অনেক সামুদ্রিক প্রাণীর পুরুষরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের পা এবং শুঙ্গগুলো খুব অদ্ভুতভাবে পাল্টে যায় এবং স্ত্রী-প্রাণীদের ভালভাবে আঁকড়ে ধরার উপযোগী হয়ে ওঠে। আমাদের মনে হয় এইসব প্রাণীরা সমুদ্রের ঢেউয়ের ধাক্কায় সারাক্ষণ ছিটকে পড়ে বলে বংশবিস্তারের জন্য এই ধরনের অঙ্গ থাকাটা তাদের পক্ষে একান্তই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। যদি তা-ই হয়, তাহলে এই অঙ্গগুলোর এইভাবে বিবর্তিত হওয়াটাকে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল হিসেবেই মেনে নিতে হবে আমাদের। খুব নিম্নশ্রেণীর কিছু প্রাণীদের শরীরেও এই একই কারণে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন কয়েক ধরনের পরজীবী কৃমির পুরুষরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের শরীরের শেষ প্রান্তের নীচের দিকটা খুব কর্কশ বা খরখরে হয়ে ওঠে এবং এর সাহায্যে তারা স্ত্রী-কৃমিদের শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরে রাখতে পারে।[১]

যখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জীবনধারণের অভ্যাসগুলো একই রকমের হয় এবং স্ত্রীদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে স্থানান্তর গমনের বা অনুভূতির অঙ্গগুলো অধিকতর উন্নত অবস্থায় থাকে, তখন তার কারণটা এমন হতে পারে যে স্ত্রী-প্রাণীদের খুঁজে

১। মসিয়েঁ পেরিয়ের এই ব্যাপারটাকে উপস্থাপিত করেছেন ('Revue Scientifique', ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩, পৃঃ ৮৬৫) যৌন নির্বাচন সংক্রান্ত ধারণার একেবারেই প্রতিকূল হিসেবে এবং তিনি ধরে নিয়েছেন যে যৌন নির্বাচনকেই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেকার যাবতীয় পার্থক্যের কারণ বলে মনে করি আমি। তাই অন্যান্য অনেক ফরাসি প্রাণিবিজ্ঞানীর মতোই এই বিশিষ্ট প্রাণিবিজ্ঞানীও যৌন নির্বাচনের প্রাথমিক নীতিগুলো বোঝার জন্যও কোনও পরিশ্রম করেননি। জনৈক ইংরেজ প্রাণিবিজ্ঞানী জোর দিয়ে বলেছেন যে, কিছু পুরুষ-প্রাণীর শরীরের আঁকড়ে ধরার অঙ্গগুলো স্ত্রী-প্রাণীদের পছন্দ মারফত গড়ে উঠেছে, এটা কিছুতেই হতে পারে না! মন্তব্যটির কথা জানা না থাকলে আমি ভাবতেও পারতাম না যে এই পরিচ্ছেদটি পড়ার পর কারও পক্ষে ভাবা সম্ভব হতে পারে যে আমার মতে পুরুষদের শরীরের আঁকড়ে ধরার উপযোগী অঙ্গগুলো গড়ে ওঠার সঙ্গে স্ত্রী-প্রাণীদের পছন্দ-অপছন্দের কোনও সম্পর্ক আছে।

বার করার জন্যে পুরুষ-প্রাণীদের ওই অঙ্গগুলোর উন্নত হওয়াটা নিতান্তই অপরিহার্য। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা একজন পুরুষের তুলনায় অন্য একজন পুরুষকে বেশি সুবিধে পাওয়ার সুযোগ করে দেয়, কারণ শারীরিকভাবে কম সুবিধাসম্পন্ন পুরুষদের পক্ষে স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হতে অনেক বেশি সময় লাগে। আর স্ত্রী-প্রাণীদের শারীরিক গঠনকাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে জীবনধারণের সাধারণ অভ্যাস-আচরণের ব্যাপারে অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে তারাও সমানভাবে অভিযোজিত হয়ে ওঠে। এ-সব ক্ষেত্রে পুরুষরা যেহেতু তাদের বর্তমান গঠনকাঠামোটা অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামে টিকে থাকার ব্যাপারে অধিকতর উপযুক্ত হওয়ার জন্য লাভ করেনি, বরং তা লাভ করেছে অন্য পুরুষদের তুলনায় কিছুটা বেশি সুবিধা পাওয়া এবং সেই সুবিধাটা শুধুমাত্র তাদের পুরুষ-সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়ার দরুন, সেহেতু এইসব ক্ষেত্রে যৌন নির্বাচন অবশ্যই তার নিজস্ব ভূমিকা পালন করেছে। এই পার্থক্যটার গুরুত্বই এই নির্বাচনের এই রূপটাকে যৌন নির্বাচন নামে চিহ্নিত করতে অনুপ্রাণিত করেছিল আমাকে। এইভাবে বলা যায় যে আঁকড়ে ধরার অঙ্গগুলো থেকে পুরুষ-প্রাণীরা যদি অন্য পুরুষরা এসে পড়ার আগে স্ত্রী-প্রাণীদের আঁকড়ে ধরার কাজেই (অথবা তাদের হাত থেকে স্ত্রী-প্রাণীদের ছাড়িয়ে আনার কাজে) প্রধান সাহায্যটা পেয়ে থাকে, তাহলে বলতেই হবে যে এইসব অঙ্গগুলো যৌন নির্বাচনের পথ বেয়েই যথাযথ হয়ে উঠেছে—অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় কয়েকজনের অর্জিত কিছু বিশেষ সুবিধার পথ বেয়েই যথাযথ হয়ে উঠেছে এগুলো। কিন্তু এ ধরনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক নির্বাচন ও যৌন নির্বাচনের প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য করা প্রায় অসম্ভব। অনুভূতি, স্থানান্তর গমন আর আঁকড়ে ধরার অঙ্গের ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেকার পার্থক্যের খুঁটিনাটি নিয়ে বেশ কিছু পরিচ্ছেদই লিখে ফেলা যায়। তবে জীবনের সাধারণ কাজকর্মের পক্ষে উপযোগী হয়ে ওঠা অন্যান্য অঙ্গগুলোর তুলনায় এই অঙ্গগুলো বেশি চিত্তাকর্ষক নয় বলে এগুলো নিয়ে আমি খুব বেশি আলোচনা করব না, শুধু প্রতিটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কয়েকটি করে উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব।

প্রাণীদের শরীরের আরও অনেক অঙ্গ ও সহজাত প্রবৃত্তিও যৌন নির্বাচনের পথ বেয়েই বিকশিত হয়েছে। যেমন আক্রমণের অস্ত্র ও আত্মরক্ষার উপায়, প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াই করা ও তাদের হঠিয়ে দেওয়ার জন্য পুরুষ-প্রাণীদের অস্ত্র, তাদের সাহস ও যুদ্ধপ্রিয়তা, তাদের শরীরের নানারকম চাকচিক্য, কণ্ঠ থেকে অথবা কোনও যন্ত্র থেকে সঙ্গীত সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের নানান কৌশল, তাদের গন্ধ-ছড়ানোর গ্রন্থি ইত্যাদি। শেষোক্ত ব্যাপারগুলো স্ত্রী-প্রাণীদের প্রলুব্ধ করে তোলার কাজেই ব্যবহৃত হয়। স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণ নির্বাচন মারফত গড়ে ওঠেনি,

গড়ে উঠেছে যৌন নির্বাচন মারফতই, কারণ অস্ত্রহীন, চাকচিক্যহীন অথবা অনাকর্ষণীয় পুরুষ-প্রাণীরাও জীবনযুদ্ধে সফল হতে এবং অসংখ্য সন্তান-সন্ততি রেখে যেতে পারত, কিন্তু তাদের তুলনায় অধিকতর গুণ বা সুবিধাসম্পন্ন পুরুষদের উপস্থিতির জন্যই তারা তা পারে না। এই সিদ্ধান্তটা আমরা অনায়াসেই নিতে পারি, কারণ অস্ত্রহীন ও চাকচিক্যহীন স্ত্রী-প্রাণীদের দিকে তাকালে দেখা যায় যে তারা কিন্তু দিব্যি বেঁচেবর্তে থাকে এবং সন্তানের জন্ম দেয়। এই ধরনের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে বিস্তৃত আলোচনা করব আমরা। আলোচনাটা প্রয়োজনীয়, কারণ বিষয়টা চিত্তাকর্ষক তো বটেই, উপরন্তু এটা উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের ইচ্ছা, পছন্দ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপরে নির্ভর করে বলে এর গুরুত্বটাও প্রণিধানযোগ্য। যখন দুটি পুরুষ-প্রাণী একটা স্ত্রী-প্রাণীর ওপরে দখল নেওয়ার জন্য লড়াই করে অথবা যখন একদল স্ত্রী-পাখির সামনে একদল পুরুষ-পাখি তাদের রঙচঙে পালকগুচ্ছ দেখায় আর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে, তখন নিঃসন্দেহেই ধরে নেওয়া যায় যে সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হলেও কীসের জন্যে কাজটা করছে তা তাদের জানা থাকে আর তাই সচেতনভাবেই নিজেদের দৈহিক ও মানসিক শক্তির নজির পেশ করার চেষ্টা করে তারা।

মানুষ যেমন ইচ্ছে করলে মোরগ-লড়াইয়ের বিজয়ী মোরগদের দিয়ে তার লড়ুয়ে-মোরগদের বংশধারাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারে, ঠিক তেমনিভাবে সবথেকে শক্তিশালী ও সবথেকে বেশি জীবনীশক্তিসম্পন্ন অথবা সর্বোত্তম অস্ত্রের অধিকারী পুরুষ-প্রাণীরাই প্রকৃতির রাজত্বে সবথেকে ভালভাবে টিকে থাকতে পেরেছে এবং নিজেদের বংশধারাকে বা প্রজাতিকে উন্নততর করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সামান্য কোনও পরিবর্তনশীলতাও, তা সে যতই সামান্য হোক না কেন, নিরন্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথে কোনও প্রাণীকে কিছুটা বাড়তি সুবিধা দেয়ই এবং এই পরিবর্তনশীলতার পিছনে যৌন নির্বাচনের নীতিই কাজ করে চলে। আর অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যগুলো যে স্পষ্টতই পরিবর্তনশীল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। মানুষ যেভাবে নিজের রুচি অনুযায়ী তার ছানা-মোরগদের সুন্দর করে তুলতে পারে, অথবা আরও যথাযথভাবে বললে, ছানাটার পিতামাতার প্রজাতির মধ্যে বিদ্যমান আদত সৌন্দর্যকে পাল্টে দিতে পারে, তার সেব্রাইট মোরগদের নতুন ও চমৎকার একগুচ্ছ পালকের অধিকারী করে তুলতে পারে, একেবারে সিধে হয়ে চলাফেরা করার শক্তি দিতে পারে, ঠিক সেভাবেই প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকা স্ত্রী-পাখিরা নিজেদের সঙ্গী হিসেবে অধিকতর আকর্ষণীয় পুরুষ-পাখিদের নির্বাচন করার এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের বংশধরদের সৌন্দর্য ও অন্যান্য আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলো অনেক বাড়িয়ে তুলতে পেরেছে। এই ঘটনার মধ্যে স্ত্রী-পাখিদের

পছন্দ এবং রুচির প্রমাণ পাওয়া যায়। কথাটা শুনলে প্রথমটায় একেবারে অসম্ভব বলেই মনে হবে, কিন্তু পরে আরও অনেক প্রমাণ পেশ করে আমি দেখানোর চেষ্টা করব যে স্ত্রী-পাখিদের মধ্যে এইসব ক্ষমতা সত্যিই আছে। তবে নিম্নতর প্রাণীদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ আছে বলার অর্থ এই নয় যে বহুমুখী ও জটিল ধ্যানধারণাবিশিষ্ট কোনও সুমার্জিত মানুষের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে তার তুলনা করা যেতে পারে। পশুপাখিদের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে বরং তুলনা করা যেতে পারে নিম্নতর স্তরের বন্য মানুষদের, যারা যে-কোনও ঝকমকে বা অদ্ভুতদর্শন জিনিস পছন্দ করে এবং তা দিয়ে নিজেদের সাজাতে ভালবাসে।

কতকগুলো বিষয় আমাদের জানা না-থাকার দরুন যৌন নির্বাচন ঠিক কীভাবে কাজ করে সেটা বুঝতে আমাদের একটু অসুবিধে হয়। তা সত্ত্বেও একটা কথা আমি জোর দিয়েই বলতে পারি—যে-সব প্রাণিবিজ্ঞানীরা প্রজাতির পরিবর্তনশীলতা বা পরিব্যক্তিতে (mutability) বিশ্বাস করেন, পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলো মন দিয়ে পড়লে আমার সঙ্গে একমত হয়ে তাঁরাও স্বীকার করে নেবেন যে জীবজগতের ইতিহাসে যৌন নির্বাচন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই নারীদের দখল করার জন্য পুরুষদের মধ্যে সংগ্রাম চলে। এই ব্যাপারটা সকলেরই জানা, তাই উদাহরণ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন দেখছি না। অনেক পুরুষের মধ্যে থেকে কোনও-একজনকে বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকে নারীদের, অর্থাৎ পছন্দ-অপছন্দের একটা মানসিক ক্ষমতা তাদের থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতির দরুন পুরুষদের মধ্যেকার সংগ্রামটা অত্যন্ত তীব্র রূপ ধারণ করে। পরিযায়ী পুরুষ-পাখিরা তাদের প্রজনন-স্থানে স্ত্রী-পাখিদের থেকে আগেই পৌঁছে যায়, ফলে প্রতিটি স্ত্রী-পাখির দখল নিয়ে লড়াই করার জন্য অনেক পুরুষ-পাখি তৈরি হয়ে থাকতে পারে। মিঃ জেনার ভাইর আমাকে জানিয়েছেন যে পাখি-শিকারিদের কাছ থেকে তিনি জেনেছেন নাইটিংগেল আর ব্ল্যাকক্যাপ পাখিদের ক্ষেত্রে এটা সর্বদাই ঘটে থাকে এবং ব্ল্যাকক্যাপদের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা তিনি নিজের চোখেই দেখেছেন।

ব্রাইটনের মিঃ সোয়েসল্যান্ড বিগত চল্লিশ বছর ধরে একটা বিশেষ কাজ করে আসছেন। পরিযায়ী পাখিরা প্রথম এসে পৌঁছনো থেকে তিনি তাদের ফাঁদ পেতে ধরার চেষ্টা করেন। এই চল্লিশ বছরে তিনি কখনও কোনও প্রজাতির স্ত্রী-পাখিদের পুরুষ-পাখিদের থেকে আগে এসে পৌঁছতে দেখেননি। একবার বসন্তকালে একটিও স্ত্রী-পাখি এসে পৌঁছনোর আগেই তিনি উনচল্লিশটা পুরুষ-দোয়েল বা রে'জ ওয়াগটেল (Budytes Raii) শিকার করেছিলেন। এদেশে যে-সব কাদাখোঁচা (snipe) পাখিরা প্রথম এসে পৌঁছয়, তাদের পরীক্ষা করে মিঃ গোউল্ড দেখেছেন যে পুরুষ-পাখিরা স্ত্রী-পাখিদের থেকে আগেই এসে পৌঁছে যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ

পরিযায়ী পাখিদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এখানকার নদীগুলোর পুরুষ-স্যামন মাছেদের অধিকাংশই সমুদ্র থেকে চলে আসে স্ত্রী-মাছেদের আগে এবং মিলনের জন্য তৈরি হয়ে থাকে। ব্যাঙ আর টোডদের (বুকে হেঁটে চলা এক ধরনের ব্যাঙ) ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা চোখে পড়ে। সব ধরনের কীটপতঙ্গদের মধ্যে দেখা যায় মুককীট অবস্থা থেকে পুরুষরাই প্রথমে বেরিয়ে আসে, ফলে কোনও স্ত্রী-পতঙ্গের দেখা পাওয়ার আগে কিছুটা সময় পুরুষদের একাই থাকতে হয়।[২] এসে পৌঁছনো এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে ওঠার সময়ের ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেকার এই পার্থক্যের কারণটা একান্তই স্পষ্ট। যে-সব পুরুষপ্রাণীরা প্রতি বছর অন্যদের আগে কোনও দেশে গিয়ে পৌঁছত অথবা যারা বসন্তকালে মিলনের জন্য প্রথম তৈরি হয়ে উঠত বা সবথেকে বেশি ব্যগ্র হয়ে উঠত, তাদের পক্ষেই সবথেকে বেশি সংখ্যক সন্তানের জন্ম দেওয়া সম্ভবপর ছিল। তাদের বংশধরদের মধ্যেও এই ধরনের প্রবৃত্তি ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হয়েছে। মনে রাখা দরকার বাচ্চার জন্ম দেওয়ার সময়টার (যে-সময়টা নির্ধারিত হয় মরশুম অনুযায়ী) হেরফের না ঘটিয়ে স্ত্রী-প্রাণীদের যৌন পরিপক্কতা বা সঙ্গমের জন্য তৈরি হয়ে ওঠার সময়ের কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো একেবারেই অসম্ভব। এক কথায় বলা যায়, যে-সব প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রী আর পুরুষ আলাদা, তাদের প্রায় সবার ক্ষেত্রেই স্ত্রী-প্রাণীদের দখল করার জন্য পুরুষদের মধ্যে একটা নিরন্তর সংগ্রামের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

যৌন নির্বাচনকে বুঝে ওঠার ব্যাপারে আমাদের মূল সমস্যাটা একটা জায়গাতেই নিহিত আছে। সমস্যাটা হল—যে-পুরুষরা অন্য পুরুষদের পরাজিত করে অথবা যারা স্ত্রী-প্রাণীদের কাছে নিজেদের অধিকতর আকর্ষণীয় হিসেবে প্রমাণ করতে পারে, তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের উত্তরাধিকার বহন করার জন্য তাদের পরাজিত ও কম আকর্ষণীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক সন্তানের জন্ম দেয় কীভাবে। এই ঘটনাটা না ঘটলে যে-বৈশিষ্ট্যগুলো কয়েকজন পুরুষকে অন্য পুরুষদের থেকে কিছুটা বাড়তি সুবিধা এনে দেয়, সেই বৈশিষ্ট্যগুলো যৌন নির্বাচন মারফত নিখুঁত হয়ে উঠতে এবং আরও মজবুত হয়ে উঠতে পারত না। যে-সব ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা একেবারে সমান সমান থাকে, সেইসব ক্ষেত্রে উন্নত গুণসম্পন্ন

২। যে-সব উদ্ভিদের মধ্যে স্ত্রী আর পুরুষ উদ্ভিদ আলাদা, তাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় স্ত্রী-ফুলের তুলনায় পুরুষ-ফুলগুলোই আগে পরিণত হয়ে ওঠে। সি. কে. স্প্রেঙ্গেল প্রথম দেখিয়েছিলেন যে অনেক উভলিঙ্গ উদ্ভিদই বিষমপরিণতিবিশিষ্ট (dichogamous) হয়, অর্থাৎ তাদের স্ত্রী ও পুরুষ-অঙ্গগুলো একই সময়ে পরিণত হয়ে ওঠে না, ফলে তারা স্ব-পরাগিত (selffertilised) হতে পারে না। এইসব ফুলেদের ক্ষেত্রে পরাগরেণুগুলো সাধারণত গর্ভমুণ্ডের থেকে আগেই পরিণত হয়ে ওঠে। তবে কোনও কোনও ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে স্ত্রী-অঙ্গগুলোকেই আগে পরিণত হয়ে উঠতে দেখা যায়।

পুরুষদের মতোই একেবারে নিকৃষ্ট মানের পুরুষরাও (পুরুষদের বহুগামিতা চালু থাকলে অবশ্য আলাদা কথা) সঙ্গিনী খুঁজে পায় এবং নিজেদের জীবনাচরণের যথার্থ উত্তরাধিকারী হিসেবে বহু সন্তানের জন্ম দিতে পারে। বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে বিচার-বিবেচনা করে আমি আগে অনুমান করেছিলাম, যে-সব প্রাণীদের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যগুলো যথেষ্ট উন্নত, তাদের অধিকাংশের মধ্যে স্ত্রীদের তুলনায় পুরুষদের সংখ্যা নিশ্চয়ই অনেক বেশি ছিল। কিন্তু এই ধারণাটা সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। কোনও ক্ষেত্রে যদি দু'জন বা তিনজন স্ত্রী-পিছু একজন করে পুরুষ থাকত কিংবা তার চেয়েও কম থাকত, তাহলেও ফলাফলের কোনও হেরফের ঘটত না। কারণ সেক্ষেত্রেও বেশি শক্তিশালী বা অধিকতর আকর্ষণীয় পুরুষরাই সর্বাধিক সংখ্যক সন্তান-সন্ততির জন্ম দিয়ে যেত। তবে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাতের ব্যাপারটা নিয়ে যতদূর সম্ভব যাচাই করে দেখার পর আমার মনে হয়েছে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার মধ্যে খুব বিরাট পার্থক্য সাধারণত থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌন নির্বাচন কাজ করে নিম্নোক্ত উপায়ে।

যে-কোনও একটা প্রজাতির কথা ধরা যাক। ধরা যাক কোনও-একটা পাখির কথা। একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী এই প্রজাতির স্ত্রী-পাখিদের দুটো সমান ভাগে ভাগ করা যাক। প্রথম ভাগটায় থাকবে বেশি প্রাণশক্তিসম্পন্ন আর সুপুষ্ট স্ত্রী-পাখিরা, দ্বিতীয়টায় কম প্রাণশক্তিসম্পন্ন আর দুর্বল স্ত্রী-পাখিরা। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহেই বলে দেওয়া যায় যে বসন্তকালে প্রথম ভাগটার পাখিরা দ্বিতীয় ভাগের পাখিদের চেয়ে অনেক আগেই সন্তান প্রসব করবে। এটা মিঃ জেনার ভাইর-এর মত, যিনি বহু বছর ধরে পাখিদের আচার-আচরণ খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সবথেকে বেশি প্রাণশক্তিসম্পন্ন, সর্বাধিক সুপুষ্ট এবং সর্বপ্রথম প্রসবকারিণীরাই যে সবথেকে বেশি সংখ্যক সুসন্তান রেখে যেতে সক্ষম হবে, সে ব্যাপারেও সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।[৩] আমরা আগেই দেখেছি যে পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের থেকে আগেই মিলনের জন্য তৈরি হয়ে যায়। সবথেকে শক্তিশালী এবং কোনও কোনও প্রজাতির ক্ষেত্রে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অস্ত্রে সবথেকে ভালভাবে সজ্জিত পুরুষরা দুর্বল পুরুষদের হঠিয়ে দেয়। তারপর এই প্রথম শ্রেণীর পুরুষরা মিলিত হয়

৩। এই সন্তানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে উৎকৃষ্ট প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় অভিজ্ঞ পক্ষীতত্ত্ববিদ মিঃ জে. এ. অ্যালেন-এর লেখায় ('ম্যামালাস অ্যান্ড উইন্টার বার্ডস অফ ইস্টার্ন ফ্লোরিডা', পৃঃ ২২৯)। প্রথমদিকে জন্মানো পক্ষীশাবকরা ঘটনাচক্রে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর, পরের দিকে জন্মানো পক্ষীশাবকদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এই শাবকরা 'মরশুমের প্রথমদিকে জন্মানো শাবকদের তুলনায় আকারে ছোট ও ফ্যাকাশে রঙের হয়। যে-সব ক্ষেত্রে প্রতি বছর একাধিকবার বাচ্চার জন্ম দেয় মায়েরা, সেইসব ক্ষেত্রে প্রথম বারের শাবকদের সব ব্যাপারেই অনেক বেশি পরিপূর্ণ ও প্রাণবন্ত হতে দেখা যায়।'

বেশি প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও সুপুষ্ট স্ত্রীদের সঙ্গে, কারণ তারাই প্রথমে সন্তানের জন্ম দিতে পারবে।[৪] পিছিয়ে থাকা বা দুর্বল স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় এই শক্তিসমৃদ্ধ যুগলরা অনেক বেশি সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম হবে। স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা সমান সমান হলে ওই দুর্বল স্ত্রী-প্রাণীরা তখন পরাজিত ও দুর্বল পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হতে বাধ্য হবে। ঠিক এই ঘটনাটাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পুরুষ-প্রাণীদের আকার, শক্তি ও সাহস বাড়িয়ে তোলার অথবা তাদের আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অস্ত্রগুলোকে উন্নত করে তোলার পিছনে মূল কারণ হিসেবে কাজ করে।

কিন্তু বহু ক্ষেত্রে অন্য একটা ঘটনাও চোখে পড়ে। স্ত্রী-প্রাণীটির যদি তাকে পছন্দ না হয়, তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করার পরেও পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রীটির ওপরে দখল নিতে পারে না। পশুপাখিদের পূর্বরাগের ব্যাপারটা মোটেই খুব সাদামাটা বা সংক্ষিপ্ত নয়। সবথেকে চাকচিক্যময় অথবা সবথেকে ভাল গায়ক কিংবা অঙ্গভঙ্গি করে অভিনয় দেখানোয় সবথেকে ওস্তাদ পুরুষদের দেখেই স্ত্রী-প্রাণীরা সবথেকে বেশি উত্তেজিত হয় বা তাদের সঙ্গে জোড় বাঁধতে চায়। কিন্তু এমনটাও হতে পারে যে সেইসঙ্গেই তারা অধিকতর প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও উচ্ছল পুরুষদের পছন্দ করবে। বাস্তব পর্যবেক্ষণ থেকে এর কিছু প্রমাণও পাওয়া গেছে।[৫] তাই বেশি প্রাণশক্তিসম্পন্ন স্ত্রী-প্রাণীরা, যারাই প্রথমে সন্তান প্রসব করে, তারা অনেক পুরুষের মধ্যে বিশেষ কাউকে বেছে নেওয়ার সুযোগ পায়। সবসময় হয়তো তারা সবথেকে শক্তিশালী বা আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অস্ত্রে সবথেকে সুসজ্জিত পুরুষদের বাছে না, তবে প্রাণবন্ত, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং অন্যান্য ব্যাপারে সবথেকে আকর্ষণীয় পুরুষদের বেছে নিতে তাদের ভুল হয় না। এইভাবে আগে থেকে যারা জোড় বাঁধে, সেইসব স্ত্রী-পুরুষেরা তাদের বংশবৃদ্ধির ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় কিছুটা বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে। বহু প্রজন্ম ধরে এই ঘটনাটা চলতে চলতে পুরুষদের শক্তি আর লড়াই করার ক্ষমতা তো বাড়েই, সেইসঙ্গেই তাদের বিভিন্ন অঙ্গসজ্জা বা অন্যান্য আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলোও উন্নত হয়ে ওঠে।

এর উল্টোদিকে থাকে একটি বিরলতর ঘটনা—পুরুষ-প্রাণী কর্তৃক বিশেষ কোনও স্ত্রী-প্রাণীকে বেছে নেওয়া। এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার একান্তই স্পষ্ট—যে-সব পুরুষরা

৪। মুককীট অবস্থা থেকে প্রতি বছর যে-সব স্ত্রী-মৌমাছি প্রথম বেরিয়ে আসে, তাদের ব্যাপারে এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন হেরমান মুলার। দ্রষ্টব্য, তাঁর বিশিষ্ট রচনা, 'Anwendung den Darwin'schen Lehre auf Bienen.' 'Verh. d. v. Jahrg.' xxix, পৃঃ ৪৫।

৫। এ সম্পর্কে মুরগিদের ব্যাপারে কিছু তথ্য আমার হাতে এসেছে। সেগুলোর কথা যথাস্থানে উল্লেখ করা যাবে। পাখিদের মধ্যেও এই ব্যাপারটা দেখা যায়। যেমন ঘুঘুপাখিরা সাধারণত সারা জীবনের জন্যেই জোড় বাঁধে। কিন্তু মিঃ জেনার ভাইর আমাকে জানিয়েছেন যে পুরুষ-পাখিরা কোনওভাবে আহত হলে কিংবা দুর্বল হয়ে পড়লে স্ত্রী-পাখিরা তাদের ত্যাগ করে চলে যায়।

সবথেকে বেশি প্রাণশক্তিসম্পন্ন এবং যারা অন্যদের পরাজিত করেছে, একমাত্র তাদের সামনেই থাকে সঙ্গিনী বেছে নেওয়ার অবাধ সুযোগ। তারা যে প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও আকর্ষণীয় স্ত্রী-প্রাণীদেরই বেছে নেবে, সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই বললেই চলে। বংশবৃদ্ধির ব্যাপারে এই ধরনের যুগলদের একটা বাড়তি সুবিধা থাকে, বিশেষ করে পুরুষটি যদি স্ত্রীটিকে মিলনের মরশুমে রক্ষা করতে পারে (উন্নততর কিছু জীবজন্তুর ক্ষেত্রে যেমনটা দেখা যায়) অথবা বাচ্চাদের দেখাশোনার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে, তাহলে তো বটেই। প্রতিটি লিঙ্গের সদস্যরা যদি বিপরীত লিঙ্গের বিশেষ কয়েকজনকে পছন্দ করত ও বেছে নিত, তাহলে সেক্ষেত্রেও এই একই নীতি প্রযোজ্য হত। কারণ সেক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হত যে তারা শুধু বিপরীত লিঙ্গের অধিকতর আকর্ষণীয় সদস্যদেরই বাছবে না, সেই সঙ্গেই বেছে নেবে অধিকতর প্রাণশক্তিসম্পন্ন স্ত্রী বা পুরুষকেই।

স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাত। আমি আগেই বলেছি যে স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যা অনেক বেশি হলে যৌন নির্বাচন ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে উঠত। বেশ কিছু জীবজন্তুর মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাত নিয়ে যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি আমি। তবে এই অনুসন্ধানের উপাদান ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। এখানে আমি ওই অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সংক্ষিপ্তসারটুকুই শুধু উল্লেখ করে যাব। বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে পরে আলোচনা করব, অন্যথায় আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় থেকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। জন্মের সময় স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাতের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যেতে পারে একমাত্র গৃহপালিত পশুদের মধ্যেই। কিন্তু এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত নথি নেই। তবে পরোক্ষ উপায়ে আমি বেশ কিছু পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে পেরেছি যা থেকে বোঝা যায় যে আমাদের গৃহপালিত জীবজন্তুদের অধিকাংশের মধ্যেই স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাতটা জন্মের সময় প্রায় সমান সমানই থাকে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াদের ব্যাপারে একটা পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে—একুশ বছরে ২৫৫৬০-টি ঘোড়ার জন্ম হয়েছে, যার মধ্যে পুরুষ আর স্ত্রী-প্রাণীর অনুপাত ৯৯.৭ ও ১০০। গ্রেহাউন্ডদের ক্ষেত্রে অসমতাটা অন্য প্রাণীদের থেকে বেশি। বারো বছরে জন্মানো ৬৮৭৮-টি গ্রেহাউন্ডের মধ্যে পুরুষ আর স্ত্রী-প্রাণীর অনুপাত ছিল ১১০.১ ও ১০০। তবে গৃহপালিত অবস্থায় না থেকে প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকলেও এই অনুপাতটা একই থাকত বলে ধরে নেওয়াটা খুব নিরাপদ নয়, কারণ অবস্থার খুব সামান্য এবং অজানা কিছু পার্থক্যও স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাতকে প্রভাবিত করে থাকে। মানুষের দিকে তাকালে দেখা যায় প্রতি ১০০ জন নারী-শিশু পিছু পুরুষ-শিশুর জন্মের হার ইংল্যান্ডে ১০৪.৫ জন, রাশিয়ায় ১০৮.৯ জন এবং

লিভোনিয়ার ইহুদিদের ক্ষেত্রে ১২০ জন। এই পরিচ্ছেদের সংযোজনী অংশে জন্মের সময় পুরুষদের সংখ্যাধিকের এই কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব আমি। তবে উত্তমাশা অন্তরীপে একটু অন্য ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ওখানকার ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে কয়েক বছরে ১০০ জন নারী-শিশু পিছু পুরুষ-শিশু জন্মেছে ৯০ থেকে ৯৯ জন।

আপাত আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নারী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাত, এবং শুধু জন্মের সময়েই নয়, পূর্ণবয়স্ক হয়ে ওঠার পরে নারী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাতও আমাদের বিচার্য বিষয়। এইখানে এসে আর-একটা সন্দেহজনক বিষয় আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, কারণ এটা সুবিদিত যে মানুষের মধ্যে জন্মের আগেই বা প্রসবের সময়ে এবং শৈশবের প্রথম কয়েকটা বছরে পুরুষ-শিশুদের মৃত্যুর হার নারী-শিশুদের মৃত্যুর হারের চেয়ে অনেক বেশি। পুরুষ-ভেড়াদের ক্ষেত্রে এবং সম্ভবত অন্য কিছু জীবজন্তুর ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। কয়েকটা প্রজাতির পুরুষরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে পরস্পরকে হত্যা করে কিংবা একেবারে নিস্তেজ হয়ে না-পড়া পর্যন্ত পরস্পরকে তাড়া করে চলে। স্ত্রী-প্রাণীদের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘোরার সময়েও তাদের নিশ্চয়ই নানান বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। কয়েক ধরনের মাছের মধ্যে পুরুষ-মাছেরা আকারে স্ত্রী-মাছেদের থেকে অনেকটা ছোট হয় এবং খুব সম্ভবত স্ত্রী-মাছেরা অথবা অন্য মাছেরা তাদেরকে অনেক সময় খেয়েও ফেলে। কয়েক ধরনের পাখিদের মধ্যে স্ত্রী-পাখিরা পুরুষ-পাখিদের থেকে আগে মারা যায়। নিজের বাসার মধ্যে অথবা বাচ্চাদের দেখাশোনা করার সময়েও তাদের মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। কীটপতঙ্গের ক্ষেত্রে পুরুষ-শূককীটের চেয়ে স্ত্রী-শূককীটের আকার প্রায়শই বড় হয়, ফলে অন্য কোনও প্রাণীর তাদেরকে খেয়ে ফেলার সম্ভাবনাটাও বেশিই থাকে। অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী-প্রাণীরা পূর্ণবয়স্ক পুরুষ-প্রাণীদের তুলনায় কম কর্মক্ষম এবং কম গতিসম্পন্ন হয়, ফলে বিপদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে অসুবিধেটা বেশিই হয় তাদের। এইসব ব্যাপার থেকে বোঝা যায় যে প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকা জীবজন্তুদের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাত নির্ণয়ের ব্যাপারে কিছু আনুমানিক হিসেবের ওপরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাতের মধ্যে বিরাট কোনও পার্থক্য থাকলে আলাদা কথা, অন্যথায় এ ধরনের হিসেবের বিশ্বাসযোগ্যতা খুবই কম। তা সত্ত্বেও সংযোজনী অংশে প্রদত্ত তথ্যসমূহ থেকে আমরা অন্তত এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কয়েক ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী, বেশ কিছু পাখি, কয়েক ধরনের মাছ আর কীটপতঙ্গের মধ্যে স্ত্রী-প্রাণীর তুলনায় পুরুষ-প্রাণীর সংখ্যা অনেক বেশি হয়।

স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাতে এক এক বছর অন্তর কিছুটা ওঠানামা ঘটতে দেখা যায়। ঘোড়াদের ক্ষেত্রে ১০০-টি মাদি-ঘোড়া পিছু পুরুষ-ঘোড়ার জন্মের হার এক বছরে ১০৭.১ জন থেকে পরের বছরে ৯২.৬ জনে নেমে যায়, গ্রেহাউন্ডদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ১১৬.৩ জন থেকে নেমে যায় ৯৫.৩ জনে। তবে ইংল্যান্ডের থেকে বড় কোনও এলাকা জুড়ে সমীক্ষা চালিয়ে এর থেকে বেশি সংখ্যক প্রাণীর জন্ম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে হয়তো দেখা যেত যে সংখ্যাগত অনুপাতের ক্ষেত্রে তেমন কোনও ওঠানামা ঘটে না। আর তেমনটা হলে প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকার সময় কার্যকরী যৌন নির্বাচন ঘটার সম্ভাবনাও কমে যায়। তথাপি কিছু কিছু বন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে (যেমনটা সংযোজনী অংশে দেখানো হয়েছে) এই সংখ্যাগত অনুপাতটা ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে যথেষ্ট ওঠানামা করে এবং তা কার্যকরী যৌন নির্বাচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কারণ দেখা গেছে, যে-সব পুরুষরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করতে সক্ষম হয় অথবা নারীদের কাছে যারা সবথেকে বেশি আকর্ষণীয়, তারা কয়েক বছর ধরে কিংবা কোনও বিশেষ অঞ্চলে যে-সুবিধাটুকু অর্জন করে সেটা তাদের সন্তানদের মধ্যে খুব সম্ভবত সঞ্চারিত হয় এবং পরবর্তীকালেও তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। পরবর্তী ঋতুগুলোতে যখন (স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা সমান হওয়ার দরুন) প্রতিটি পুরুষই একটি করে স্ত্রীকে দখল করতে সক্ষম হয়, তখন দুর্বল বা কম আকর্ষণীয় পুরুষদের পক্ষে সন্তানের জন্ম দেওয়াটা যতটা সুযোগ থাকবে, আগের ঋতুতে জন্মানো শক্তিশালী ও বেশি আকর্ষণীয় পুরুষদের সুযোগ তার চেয়ে বেশি যদি না-ও হয়, কম অন্তত হবে না।

বহুগামিতা। স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যায় সমতা না থাকলে যা ঘটতে পারে, তারই প্রতিফলন ঘটে বহুগামিতার মধ্যে। প্রতিটি পুরুষ দুই বা ততোধিক স্ত্রী-প্রাণীকে দখল করে আর অনেক পুরুষ কোনও সঙ্গিনীই জোটাতে পারে না। এই শেষোক্তরা নিশ্চিতভাবেই দুর্বলতর বা কম আকর্ষণীয় পুরুষ। অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং কয়েক ধরনের পাখিরা বহুগামী হয়ে থাকে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর কোনও প্রাণীদের মধ্যে বহুগামিতার অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি আমি। বেশ কিছু স্ত্রী-প্রাণীকে দখল করে তাদের নিয়ে একটা নিজস্ব হারেম গড়ে তোলার মতো বুদ্ধিমত্তা বোধহয় এইসব প্রাণীদের নেই। বহুগামিতা আর অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহের বিকাশের মধ্যে একটা সম্পর্ক যে আছেই, সেটা নিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া যায়। স্ত্রীদের তুলনায় পুরুষদের সংখ্যা বেশি হলে সেটা যে যৌন নির্বাচনের পক্ষে অনুকূলই হয়ে থাকে—এই মতবাদেরও সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় পূর্বোক্ত ধারণাটির মধ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরোপুরি একগামী অনেক প্রাণীদের মধ্যে, বিশেষত পাখিদের মধ্যে, খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ করা যায়, আবার বহুগামী কিছু প্রাণীর মধ্যে এইসব বৈশিষ্ট্য একেবারেই অনুপস্থিত থাকে।

প্রথমে আমরা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব, তারপর আলোচনা করব পাখিদের নিয়ে। গরিলারা বহুগামী বলেই মনে হয় এবং পুরুষ-গরিলাদের সঙ্গে স্ত্রী-গরিলাদের প্রচুর পার্থক্য থাকে। দলবদ্ধভাবে বসবাসকারী কয়েক ধরনের বেবুনের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এদের দলগুলোয় পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের তুলনায় পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার মাইসেটিস কারায়া-দের স্ত্রী আর পুরুষ প্রাণীর মধ্যে গায়ের রঙ, মুখমণ্ডলের রোম এবং স্বরযন্ত্রের ব্যাপারে স্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। এদের পুরুষ-প্রাণীরা দু'-তিনটি স্ত্রী-প্রাণীকে নিয়ে বসবাস করে। সেবুস কাপুসিনাস-দের পুরুষরা স্ত্রী-প্রাণীদের থেকে কিছুটা আলাদা হয় এবং বহুগামী হয়। অন্যান্য বানরদের ব্যাপারে এ সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা নেই, তবে এদের কয়েকটা প্রজাতি পুরোপুরি একগামী হয়। রোমস্থক প্রাণীরা স্পষ্টতই বহুগামী হয়ে থাকে এবং অন্য যে-কোনও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের চেয়ে এদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্যটাও অনেক সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। আত্মরক্ষা ও আক্রমণের অস্ত্রের ব্যাপারে পার্থক্য তো থাকেই, অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও নানান পার্থক্য লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ হরিণ, গবাদি পশু আর ভেড়ারা বহুগামী হয়, তবে এদের মধ্যে কাউকে কাউকে একগামী হতেও দেখা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণসার মৃগদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্যর অ্যান্ড্রু স্মিথ বলেছেন যে প্রায় বারোজনের এক-একটা দলে একজনের বেশি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ কদাচিৎ দেখা যায়। এশিয়ার কৃষ্ণসার সাইগা-রা (antelope saiga) সম্ভবত পৃথিবীর সবথেকে অবাধ বহুগামী প্রাণী। প্যালাস বলেছেন যে এদের এক-একজন পুরুষ তার সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে হঠিয়ে দিয়ে শ'খানেক স্ত্রী-প্রাণীকে দখল করে এবং তাদের নিয়ে থাকে। এদের স্ত্রী-প্রাণীদের কোনও শিং থাকে না, শরীরের রোমগুলোও পুরুষদের থেকে কোমল হয়, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীদের তেমন কোনও পার্থক্য থাকে না। ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের এবং উত্তর আমেরিকার পশ্চিমপ্রান্তীয় প্রদেশসমূহের বন্য পুরুষ-ঘোড়ারা বহুগামী হয়, কিন্তু বড় চেহারা আর শরীরের অনুপাতের তফাত ছাড়া মাদি-ঘোড়াদের সঙ্গে তাদের অন্য কোনও পার্থক্য থাকে না। বুনো পুরুষ-শুয়োরদের বড় বড় দাঁত আর অন্য কয়েকটা ব্যাপারের মধ্যে তাদের লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। ইউরোপে ও ভারতবর্ষে এই বুনো পুরুষ-শুয়োররা একমাত্র প্রজনের মরশুমটা বাদ দিয়ে অন্য সময়টা একা-একাই বাস করে। স্যর ডব্লিউ. এলিয়ট ভারতবর্ষে এই প্রাণীটিকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি দেখেছেন প্রজননের মরশুমে এরা প্রত্যেকে বেশ কিছু মাদি-শুয়োরের সঙ্গে বসবাস করে। ইউরোপের বুনো শুয়োরদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য কিনা বলা মুশকিল, তবে সেখানেও এর সমর্থনে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। বুনো শুয়োরের মতোই ভারতবর্ষের পূর্ণবয়স্ক

বুনো পুরুষ-হাতিরাও বছরের বেশির ভাগ সময়টা একা-একাই থাকে। কিন্তু ডঃ ক্যাম্পবেল বলেছেন, দলবদ্ধভাবে থাকার সময় 'একদল স্ত্রী-হাতির মধ্যে একের বেশি পুরুষ-হাতিকে কদাচিৎই থাকতে দেখা যায়।' আকারে বৃহত্তর পুরুষ-হাতিরা আকারে ছোট ও দুর্বলতর পুরুষদের তাড়িয়ে দেয় কিংবা মেরে ফেলে। স্ত্রীদের সঙ্গে পুরুষদের পার্থক্য থাকে বড় বড় দাঁতে, বড় আকারে, শক্তিতে এবং সহ্যক্ষমতায়। সবকিছু মিলিয়ে পার্থক্যটা এতই বেশি যে ধরা পড়ার পর পুরুষ-হাতির দাম স্ত্রী-হাতিদের চেয়ে এক-পঞ্চমাংশ বেশি হয়। অন্যান্য স্থূলচর্ম প্রাণীদের (গণ্ডার ইত্যাদি) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য খুব একটা থাকে না অথবা আদৌ থাকে না, আর যতদূর জানা গেছে তাতে মনে হয় এরা বহুগামী নয়। হাত, শুঁড় বা দাঁড়াবিশিষ্ট (Cheiroptera), দন্তহীন স্তন্যপায়ী, পতঙ্গভূক এবং তীক্ষ্ণদন্তী প্রাণীদের কোনও প্রজাতির মধ্যেও বহুগামিতার কথা আমার জানা নেই—শুধু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। কয়েকজন ইঁদুর-ধরিয়ে জানিয়েছেন যে তীক্ষ্ণদন্তী প্রাণীদের মধ্যে সাধারণ ধেড়ে-ইঁদুরদের পুরুষরা বেশ কয়েকজন স্ত্রী-ইঁদুরকে নিয়ে বসবাস করে। তা সত্ত্বেও দন্তহীন স্তন্যপায়ী শ্রেণীর কিছু কিছু প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে কাঁধের রোমগুচ্ছের চরিত্র ও রঙের ব্যাপারে কিছু পার্থক্য থাকে। নানা জাতের বাদুড়দের (Cheiroptera গোত্রের) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বেশ সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এদের পুরুষদের শরীরে গন্ধনিঃসরণকারী গ্রন্থি ও দেহস্থ থলি থাকে এবং তাদের গায়ের রঙও কিছুটা হালকা হয়। তীক্ষ্ণদন্তী প্রাণীদের বিভিন্ন প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রায় কোনও পার্থক্যই থাকে না (অন্তত আমার জানা নেই), থাকলেও বড়জোর লোমের রঙের ছোপে সামান্য কিছু পার্থক্য থাকতে পারে।

স্যর অ্যান্ড্রু স্মিথ আমাকে জানিয়েছেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার সিংহরা কখনও-কখনও একটিমাত্র সিংহীকে নিয়ে থাকলেও সাধারণত তারা একাধিক সিংহীকে নিয়েই থাকে, এবং একটি ক্ষেত্রে একটি সিংহকে একসঙ্গে পাঁচটি সিংহীকে নিয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। অর্থাৎ এরা বহুগামী। আমি যতদূর জানি তাতে দক্ষিণ আফ্রিকার এই সিংহরাই স্থলচর মাংসাশী স্তন্যপায়ীদের যাবতীয় প্রজাতির মধ্যে একমাত্র বহুগামী প্রাণী এবং শুধুমাত্র এদের ক্ষেত্রেই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সুস্পষ্ট লিঙ্গগত পার্থক্য চোখে পড়ে। তবে সামুদ্রিক মাংসাশী স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। সীলমাছেদের নানান প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য থাকে এবং এদের পুরুষেরা পুরোপুরি বহুগামী হয়। পেরন-এর মতে, দক্ষিণ সমুদ্রের সমুদ্র-হস্তীদের (Sea-elephant) পুরুষরা সর্বদা বেশ কয়েকটি স্ত্রী-প্রাণীকে নিয়ে থাকে এবং ফর্স্টারের সি-লায়নদের (ক্ষুদ্র সামুদ্রিক মাছবিশেষ) পুরুষরা সর্বদাই কুড়ি থেকে তিরিশটি স্ত্রী-প্রাণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। উত্তরাঞ্চলে স্টেলারের পুরুষ

মেরু-ভল্লুকদের চারপাশে আরও বেশি সংখ্যক স্ত্রী-প্রাণী থাকে। ডঃ গিল বলেছেন যে একগামী প্রজাতিদের মধ্যে 'অথবা যারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বাস করে তাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের আকারের তেমন কোনও পার্থক্য থাকে না। কিন্তু সমাজবদ্ধ প্রজাতিদের মধ্যে, কিংবা বলা ভাল যে-সব প্রজাতির পুরুষরা বেশ কিছু স্ত্রী-প্রাণীকে নিয়ে নিজস্ব হারেম বানায় তাদের মধ্যে, স্ত্রীদের তুলনায় পুরুষরা আকারে অনেক বড় হয়।' ব্যাপারটা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

পাখিদের যে-সব প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য থাকে, তাদের পুরুষরা সবক্ষেত্রেই একগামী হয়। গ্রেট ব্রিটেনে আমরা সুচিহ্নিত লিঙ্গগত পার্থক্যের অনেক নজির খুঁজে পাই, যেমন বুনো হাঁসেরা একটিমাত্র হংসীর সঙ্গেই জোড় বাঁধে, এবং সাধারণ শ্যামাপাখি আর বালফিঞ্চ পাখিরা সারা জীবনের জন্যই একটিমাত্র স্ত্রী-পাখির সঙ্গে জোড় বাঁধে বলে শোনা যায়। মিঃ ওয়ালেস আমাকে জানিয়েছেন যে দক্ষিণ আমেরিকার চড়াই (chatterer) বা কোটিংগিডি পাখিদের ক্ষেত্রে এবং অন্য আরও বেশ কিছু পাখিদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। কয়েকটি প্রজাতির প্রাণীরা বহুগামী না একগামী, তা আমি নির্ণয় করে উঠতে পারিনি। লেসন বলেছেন যে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যবিশিষ্ট বার্ড অফ প্যারাডাইসরা (সুন্দর ডানাওয়ালা বায়সজাতীয় পাখি) বহুগামী হয়, কিন্তু তাঁর এই মন্তব্য যথেষ্ট তথ্যভিত্তিক কিনা সে ব্যাপারে মিঃ ওয়ালেস সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মিঃ স্যাল্‌ভিন আমাকে জানিয়েছেন যে খঞ্জনা পাখিরা (humming-bird) বহুগামী হয়। ল্যাজের পালকগুচ্ছের জন্য প্রসিদ্ধ পুরুষ উইডো-বার্ডরা (বাবুই জাতীয় পাখি) স্পষ্টতই বহুগামী হয়।[৬] মঃ জেনার ভাইর এবং অন্য কয়েকজনের কাছ থেকে আমি জেনেছি যে তিনটি স্টার্লিং পাখি প্রায়শই এক বাসায় বাস করে। তবে এটা পুরুষ-পাখিদের বহুগামিতা নাকি স্ত্রী-পাখিদের বহুগামিতা, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।

হাঁসমুরগি জাতীয় পাখিদের (Gallinaceae) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেও বার্ড অফ প্যারাডাইস বা খঞ্জনা পাখিদের মতো সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে। এদের অনেক প্রজাতির পুরুষরা বহুগামী হয়, অন্যরা পুরোপুরি একগামী হয়। বহুগামী ময়ূর বা ফেজ্যান্ট পাখিদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এবং একগামী গিনি-ফাউল (মোরগ জাতীয় পাখি) বা প্যাট্রিজদের (তিতির জাতীয় পাখি) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকে। এ-রকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন গ্রাউস (লিপ্তপাদ পাখিবিশেষ) বর্গের

৬। 'দ্য ইবিস', খণ্ড ৩, পৃঃ ১৩৩, প্রোন উইডো-বার্ড (Progne Widow-bird) প্রসঙ্গে। এছাড়াও দ্রষ্টব্য, 'ভিড়ুয়া অ্যাক্সিলারিস' প্রসঙ্গে, ঐ, খণ্ড ২, পৃঃ ২১১। ক্যাপার-কেইল্‌জি আর গ্রেট বাস্টার্ডদের বহুগামিতা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য এল. লয়েড, 'গেম বার্ডস অফ সুইডেন,' পৃঃ ১৯ ও ১৮২। মন্টাগু এবং সেল্‌বি বলেছেন—ব্ল্যাক গ্রাউসরা বহুগামী আর রেড গ্রাউসরা একগামী হয়ে থাকে।

পাখিদের কথা ধরা যাক। এদের মধ্যেকার বহুগামী ক্যাপারকেইল্‌জি আর ব্ল্যাক কক্‌দের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিশাল পার্থক্য থাকে, আবার একগামী রেড গ্রাউস আর টারমিগানদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য থাকে না। কারসোর বর্গের পাখিদের মধ্যে বাস্টার্ডরা ছাড়া অন্য খুব কম প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে, এবং গ্রেট বাস্টার্ডরা (Otis tarda) বহুগামী হয়। গ্রালাটোর বর্গের বিভিন্ন প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম, শুধু রাফদের (Machetes pugnax—কাদাখোঁচা জাতীয় পাখি) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে। আর, মন্টাগুর মতে, এই প্রজাতির পুরুষরা বহুগামী হয়। এইসব তথ্য থেকে মনে হয় যে পাখিদের ক্ষেত্রে পুরুষদের বহুগামিতার সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য গড়ে ওঠার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। চিড়িয়াখানার সঙ্গে যুক্ত মিঃ বার্লেট পাখিদের ব্যাপারে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম পুরুষ-ট্রাগোপানরা (হাঁস-মুরগি জাতীয় এক ধরনের পাখি) বহুগামী হয় কিনা। উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'ঠিক জানি না, তবে ওদের শরীরের রঙের বাহার দেখে মনে হয় ওদের পক্ষে বহুগামী হওয়াটাই স্বাভাবিক।'

গৃহপালিত অবস্থায় পাখিদের মধ্যে একজন মাত্র স্ত্রী-র সঙ্গে জোড় বাঁধার সহজাত প্রবৃত্তিটা খুব সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। এই ব্যাপারটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বুনো পুরুষ-হাঁসেরা পুরোপুরি একগামী হয়, কিন্তু গৃহপালিত পুরুষ-হাঁসেরা একান্তভাবেই বহুগামী। রেভারেন্ড ডব্লিউ. ডি. ফক্স আমাকে একটি ঘটনার কথা জানিয়েছেন। তাঁর বাড়ির কাছে একটা বড় পুকুরে আধা-গৃহপালিত কিছু বুনো হাঁস থাকত। শিকারভূমির জনৈক রক্ষী গুলি করে অনেকগুলো পুরুষ-হাঁসকে মেরে ফেলে। ফলে প্রতি সাত-আটজন হংসী পিছু একটা করে পুরুষ-হাঁস টিকে ছিল। অথচ সেই অবস্থাতেও কিন্তু তাদের ব্যাপক বংশবিস্তার ঘটেছিল। গিনি-ফাউলরা পুরোপুরি একগামী। কিন্তু মিঃ ফক্স দেখেছিলেন দু'-তিনটি মুরগির সঙ্গে একটা মোরগকে রাখলে তারা সবথেকে ভালভাবে বংশবিস্তার করতে পারে। প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকার সময় ক্যানারি পাখিরা একটি পুরুষ আর একটি নারীতে জোড় বাঁধে, কিন্তু ইংল্যান্ডের পক্ষীপালকরা চার-পাঁচটি স্ত্রী-পাখির সঙ্গে একটি পুরুষ-পাখিকে রেখে অত্যন্ত ভাল ফল পেয়েছেন। এইসব ঘটনা থেকে আমার মনে হয়েছে, বন্য একগামী প্রজাতির পুরুষরা যে-কোনও মুহূর্তেই সাময়িকভাবে অথবা পাকাপাকিভাবে বহুগামী হয়ে উঠতে পারে।

সরীসৃপ আর মাছেদের স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের ধরনটা কেমন, সে ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানা নেই আমাদের। তবে এদের মধ্যে স্টিক্‌ল্‌ব্যাক্‌রা (Gasterosteus)

বহুগামী হয় বলে জানা গেছে। তাছাড়া প্রজননের মরশুমে এদের পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীদের পার্থক্যটাও অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে।

অপ্রধান লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যসমূহের বিকাশকে কোন্ কোন্ উপায়ে প্রভাবিত করেছে যৌন নির্বাচন, তার একটা সারসংক্ষেপ করা যাক এবার। সবথেকে শক্তিশালী, অস্ত্রশস্ত্রে সবথেকে সুসজ্জিত এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াইয়ে বিজয়ী পুরুষ-প্রাণীরা সবথেকে বেশি প্রাণশক্তিসম্পন্ন, সবথেকে সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন স্ত্রী-প্রাণীদের সঙ্গে (যারা প্রজননের মরশুমে অন্যদের থেকে আগেই সন্তানের জন্ম দিতে পারবে) জোড় বাঁধলে যে সবথেকে বেশি সংখ্যক হৃষ্টপুষ্ট সন্তানের জন্ম দিতে পারে, তা আমরা আগেই দেখেছি। এইসব স্ত্রী-প্রাণীরা তাদের সঙ্গী হিসেবে অধিকতর আকর্ষণীয় এবং প্রাণশক্তিসম্পন্ন পুরুষদের বেছে নিলে দুর্বলতর স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম হবে তারা। দুর্বলতর স্ত্রী-প্রাণীরা তখন কম আকর্ষণীয় ও কম প্রাণশক্তিসম্পন্ন পুরুষদের সঙ্গে জোড় বাঁধতে বাধ্য হবে। আবার অধিকতর প্রাণশক্তিসম্পন্ন পুরুষরা যদি অধিকতর আকর্ষণীয়, সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন স্ত্রী-প্রাণীদের বেছে নেয়, তাহলেও ঘটনাটা একই ঘটবে। পুরুষরা যদি স্ত্রী-প্রাণীদের যথাযথভাবে রক্ষা করে এবং বাচ্চাদের জন্যে খাবার সংগ্রহ করতে সাহায্য করে, তাহলে ফলটা আরও ভাল হবে। এইভাবে বেশি সংখ্যক সন্তানের জন্ম দেওয়া আর তাদের লালনপালনের ব্যাপারে অধিকতর প্রাণশক্তিসম্পন্ন যুগলরা যে বাড়তি সুবিধেটা লাভ করে, সেটা যৌন নির্বাচনকে কার্যকরী হয়ে উঠতে সাহায্য করে থাকে। তবে স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যা অনেক বেশি হলে যৌন নির্বাচন আরও বেশি কার্যকরী হয়ে ওঠে। এই সংখ্যাধিক্যটা সাময়িক ও স্থানীয় অথবা স্থায়ী সংখ্যাধিক্য হতে পারে, জন্মের সময় থেকেই থাকতে পারে কিংবা পরবর্তীকালে স্ত্রী-প্রাণীদের বেশি সংখ্যায় ধ্বংসপ্রাপ্তির ফলে হতে পারে, অথবা পুরুষদের বহুগামিতার অপ্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবেও দেখা দিতে পারে। সংখ্যাধিক্যটা যেভাবেই ঘটুক না কেন, তার ফলাফল সবসময় একই হয়—আরও বেশি কার্যকরী হয়ে ওঠে যৌন নির্বাচনের নীতি।

স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীরাই সাধারণত বেশি পরিবর্তিত হয়েছে : সমগ্র প্রাণীজগতের যেখানে স্ত্রী-পুরুষের বাহ্যিক চেহারায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, সেখানেই দেখা যায় স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীরা অনেক বেশি পরিবর্তিত হয়েছে (দু'-একটা ব্যতিক্রম বাদে)। স্ত্রী-প্রাণীদের সঙ্গে সাধারণত তার নিজের প্রজাতির বাচ্চাদের এবং একই বর্গের অন্যান্য পূর্ণবয়স্ক সদস্যদের বেশ ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকে। প্রায় সমস্ত প্রাণীরই পুরুষদের কামনা স্ত্রীদের তুলনায় অনেক তীব্র হয় এবং এর মধ্যেই ওই ঘটনার উৎস নিহিত আছে বলে মনে হয়। ওই কামনা থেকেই পুরুষরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, স্ত্রী-প্রাণীদের সামনে নিজেদের আকর্ষণীয় করে

তোলার জন্যে নানারকম কায়দা-কসরত করে এবং বিজয়ী পুরুষেরা তাদের নিজেদের উৎকৃষ্টতাটা সঞ্চারিত করে দেয় তাদের পুরুষ-সন্তানদের মধ্যে। পুরুষ-সন্তান ও স্ত্রী-সন্তান উভয়েই কেন তাদের পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর সমান উত্তরাধিকারী হয় না, তা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পুরুষরা যে কামার্ত হয়ে স্ত্রী-প্রাণীদের পিছনে ধাওয়া করে, সেটা সকলেরই জানা। পাখিদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তবে মোরগরা অনেক সময় মুরগিদের পিছনে সেভাবে ধাওয়া করে না, বরং নিজেদের পালক দেখিয়ে, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে আর গলা থেকে নানারকম ডাক ছেড়ে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে মুরগিদের। কিছু কিছু মাছেদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যৌনমিলনের জন্য স্ত্রী-মাছেদের থেকে পুরুষ-মাছেরা অনেক বেশি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। বড় কুমিরদের (alligator) ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য এবং সম্ভবত উভচরদের (Batrachians) ক্ষেত্রেও। কার্বি-র মতে, সব ধরনের কীটপতঙ্গদের ক্ষেত্রেই 'নিয়মটা হল—পুরুষরা খুঁজে বেড়াবে স্ত্রীদের।' মিঃ ব্ল্যাকওয়েল এবং মিঃ সি. স্পেন্স বেট-এর মতো দুজন বিশেষজ্ঞ আমাকে জানিয়েছেন যে মাকড়সা এবং (চিংড়ি, কাঁকড়া জাতীয়) কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় ও অস্থির প্রকৃতির হয়ে থাকে। কীটপতঙ্গ ও কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের মধ্যে যে-সব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনও একটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে অনুভূতির ইন্দ্রিয় বা সঞ্চরণ-অঙ্গ আছে এবং অন্য লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে নেই, অথবা, সচরাচর যেমনটা দেখা যায়, একটি লিঙ্গের প্রাণীদের এই অঙ্গগুলো অন্য লিঙ্গের প্রাণীদের থেকে অনেক বেশি উন্নত, তখন প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ওই অঙ্গগুলো পুরুষ-প্রাণীদের শরীরেই আছে বা তাদের মধ্যেই ওই অঙ্গগুলো বেশি উন্নত হয়ে উঠেছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে পুরুষরাই সাধারণত বেশি সক্রিয় হয়ে থাকে।[৭]

অন্যদিকে, বিরলতম দু'-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া, প্রণয়ের ব্যাপারে স্ত্রী-প্রাণীদের আগ্রহ পুরুষদের থেকে অনেক কম হয়। হান্টার বহুদিন আগেই বলেছিলেন যে

৭। এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় এক ধরনের পরজীবী হাইমেনোপটেরাস পতঙ্গের মধ্যে (ওয়েস্টউড, 'মডার্ন ক্লাস অফ ইনসেক্টস', খণ্ড ২, পৃঃ ১৬০)। এদের পুরুষদের ডানাগুলো একেবারে প্রাথমিক বা লুপ্তপ্রায় ধরনের হয় এবং যে-কোষের মধ্যে এরা জন্মায় তা থেকে কখনও বেরিয়ে আসে না, অথচ এদের স্ত্রী-পতঙ্গের শরীরে সুগঠিত ডানা দেখা যায়। অডুইনের মতে, এই প্রজাতির স্ত্রী-পতঙ্গরা তাদের সঙ্গে একই কোষের মধ্যে জাত পুরুষ-পতঙ্গদের সহযোগেই গর্ভবতী হয়। তবে আমার মনে হয় এই প্রজাতির স্ত্রী-পতঙ্গেরা অন্যান্য কোষে যায় এবং সেখানেই গর্ভবতী হয়, আর তার ফলে জন্মসূত্রে নিকটসম্পর্কিতদের সহযোগে সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনাটাকেও পরিহার করতে পারে। পরে আমরা আরও কিছু বর্গের কথা জানতে পারব যাদের স্ত্রীরাই সাধারণত পুরুষদের খুঁজে বেড়ায় এবং প্রণয়প্রার্থনা করে।

স্ত্রী-প্রাণীটিকে সাধারণত 'প্রণয়ের জন্য মিনতি করতে হয়।' তারা লাজুক প্রকৃতির হয় এবং প্রায়শই পুরুষদের হাত থেকেই রেহাই পাওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টা চালিয়ে যায়। জীবজন্তুদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ যে-কোনও ব্যক্তিই এ ধরনের অনেক ঘটনার কথা মনে করতে পারবেন। বিভিন্ন তথ্য (পরে এ-রকম কিছু তথ্য পেশ করব আমরা) ও যৌন নির্বাচনের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে স্ত্রী-প্রাণীরা তুলনামূলকভাবে নিষ্ক্রিয় হলেও তাদের একটা পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার থাকে এবং অন্যান্য পুরুষদের ত্যাগ করে বিশেষ কোনও-একটি পুরুষকে গ্রহণ করে তারা। কখনও-কখনও এমনও দেখা যায় যে সবথেকে আকর্ষণীয় পুরুষটিকে গ্রহণ না করে সবথেকে কম অরুচিকর পুরুষটিকে গ্রহণ করে তারা। প্রণয়ের ব্যাপারে পুরুষদের অত্যধিক আগ্রহটা যেমন একটা সাধারণ নিয়ম, স্ত্রীদের এই পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটাকেও তেমনই একটা সাধারণ নিয়ম হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

এত ধরনের পৃথক পৃথক বর্গের পুরুষ-প্রাণীরা প্রণয়ের ব্যাপারে কেন স্ত্রী-প্রাণীদের থেকে বেশি আগ্রহী হয়, কেন তারা স্ত্রী-প্রাণীদের খুঁজে বেড়ায়, প্রেমনিবেদনের ব্যাপারে কেন তারাই সক্রিয় ভূমিকা নেয়—তার কারণটা আমাদের অনুসন্ধান করে দেখা উচিত। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই উভয়কে খুঁজে বেড়ালে সেটা মোটেই সুবিধেজনক ব্যাপার হত না এবং তার ফলে কিছুটা শক্তিক্ষয়ও ঘটত। কিন্তু তাই বলে পুরুষরাই কেন সবসময় সন্ধানকারীর ভূমিকাটা পালন করে? পরাগিত হওয়ার পর উদ্ভিদদের ডিম্বকগুলোর কিছুদিন পুষ্ট হওয়ার দরকার হয়, তারপর পরাগ এসে পড়ে স্ত্রী-অঙ্গে—কীটপতঙ্গের দ্বারা অথবা পুংকেশরের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ফলে পরাগ এসে পড়ে গর্ভমুণ্ডে। শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা ঘটে শুক্রাণুর সঞ্চরণ-শক্তির সাহায্যে। নিম্নশ্রেণীর জলচর প্রাণীরা, যারা বরাবর একই জায়গায় আবদ্ধ থাকে এবং যাদের লিঙ্গগুলি পৃথক পৃথক হয়, তাদের পুরুষ-উপাদানগুলোই এসে পড়ে স্ত্রী-উপাদানের ওপরে। এক্ষেত্রে কারণটা বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধে হয় না—গর্ভাধানের আগেই যদি ডিম্বাণু বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং তাকে পুষ্টি জোগানো বা রক্ষা করার দরকার যদি না হত, তাহলে পুরুষ-উপাদানকে স্থানান্তরিত করার তুলনায় ওই ডিম্বাণুকে স্থানান্তরিত করাটা অনেক বেশি দুরূহ হয়ে উঠত, কারণ পুরুষ-উপাদানের থেকে এগুলো আকারে বড় হয় বলে এগুলো তৈরিও হয় কম সংখ্যায়। এ ব্যাপারে উদ্ভিদদের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর বেশ কিছু প্রাণীর সাদৃশ্য দেখা যায়। এক জায়গায় আবদ্ধ ও জলচর প্রাণীদের পুরুষরা যেহেতু তাদের জনন-উপাদানকে এইভাবেই প্রেরণ করতে বাধ্য হয়, সেহেতু তাদের কোনও বংশধর ক্রমপর্যায়ে উন্নত হয়ে ওঠা এবং চলাচল করতে সক্ষম হয়ে ওঠার পরেও তার মধ্যে এই অভ্যাসটা রয়েই যায়। তারা স্ত্রী-প্রাণীদের যতটা সম্ভব কাছাকাছি

যাওয়ার চেষ্টা করে যাতে করে জলের মধ্যে তাদের জনন-উপাদানটা নষ্ট হওয়ার ভয় না থাকে। নিম্নশ্রেণীর কোনও কোনও প্রাণীদের শুধুমাত্র স্ত্রীরাই এক জায়গায় আবদ্ধ থাকে এবং সেইসব ক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারীর ভূমিকাটা পুরুষদের নিতেই হয়। কিন্তু যে-সব প্রজাতির উভয় লিঙ্গের পূর্বপুরুষরা একেবারে প্রথম থেকেই মুক্ত ছিল, সেইসব প্রজাতির ক্ষেত্রেও কেন পুরুষরাই সবসময় স্ত্রীদের খুঁজে বেড়ায় এবং স্ত্রীরা পুরুষদের খোঁজে না, তা বুঝে ওঠা দুষ্কর। তবে পুরুষরা যাতে এই খোঁজার কাজটা যথাযথভাবে করতে পারে, তার জন্য সব ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে খুব তীব্র কামনা থাকার দরকার হয়। যৌনমিলনের জন্য অধিকতর আগ্রহী পুরুষরা কম আগ্রহীদের তুলনায় অনেক বেশি সন্তানের জন্ম দিতে পারে এবং সেই সন্তানরা জন্মসূত্রেই এই ধরনের তীব্র কামনা অর্জন করে থাকে।

যৌনমিলনের জন্য পুরুষদের এই অত্যধিক আগ্রহের অপ্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই স্ত্রীদের তুলনায় অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের মধ্যে অনেক বেশি করে ফুটে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু পুরুষদের পরিবর্তনশীলতা স্ত্রীদের থেকে বেশি হলে (গৃহপালিত জীবজন্তুদের দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করে আমি দেখেছি পুরুষদের পরিবর্তনশীলতা সত্যিই অনেক বেশি) এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো আরও ভালভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারত। বিস্তৃত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ফন নাথুসিয়াস-ও এই একই মত পোষণ করেন। নোভারা অভিযান[৮] চলার সময় বিভিন্ন জাতির মানুষদের শরীরের বিভিন্ন অংশের মাপ নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। তা থেকে দেখা গিয়েছিল প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীদের তুলনায় পুরুষদের পরিবর্তনশীলতা অনেক বেশি হয়। এ ব্যাপারটা নিয়ে পরবর্তী কোনও পরিচ্ছেদে আলোচনা করব আমরা। মিঃ জে. উড, যিনি মানুষের পেশীসমূহের পরিবর্তনশীলতা নিয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধান চালিয়েছেন, তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, 'প্রতিটি ব্যাপারে সর্বাধিক সংখ্যক অস্বাভাবিকতা দেখা গেছে পুরুষদের মধ্যেই।' তার আগে তিনি বলেছিলেন, 'মোট ১০২ জন মানুষের প্রায় অর্ধেক জনের মধ্যে নারীদের থেকে অনেক বেশি বৈচিত্র্য দেখা গেছে, যা নারীদের পূর্ববর্ণিত অসম্পূর্ণতা সংক্রান্ত তত্ত্বের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়।' একইভাবে অধ্যাপক ম্যাকালিস্টারও বলেছেন যে পেশীর পরিবর্তন 'খুব সম্ভবত নারীদের থেকে পুরুষদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়।' কয়েকটা পেশী মানুষের শরীরে সাধারণত দেখা যায় না, কিন্তু যেখানে দেখা যায় সেখানেও নারীদের থেকে পুরুষদের শরীরেই সেগুলো উন্নততর অবস্থায় থাকে (দু'-একটা ব্যতিক্রমের কথা অবশ্য শোনা গেছে)। ডঃ বার্ট ওয়াইল্ডার হাত-পায়ে কুড়ির বেশি আঙুলবিশিষ্ট ১৫২ জন মানুষের

৮। 'Reise der Novara : Anthropolog. Theil,' পৃঃ ২১৬-২৬৯। ডঃ কে শার্জার এবং ডঃ শোয়ার্জ কৃত পরিমাপনের ভিত্তিতে হিসেবটা তৈরি করেছিলেন ডঃ ভাইসবাখ।

একটা তালিকা তৈরি করেছিলেন যাদের মধ্যে ৮৬ জনই ছিল পুরুষ, ৩৯ জন নারী (অর্থাৎ পুরুষদের অর্ধেকের চেয়েও কম), বাকি ২৭ জন নারী না পুরুষ জানা যায়নি। তবে মনে রাখা দরকার, এই ধরনের শারীরিক অস্বাভাবিকতা লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে পুরুষদের তুলনায় নারীরা অনেক বেশি সতর্ক থাকে। ডঃ এল. মেয়ার বলেছেন, নারীদের তুলনায় পুরুষদের কানের গড়ন বেশি পরিবর্তনশীল হয়। শেষত, নারীদের তুলনায় পুরুষদের শরীরের তাপও বেশিমাত্রায় পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে।

নারীদের তুলনায় পুরুষদের সাধারণত পরিবর্তনশীলতা বেশি হওয়ার কারণ কী, তা আমাদের জানা নেই। তবে আমরা জানি অপ্রধান লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যগুলো অত্যন্ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতির হয় এবং এই পরিবর্তনশীলতা কেবলমাত্র পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এখন আমরা দেখানোর চেষ্টা করব যে এই পরিবর্তনশীলতার কারণগুলোকে কিছুদূর পর্যন্ত বোঝা সম্ভব। যৌন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল হিসেবে পুরুষ-প্রাণীরা অনেক ব্যাপারেই তাদের নিজ নিজ প্রজাতির স্ত্রী-প্রাণীদের থেকে বহুলাংশে পৃথক হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই দু'ধরনের নির্বাচনের ফলগুলোকে বাদ দিলেও দেখা যায় শারীরিক গঠনকাঠামোর পার্থক্যের দরুন স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে অন্য ধরনের কিছু পার্থক্যও থাকে। ডিম্বাণু তৈরির জন্য স্ত্রী-প্রাণীদের যথেষ্ট শারীরিক উপাদান ব্যয় করতে হয়, অন্যদিকে পুরুষদের শক্তিক্ষয় হয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে, স্ত্রী-প্রাণীদের সন্ধানে এখানে-ওখানে ঘুরতে গিয়ে, গলা চিরে ডাকতে বা শিস্ দিতে গিয়ে, আকর্ষণকারী গন্ধ নিঃসরণ করা ইত্যাদি কাজে। এই শক্তিক্ষয়ের ব্যাপারটা সাধারণত খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়। সঙ্গমের মরশুমে পুরুষদের অতিরিক্ত সক্রিয়তার ফলে প্রায়শই তাদের গায়ের রঙ আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, পক্ষান্তরে স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে ওই সময় তেমন কোনও পরিবর্তন দেখা যায় না।[৯] মানুষের মধ্যে, এমনকী প্রাণীজগতের অনেক নিম্নস্তরে থাকা লেপিডোপ্টেরা-দের মধ্যেও পুরুষদের শরীরের উত্তাপ স্ত্রীদের থেকে বেশি হয় এবং সেইসঙ্গে মানুষের ক্ষেত্রে পুরুষদের নাড়ির গতি নারীদের থেকে একটু কম হয়। সবটা মিলিয়ে বলা যায়—স্ত্রী আর পুরুষের শারীরিক উপাদান ও শক্তি ব্যয়টা সম্ভবত প্রায় সমান সমানই, তবে দুটি লিঙ্গের ক্ষেত্রে এই ব্যয়টা কার্যকরী হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে ও ভিন্ন মাত্রায়।

৯। অধ্যাপক মান্টেগাজ্জার মতে ('Lettera a Carlo Darwin', 'Archivio per l' Anthropologia', ১৮৭১, পৃঃ ৩০৬) শুক্রতরল বা বীর্যের উপস্থিতি ও তা ধারণ করার ফলেই বহু পুরুষ-প্রাণীর গাত্রবর্ণে এই ঔজ্জ্বল্যটা দেখা যায়। কিন্তু তাঁর এই কথাটাকে কিছুতেই সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ অনেক পুরুষ-পাখিরই, যেমন ফেজ্যান্ট পাখিদের, গায়ের রঙ তাদের জীবনের প্রথম বছরের শরৎকালেই বেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য স্ত্রী আর পুরুষের শারীরিক গঠনকাঠামোয় কিছুটা পার্থক্য থাকতে বাধ্য, অন্তত প্রজননের মরশুমে তো বটেই। এমনকী তারা উভয়ে হুবহু একই অবস্থার মধ্যে থাকলেও তাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকবেই। এইসব পার্থক্যগুলো যদি স্ত্রী ও পুরুষদের কোনও কাজে না লাগে, তাহলে এগুলো যৌন নির্বাচন বা প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে বেড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্যমান কারণগুলো যদি স্থায়ীভাবে কাজ করে চলে তাহলে এই পার্থক্যগুলোও স্থায়ী হয়ে উঠতে পারে এবং বংশগতির নিয়ম মেনে পুরুষ-প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো পুরুষ-বংশধরদের মধ্যে আর স্ত্রী-প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো স্ত্রী-বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছু স্থায়ী অথচ গুরুত্বহীন পার্থক্য পাকাপাকিভাবেই থেকে যাবে। যেমন মিঃ অ্যালেন দেখিয়েছেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলে ও দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসকারী বেশ কিছু পাখির ক্ষেত্রে দেখা যায় উত্তরাঞ্চলের পাখিদের থেকে দক্ষিণাঞ্চলের পাখিদের গাত্রবর্ণ অনেক বেশি কাল্‌চে হয়। দুটো অঞ্চলের তাপমাত্রা, রৌদ্রকিরণ ইত্যাদি পার্থক্যের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই দুটো অঞ্চলে বসবাসকারী পাখিদের গায়ের রঙে এই পার্থক্যটা সৃষ্টি হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই প্রজাতির স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে এই পার্থক্যটা আলাদা আলাদা ভাবে ক্রিয়া করেছে। যেমন দক্ষিণাঞ্চলের এজিলোকাস ফিনিসিয়াস প্রজাতির পুরুষ-পাখিদের গায়ের রঙ খুব উজ্জ্বল, আবার ওই অঞ্চলের কার্ডিনালিস ভার্জিনিয়ানাস প্রজাতির স্ত্রী-পাখিদের গায়ের খুব উজ্জ্বল। কুইস্‌ক্যালাস মেজর প্রজাতির স্ত্রী-পাখিদের গায়ের রঙ অত্যন্ত পরিবর্তনশীল, কিন্তু এই প্রজাতির পুরুষ-পাখিদের গায়ের রঙে সাধারণত কোনও পরিবর্তন ঘটে না।

কয়েক ধরনের প্রাণীদের মধ্যে একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। এদের ক্ষেত্রে পুরুষদের পরিবর্তে স্ত্রী-প্রাণীরাই সুস্পষ্ট অপ্রধান লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকে, যেমন উজ্জ্বলতর গাত্রবর্ণ, বড় আকার, বেশি শক্তি বা যুদ্ধপ্রিয়তা ইত্যাদি। পাখিদের মধ্যে অনেক সময় উভয় লিঙ্গের নিজস্ব সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর একটা সামগ্রিক স্থানপরিবর্তন ঘটে যেতে দেখা যায়। এইসব ক্ষেত্রে প্রেম নিবেদনের ব্যাপারে স্ত্রী-পাখিরাই বেশি উন্মুখ হয়ে ওঠে আর পুরুষ-পাখিরা তুলনামূলকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, তবে ফলাফলের বিচার করলে দেখা যায় যে নিষ্ক্রিয় থাকলেও সঙ্গিনী হিসেবে তারা অধিকতর আকর্ষণীয় স্ত্রী-পাখিদেরই বেছে নেয়। এইভাবেই জাতের মোরগদের থেকে সেইসব জাতের মুরগিরা অনেক বেশি উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ বা অন্য ধরনের চাকচিক্যের অধিকারিণী হয়ে উঠেছে, সেইসঙ্গেই হয়ে উঠেছে মোরগদের তুলনায় বেশি শক্তিশালী ও বেশি যুদ্ধপ্রিয়। এদের এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো শুধুমাত্র তাদের স্ত্রী-সন্তানদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্বাচনের একটা দ্বিমুখী প্রক্রিয়াও দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ এইসব ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রাণীরা নির্বাচন করবে অধিকতর আকর্ষণীয় স্ত্রী-প্রাণীদের আর স্ত্রী-প্রাণীরা নির্বাচন করবে অধিকতর আকর্ষণীয় পুরুষ-প্রাণীদের। এই প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে দুটি লিঙ্গের প্রাণীদেরই কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে ঠিকই, কিন্তু এই প্রক্রিয়ার ফলে একটি লিঙ্গের প্রাণীদের সঙ্গে অপর লিঙ্গের প্রাণীদের কোনও পার্থক্য গড়ে উঠবে না—সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাদের রুচির মধ্যে পার্থক্য থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। তবে একমাত্র মানুষ ছাড়া অন্য কোনও প্রাণীর ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে অনেক প্রাণীর স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়, উভয়েই একই ধরনের চাকচিক্যে ভূষিত হয়। এই সাদৃশ্য গড়ে ওঠে যৌন নির্বাচনের ফল হিসেবেই। এই ধরনের ক্ষেত্রগুলোতে খানিকটা সঙ্গতভাবেই হয়তো বলা চলে যে যৌন নির্বাচনের একটা দ্বিমুখী বা পারস্পরিক প্রক্রিয়া এর পিছনে কাজ করেছে, বেশি প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও অকালপক্ক স্ত্রী-প্রাণীরা নির্বাচন করেছে অধিকতর আকর্ষণীয় ও বেশি প্রাণশক্তিসম্পন্ন পুরুষ-প্রাণীদের আর পুরুষ-প্রাণীরা একমাত্র অধিকতর আকর্ষণীয় স্ত্রী-প্রাণী ছাড়া অন্যদের প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু জীবজন্তুদের স্বভাবচরিত্র অনুযায়ী বিচার করলে এই মতটাকে সঠিক বলে গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভবই হয়ে পড়ে, কারণ পুরুষ-প্রাণীরা সাধারণত যে-কোনও স্ত্রী-প্রাণীর সঙ্গেই মিলিত হওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। বরং এর থেকে অনেক বেশি সম্ভাব্য যুক্তি হল এই যে, স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান চাকচিক্যগুলো প্রথমে কোনও একটা লিঙ্গের প্রাণীরাই (সাধারণত পুরুষরাই) অর্জন করেছিল, পরে তাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয় লিঙ্গের সন্তানদের মধ্যেই সেগুলো সঞ্চারিত হয়ে গেছে। কোথাও যদি এমনটা হয়ে থাকে যে বেশ দীর্ঘ একটা সময়কাল জুড়ে কোনও প্রজাতির পুরুষদের সংখ্যা স্ত্রী-প্রাণীদের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে গেল, তারপর সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় একটা দীর্ঘ সময়কাল জুড়ে স্ত্রী-প্রাণীরা পুরুষ-প্রাণীদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি হয়ে উঠল, তাহলে সেক্ষেত্রে যৌন নির্বাচনের একটা দ্বিমুখী প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়ে উঠবে (তবে সেই প্রক্রিয়া দুটো যুগপৎ ঘটবে না), যার ফল হিসেবে দু'টি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য গড়ে উঠতে বাধ্য।

এর পরে আমরা দেখতে পাব যে এমন অনেক প্রাণী আছে যাদের স্ত্রী বা পুরুষ কারুরই গাত্রবর্ণ খুব উজ্জ্বল হয় না কিংবা শরীরে বিশেষ কোনও চাকচিক্য থাকে না, তা সত্ত্বেও তাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অথবা কোনও একটি লিঙ্গের প্রাণীরা যৌন নির্বাচন মারফত সাদামাটা গাত্রবর্ণের, যেমন সাদা বা কালো রঙের, অধিকারী হয়। উজ্জ্বল রঙ অথবা শরীরের অন্যান্য চাকচিক্যের অভাবটা কেন দেখা দেয়? হয়তো সঠিক ধরনের পরিবর্তন কখনও ঘটে না বলেই এই অভাবটা দেখা দেয়, কিংবা

ওইসব প্রাণীরা বরাবর নিছক সাদা বা কালো রঙের সঙ্গীদের পছন্দ করে এসেছে বলেই এই অভাবটা দেখা দিয়েছে। হাল্‌কা গাত্রবর্ণ প্রায়শই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত গড়ে ওঠে। যৌন নির্বাচন মারফত অনেক প্রাণী খুব নজরকাড়া গাত্রবর্ণের অধিকারী হয়, কিন্তু সেই রঙই অনেক সময় তাদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ওই উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলে তারা। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রাণীরা বহু বহু বছর ধরে স্ত্রী-প্রাণীদের দখল করার জন্য নিজেদের মধ্যে লড়াই করে গেছে অথচ তার কোনও ফল ফলেনি। এর ফল ফলতে পারে একমাত্র তখনই, যখন বেশি সফল পুরুষরা তাদের উৎকৃষ্টতার উত্তরাধিকারী হিসেবে কম সফল পুরুষদের চেয়ে বেশি সংখ্যক সন্তানসন্ততি রেখে যেতে পারে। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে এই বেশি সংখ্যক সন্তানসন্ততি রেখে যাওয়ার ব্যাপারটা বেশ কিছু জটিল ও অনিশ্চিত সম্ভাবনার ওপরে নির্ভর করে।

যৌন নির্বাচনের কার্যপদ্ধতি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো অত কঠোর নয়। সব যুগেই প্রাকৃতিক নির্বাচন কম সফল অথবা বেশি সফল প্রাণীদের একেবারে জীবন-মৃত্যুর ওপরে নিজের প্রভাব প্রসারিত করে দিয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ-প্রাণীদের লড়াইয়ের ফলে মৃত্যুর ঘটনা তো আক্‌ছারই ঘটে। তবে কম সফল পুরুষরা সাধারণত সঙ্গিনী হিসেবে কোনও স্ত্রী-প্রাণীকে জোগাড় করতে পারে না কিংবা হয়তো মরশুমের শেষের দিকে কোনও অনাকর্ষণীয় ও কম প্রাণশক্তিসম্পন্ন সঙ্গিনীকে পায়, আর বহুগামী হলে বেশি সফল পুরুষদের তুলনায় অনেক কম সংখ্যক স্ত্রী-প্রাণীর সঙ্গে মিলন করতে সক্ষম হয়। ফলস্বরূপ এদের সন্তানও হয় সংখ্যায় অল্প ও কম প্রাণশক্তিসম্পন্ন, এমনকী কখনও কখনও এদের কোনও সন্তানই হয় না। সাধারণ বা প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত অর্জিত শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর ব্যাপারে বলা যায় যে জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলো যতদিন একইরকম থাকে, ততদিন পর্যন্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুবিধাজনক পরিবর্তন ঘটে চলার একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকে। কিন্তু যে-সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো একজন পুরুষকে অন্য পুরুষদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে সাহায্য করে (তা সে লড়াই করার ব্যাপারেই হোক অথবা স্ত্রী-প্রাণীদের আকৃষ্ট করার ব্যাপারেই হোক), সেগুলোর সুবিধাজনক পরিবর্তন ঘটে চলার কোনও সীমা থাকে না। যতদিন না সবথেকে সুবিধাজনক অবস্থাটা দেখা দেয়, ততদিন পর্যন্ত যৌন নির্বাচন তার কাজ করেই চলে। অপ্রধান লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যগুলোর ক্ষেত্রে প্রায়শই যে বিপুল পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়, তার কিছুটা কারণ হয়তো এই ব্যাপারটার মধ্যেই নিহিত থাকে। তথাপি এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি খুব ক্ষতিকর ধরনের হয়, এগুলোর দরুন যদি তাদের প্রাণশক্তির অত্যধিক ক্ষয়

ঘটে কিংবা তাদের কোনও মারাত্মক বিপদের মুখে পড়তে হয়, তাহলে বিজয়ী পুরুষরা যাতে এই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করতে না পারে তার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে প্রাকৃতিক নির্বাচন। তবে কয়েকটি অঙ্গের (যেমন কয়েক ধরনের পুরুষ-হরিণের শৃঙ্গ) বিকাশ একেবারে চরম উৎকর্ষের স্তরে পৌঁছে গেছে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে কয়েকটি অঙ্গের বিকাশ এমন একটা স্তরে পৌঁছে গেছে যা জীবনযাপনের সাধারণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষ-প্রাণীদের পক্ষে কিছুটা ক্ষতিকরই হয়ে উঠেছে। এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায়, অন্য পুরুষদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বা প্রণয়ের ব্যাপারে বিজয়ী এবং তার ফলস্বরূপ বেশি সংখ্যক সন্তানসন্ততি রেখে যেতে সক্ষম পুরুষরা এই প্রক্রিয়া থেকে যে-সব সুবিধাগুলো অর্জন করে, সেগুলো জীবনযাপনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যথাযথ অভিযোজনের দরুন প্রাপ্ত সুবিধাগুলোর থেকে পরবর্তীকালে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। একেবারে অভাবনীয় হলেও এটা সত্য যে অন্য পুরুষদের লড়াইতে পরাস্ত করার শক্তির থেকে স্ত্রী-প্রাণীদের মোহিত করে নিজের কাছে টেনে আনার শক্তিটা অনেক সময়েই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

বংশগতির নিয়ম

বিভিন্ন শ্রেণীর নানান প্রাণীদের ওপরে যৌন নির্বাচন কীভাবে প্রভাব ফেলেছে এবং সময়ের গতিপথে কীভাবে তা এক কৌতূহলোদ্দীপক ফলাফল সৃষ্টি করেছে, সেটা বুঝতে হলে বংশগতির নিয়মগুলো আমাদের অবশ্যই জেনে নিতে হবে। 'বংশগতি' অভিধাটির মধ্যে দু'টি পৃথক বিষয় নিহিত থাকে—বংশধরদের মধ্যে জন্মসূত্রে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হস্তান্তর এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশ। তবে এই দুটো ব্যাপার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত বলে এদের পার্থক্যটা অনেক সময়ই তেমন গুরুত্ব পায় না। যে-সব বৈশিষ্ট্যগুলো জীবনের প্রথম দিকেই সঞ্চারিত হয় কিন্তু পরিণত বয়স বা বৃদ্ধ বয়সের আগে বিকশিত হয় না, সেগুলোর ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটা স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারি আমরা। অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যগুলোর ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটা আরও স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়, কারণ এই বৈশিষ্ট্যগুলো দু'টি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যেই সঞ্চারিত হলেও বিকশিত হয় যে-কোনও একটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যেই। এই বৈশিষ্ট্যগুলো যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় দুটি পৃথক প্রজাতির মিশ্রণ বা সঙ্কর প্রজননের ক্ষেত্রে। সুস্পষ্ট যৌন বৈশিষ্ট্য সমন্বিত দুটি পৃথক প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষরা যখন মিলিত হয়, তখন তারা উভয়েই তাদের নিজ নিজ প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষদের বৈশিষ্ট্যগুলো সঞ্চারিত করে দেয় তাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয় লিঙ্গেরই সঙ্কর সন্তানদের মধ্যে। স্ত্রী-প্রাণীরা বৃদ্ধ হলে

বা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাদের মধ্যে কখনও-কখনও পুরুষ-প্রাণীসুলভ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে দেখা যায় এবং এই ঘটনার মধ্যেও ওই একই বিষয় পরিস্ফুট হয়। যেমন, সাধারণ মুরগিরা বৃদ্ধ হলে বা অসুস্থ হয়ে পড়লে মোরগদের মতো ল্যাজের ঢেউখেলানো পালক, ঘাড়ের পালক, মাথার ঝুঁটি, পায়ের পিছন দিকের নখরতুল্য অঙ্গ, কণ্ঠস্বর, এমনকী যুদ্ধপ্রিয় স্বভাবটা পর্যন্ত দেখা দেয় তাদের মধ্যে। আবার খোজা-করা পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যেও অনেক সময় স্ত্রীসুলভ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে দেখা যায়। বৃদ্ধ বয়স বা অসুস্থ অবস্থা ছাড়াও অনেক সময় পুরুষ-প্রাণীদের কিছু বৈশিষ্ট্য স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। যেমন কয়েক ধরনের অল্পবয়সী ও স্বাস্থ্যবতী মুরগিদের পায়ের পিছনদিকে মোরগদের মতো নখরতুল্য অঙ্গ দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই অঙ্গটা কিন্তু ওইসব মুরগিদের মধ্যে বিকশিতই হয়, কারণ এই নখরতুল্য অঙ্গের গঠনকাঠামোর প্রতিটা খুঁটিনাটি ব্যাপার স্ত্রী-প্রাণীদের কাছ থেকেই তাদের পুরুষ-সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে আমরা এমন অনেক দৃষ্টান্ত পেশ করব যেখানে স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে পুরুষ-প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো কমবেশি নিখুঁতভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো নিশ্চয়ই পুরুষদের মধ্যেই প্রথমে দেখা দিয়েছিল, তারপর সেগুলো সঞ্চারিত হয়েছে স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যেও। এর উল্টো ঘটনাটা, অর্থাৎ স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে প্রথমে বিকশিত হয়ে ওঠা বৈশিষ্ট্যগুলো পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার ঘটনা সংখ্যায় অনেক কম। এ ব্যাপারে একটা চমৎকার উদাহরণ পেশ করা যায়। মৌমাছদের মধ্যে একমাত্র স্ত্রী-মৌমাছিদের শরীরেই পরাগ সংগ্রহের অঙ্গ থাকে, যার সাহায্যে শূককীটদের জন্য পরাগ সংগ্রহ করে তারা। পুরুষদের শরীরে এই অঙ্গটা থাকার কোনও উপযোগিতা নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশির ভাগ প্রজাতির পুরুষ-মৌমাছিদের শরীরে এই অঙ্গটা আংশিক বিকশিত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায়, আর বম্বাস বা ভ্রমরদের পুরুষদের শরীরে এই অঙ্গটা নিখুঁতভাবে বিকশিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। হাইমেনোপ্টেরা বর্গের আর কোনও পতঙ্গের মধ্যে এই পরাগ সংগ্রহের অঙ্গ দেখা যায় না, এমনকী মৌমাছিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত বোলতাদের মধ্যেও নয়। কিন্তু এ থেকে এমন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছনো যায় না যে একেবারে প্রথমদিকে পুরুষ-পতঙ্গরাও স্ত্রী-পতঙ্গদের মতোই পরাগ সংগ্রহ করে বেড়াত। তবে স্তন্যপায়ী পুরুষ-প্রাণীরা যে একেবারে প্রথমদিকে স্ত্রী-প্রাণীদের মতোই তাদের সন্তানদের স্তন্যপান করাত, এমনটা ভাবার কিছু কারণ আমাদের আছে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের সঞ্চারিত হওয়া ও বিকশিত হওয়ার মধ্যেকার এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের ব্যাপারটা সবথেকে ভালভাবে বোঝা যায় সর্বসৃষ্টিবাদ বা প্যানজেনেসিস প্রকল্পের সাহায্যে। এই প্রকল্প অনুযায়ী, শরীরের প্রতিটি একক বা কোষ গেমিউল (gemmule) বা অবিকশিত

অণু পরিত্যাগ করে, সেগুলো উভয় লিঙ্গেরই সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং স্ব-বিভাজনের সাহায্যে সেগুলোর সংখ্যা বর্ধিত হয়। জীবনের প্রথম বছরগুলোতে অথবা পরবর্তী কয়েকটি প্রজন্মের মধ্যে এগুলো অবিকশিত অবস্থাতেই রয়ে যেতে পারে। যে-সব একক বা কোষ থেকে তাদের উদ্ভব, সেইসব একক বা কোষের মতোই এদেরও এককে বা কোষে বিকশিত হওয়াটা নির্ভর করে বৃদ্ধির স্বাভাবিক নিয়মের আগেই বিকশিত অন্যান্য একক বা কোষের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্যের ওপরে এবং সেই একক বা কোষগুলোর সঙ্গে তাদের মিলনের ওপরে।

জীবনের বিভিন্ন অনুরূপ পর্যায়ে বংশগতি : এই প্রবণতাটির অস্তিত্ব যথেষ্ট ভালভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। ধরা যাক কোনও অল্পবয়সী প্রাণীর মধ্যে একটা নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দিল। বৈশিষ্ট্যটা তার সারা জীবন ধরেই টিকে থাকুক কিংবা ক্ষণস্থায়ীই হোক, ওই বৈশিষ্ট্যটা তার সন্তানদের মধ্যেও একই বয়সে দেখা দেয় এবং একই সময়কাল জুড়ে টিকে থাকে। অন্যদিকে, পরিণত বয়সে কিংবা এমনকী বৃদ্ধ বয়সেও কোনও প্রাণীর মধ্যে যদি কোনও নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, তাহলে তার সেই বৈশিষ্ট্যটাও তার সন্তানের মধ্যে ওই একই বয়সে ফুটে উঠতে শুরু করে। এই নিয়মের যদি কোনও ব্যতিক্রম ঘটে, তাহলে সঞ্চারিত বৈশিষ্ট্যটি তার সন্তানের মধ্যে সাধারণত ওই বয়সের আগেই ফুটে ওঠে, পরে নয়। এই বিষয়টা নিয়ে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমি, তাই এখানে শুধু পাঠককে একটু স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য দু'-একটা উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব। কয়েক ধরনের মুরগিদের মধ্যে একটা ব্যাপার লক্ষ করা যায়। পালকাবৃত মুরগিছানাদের প্রথম পালকগুলো পরস্পরের থেকে আলাদা ধরনের হয়, পূর্ণবয়স্ক মুরগিরাও পরস্পরের থেকে এবং তাদের সার্বজনীন পূর্বপুরুষ 'গ্যালাস ব্যাঙ্কিভা'-দের থেকে অনেকটাই পৃথক ধরনের হয়ে থাকে। তাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের সন্তানদের মধ্যেও ওই নির্দিষ্ট বয়সে ফুটে উঠতে দেখা যায়। যেমন গায়ে চুম্‌কির মতো দাগ-বিশিষ্ট হ্যামবার্গ মুরগিছানাদের শরীর যখন পালকে ঢেকে যায়, তখন তাদের মাথায় ও নিতম্বে কতকগুলো কালো-কালো দাগ ফুটে ওঠে, তবে মুরগিদের অন্যান্য বর্গের মতো কোনও আড়াআড়ি ডোরা তাদের শরীরে দেখা যায় না। হ্যামবার্গ মুরগিছানাদের শরীরে যখন প্রথম পালক দেখা দেয়, তখন 'তাদের গায়ে চমৎকার তুলির কাজ ফুটে ওঠে', অর্থাৎ প্রতিটি পালকে বেশ কিছু আড়াআড়ি কালো ডোরা দেখা দেয়। কিন্তু দ্বিতীয়বার পালক উদ্‌গমের সময় প্রতিটি পালকেই চুম্‌কির মতো কিংবা কালো-কালো গোল দাগ ফুটে ওঠে।[১০] অর্থাৎ এই বর্গের মুরগিদের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য দেখা দিয়েছে

১০। সুবিখ্যাত মুরগি-পালক মিঃ টিবে এই তথ্যগুলি জানিয়েছেন। দ্রষ্টব্য, টিগেট মেইয়ার-এর 'পোলট্রি বুক', পৃঃ ১৫৮।

এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে জীবনের তিনটি পৃথক পৃথক পর্যায়ে। পায়রাদের মধ্যে আরও চমকপ্রদ একটা ব্যাপার লক্ষ করা যায়। এদের মূল প্রজাতিটির মধ্যে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পালকের কোনও পরিবর্তন ঘটে না, শুধু পরিণত বয়সে এদের বুকের কাছটা আরও বেশি বর্ণময় হয়ে ওঠে। অথচ এই মূল প্রজাতি থেকে উদ্ভূত অন্যান্য কিছু বর্গের পায়রারা দু'বার, তিনবার কিংবা চারবার পালক না-খসানো পর্যন্ত নিজেদের বৈশিষ্ট্যসূচক রঙটি অর্জন করতে পারে না। পালকের এই পরিবর্তনগুলো তাদের বংশধরদের মধ্যে নিয়মিতভাবে সঞ্চারিতও হয়ে থাকে।

বছরের বিভিন্ন অনুরূপ মরশুমে বংশগতি : প্রকৃতির বুকে মুক্ত অবস্থায় থাকা পশুপাখিদের মধ্যে বছরের বিভিন্ন মরশুমে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা চোখে পড়ে। পুরুষ-হরিণের শিং আর উত্তর মেরুর পশুদের লোমের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা লক্ষ করা যায়। শীতকালে পুরুষ-হরিণের শিং আর উত্তর মেরুর পশুদের গায়ের লোম পুরু ও সাদা হয়ে যায়। শুধুমাত্র প্রজননের মরশুমে অনেক পাখিদের গায়ের রঙ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং শরীরের অন্যান্য চাকচিক্যও বেড়ে ওঠে। প্যালাস বলেছেন, শীতকালে সাইবেরিয়ার গৃহপালিত গবাদি পশু আর ঘোড়াদের গায়ের রঙ হাল্‌কা হয়ে যায়। ইংল্যান্ডের নানা জাতের টাট্টুঘোড়াদের গায়ের রঙ যে বাদামি বা লালচে-বাদামি থেকে একেবারে ধবধবে সাদা হয়ে যায়, এ ঘটনা আমি নিজেও দেখেছি এবং এ-রকম অনেক ঘটনার কথা অন্যদের কাছে শুনেওছি। বছরের বিভিন্ন মরশুমে গাত্রবর্ণ পরিবর্তনের এই প্রবণতাটা উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হয় কিনা তা আমার জানা নেই ঠিকই, তবে সম্ভবত সঞ্চারিত হয়, কারণ ঘোড়ারা তাদের গাত্রবর্ণের যাবতীয় বৈচিত্র্যই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে থাকে। উত্তরাধিকারসূত্রে গাত্রবর্ণ পরিবর্তনের এই ব্যাপারটা শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ কিছু মরশুমেই ঘটে থাকে বলে বিশেষ বিশেষ বয়সে বা লিঙ্গগত কারণে উত্তরাধিকারসূত্রে কোনও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার থেকে এই ব্যাপারটার গুরুত্ব অনেকটাই কম।

লিঙ্গগত বংশগতি : প্রাণীদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে সমানভাবে সঞ্চারিত হওয়াটা বংশগতির সবথেকে সার্বজনীন রূপ। যে-সব প্রাণীদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে খুব উল্লেখযোগ্য কোনও পার্থক্য থাকে না, তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তবে কোনও কোনও বৈশিষ্ট্য যে-লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে প্রথম দেখা দেয়, শুধুমাত্র সেই লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সাধারণত সঞ্চারিত হয় থাকে। আমার 'ভ্যারিয়েশনস আন্ডার ডোমেস্টিকেশন' রচনায় এ ব্যাপারে প্রচুর নজির উপস্থাপিত করেছি আমি, তবু

এখানেও দু'-একটা দৃষ্টান্ত পেশ করার চেষ্টা করছি। কয়েক ধরনের ভেড়া আর ছাগলের মধ্যে পুরুষ-প্রাণীদের মাথার শিঙের আকারের সঙ্গে স্ত্রী-প্রাণীদের শিঙের আকারের বিপুল পার্থক্য থাকে। গৃহপালিত অবস্থায় অর্জিত এই পার্থক্যগুলো তাদের পুরুষ ও স্ত্রী-বংশধরদের মধ্যে নিয়মিত সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। বেড়ালদের মধ্যে সাধারণত শুধু কিছু মাদি-বেড়ালের গায়ের রঙই কচ্ছপের খোলার মতন হয় আর তাদের পুরুষ-বেড়ালদের গায়ের রঙ হয় লাল্‌চে ধরনের। বেশির ভাগ মুরগিদের মধ্যে এক-একটি লিঙ্গের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো শুধুমাত্র সেই লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়ে থাকে। মুরগিদের মধ্যে এই ব্যাপারটা প্রায় সার্বজনীন। অল্প কিছু ক্ষেত্রে এদের বৈশিষ্ট্যগুলো উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় বটে, তবে তা নিতান্তই ব্যতিক্রম মাত্র। মুরগিদের কয়েকটি উপ-বর্গের পুরুষ-প্রাণীদের পরস্পরের মধ্যে প্রায় কোনও পার্থক্যই থাকে না, কিন্তু তাদের স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে গায়ের রঙে যথেষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। পায়রাদের মূল প্রজাতিটির স্ত্রী-পুরুষের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে কোনও পার্থক্য থাকে না, আবার কয়েক ধরনের গৃহপালিত পুরুষ-পায়রাদের গায়ের রঙ স্ত্রী-পায়রাদের থেকে অনেকটাই আলাদা হয়। ইংলিশ ক্যারিয়ার পায়রাদের মাথার মাংসল উপাঙ্গ (wattle) আর নোটন পায়রাদের (Pouter) দেহের মধ্যেকার থলির উপাঙ্গ—এই দু'টো জিনিসই স্ত্রী-পায়রাদের থেকে পুরুষ-পায়রাদের শরীরে অনেক বেশি সুবিকশিত অবস্থায় থাকে। মানুষ কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদি নির্বাচন মারফতই এরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করেছে সত্যি, তবু স্ত্রী আর পুরুষ-পায়রাদের মধ্যেকার ছোটখাটো পার্থক্যগুলো পুরোপুরিভাবেই উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হয়েছে। কারণ এই পার্থক্যগুলো তাদের প্রতিপালকের ইচ্ছানুসারে উদ্ভূত হয়নি, বরং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এগুলো উদ্ভূত হয়েছে।

আমাদের গৃহপালিত পশুদের অধিকাংশ বর্গই গড়ে উঠেছে বহু ছোটখাটো পার্থক্যের পুঞ্জীভবনের ফলে। পরবর্তীকালে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হয়েছে শুধুমাত্র বিশেষ একটি লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে, আবার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হয়েছে উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই। এর ফলে একই প্রজাতির প্রাণীদের বিভিন্ন বর্গের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিপুল পার্থক্য থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পর্যন্ত যাবতীয় ক্রমবিন্যাসের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। মুরগি আর পায়রাদের কথা তো আমরা আগেই বলেছি। প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকা প্রাণীদের মধ্যেও এ-রকম ঘটনা অনেক দেখা যায়। মুক্ত অবস্থায় থাকা প্রাণীদের ক্ষেত্রে কী হয় তা বলতে পারব না, তবে গৃহপালিত পশুদের ক্ষেত্রে অনেক সময় কোনও-একটি লিঙ্গের প্রাণীরা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো হারিয়ে ফেলে এবং তার ফলে অন্য

লিঙ্গের প্রাণীদের সঙ্গে তাদের আর প্রায় কোনও পার্থক্য থাকে না। যেমন, কয়েক ধরনের মোরগরা তাদের পুরুষোচিত ল্যাজের পালক ও ঘাড়ের পালক হারিয়ে ফেলেছে। আবার গৃহপালিত অবস্থায় দু'টি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যেকার পার্থকটা বেড়ে যেতেও পারে, যেমনটা ঘটেছে মেরিনো-ভেড়াদের ক্ষেত্রে। এদের স্ত্রী-প্রাণীরা তাদের মাথার শিং হারিয়ে ফেলার দরুন পুরুষদের সঙ্গে তাদের পার্থক্যটা আরও বেড়ে গেছে। আবার কখনও-কখনও কোনও-একটি লিঙ্গের প্রাণীদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো আকস্মিকভাবে ফুটে উঠতে পারে অন্য লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে। যেমন, কয়েক ধরনের মুরগিরা অল্পবয়সে মোরগদের মতো পায়ের পিছনদিকের নখর-তুল্য অঙ্গটা লাভ করে থাকে। পোলিশ মুরগিদের কয়েকটি উপ-বর্গের স্ত্রী-প্রাণীরাই প্রথমে মাথার ঝুঁটি অর্জন করেছিল (এটা মনে করার সঙ্গত কারণও আছে), পরে তাদের কাছ থেকে পুরুষরাও সেটা লাভ করে। এইসব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায় একমাত্র সর্বসৃষ্টিবাদের (pangenesis) প্রকল্পের সাহায্যেই, কারণ উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যেই বিদ্যমান থাকলেও এগুলো আসলে নির্ভর করে কয়েকটি অঙ্গের ভ্রূণরূপের ওপরে, যেগুলো গৃহপালিত অবস্থায় থাকার প্রভাবে যে-কোনও একটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠে আসতে পারে এবং সেটা নিয়ে পরবর্তী কোনও পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করাটাই সুবিধাজনক। প্রশ্নটা হল—কোনও-একটা বৈশিষ্ট্য প্রথমে উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যেই দেখা দেওয়ার পর সেটার বিকাশ নির্বাচন মারফত শুধুমাত্র কোনও-একটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে পারে কিনা। ধরা যাক একজন পায়রা-পালক স্থির করল যে তার কয়েকটা পায়রার গায়ের রঙ নীল্‌চে করে তোলা দরকার (পায়রাদের বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণত উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে সমানভাবেই সঞ্চারিত হয়ে থাকে)। এ-রকম অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি নির্বাচনের সাহায্যে সে কি পায়রাদের এমন একটা বর্গ সৃষ্টি করতে পারবে যাদের মধ্যে শুধু পুরুষদের গাত্রবর্ণই নীল্‌চে হবে আর স্ত্রী-পায়রাদের গায়ের রঙ অপরিবর্তিতই রয়ে যাবে? এর উত্তরে এখানে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে এ-রকম একটা ঘটনা ঘটানো একেবারে অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত দুরূহ, কারণ নীল্‌চে গাত্রবর্ণের পুরুষদের দিয়ে বংশবিস্তার করানোর চেষ্টা করার অর্থ হল ওই বর্গের স্ত্রী ও পুরুষ সমস্ত পায়রাদেরই গাত্রবর্ণ নীল্‌চে হয়ে যাওয়া। তবু ধরা যাক সেই প্রত্যাশিত ঘটনাটা ঘটল, প্রথম থেকেই নীল্‌চে রঙটা সীমাবদ্ধ হইল শুধু পুরুষ-পায়রাদের মধ্যেই। এ-রকমটা যদি সত্যিই ঘটে, তাহলে আলাদা গাত্রবর্ণের স্ত্রী-পুরুষবিশিষ্ট একটা বর্গ গড়ে তোলাটা আর অসম্ভব হবে না। বেলজিয়ান বর্গের

এক ধরনের পায়রাদের মধ্যে ঠিক এই ঘটনাটাই দেখা যায়, যাদের মধ্যে শুধু পুরুষ-পায়রাদের শরীরেই কালো রঙের ডোরা থাকে। একইভাবে, কোনও স্ত্রী-পায়রার মধ্যে যদি কোনও-একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে যে-বৈশিষ্ট্যটা প্রথম থেকে শুধুমাত্র স্ত্রী-পায়রাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহলে তাকে দিয়ে পায়রাদের এমন একটা বর্গ সৃষ্টি করা যেতে পারে যেখানে ওই বৈশিষ্ট্যটা শুধুমাত্র স্ত্রী-পায়রাদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। কিন্তু ওই বৈশিষ্ট্যটা যদি প্রথম থেকে শুধুমাত্র স্ত্রী-পায়রাদের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই থেকে থাকে, তাহলে এ-রকম একটা বর্গ সৃষ্টি করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে উঠবে তো বটেই, এমনকী ব্যাপারটাকে একেবারে অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না।[১১]

কোনও-একটি বৈশিষ্ট্যের বিকশিত হয়ে ওঠার সময়কাল এবং কোনও-একটি লিঙ্গের অথবা উভয় লিঙ্গেরই বংশধরদের মধ্যে তা সঞ্চারিত হওয়ার মধ্যেকার সম্পর্ক প্রসঙ্গে : প্রাণীদের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য কেন তাদের উভয় লিঙ্গের বংশধররাই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করবে, আবার কেনই বা অন্য কয়েকটা বৈশিষ্ট্য লাভ করবে শুধু বিশেষ একটি লিঙ্গের বংশধররাই (অর্থাৎ যে-লিঙ্গের পূর্বপুরুষদের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যটি প্রথম দেখা দিয়েছিল, শুধু সেই লিঙ্গের বংশধররাই)—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার কারণটা আমাদের অজানা। পায়রাদের কয়েকটা উপ-বর্গের মধ্যে গায়ের কালো ডোরাগুলো স্ত্রী-পায়রাদের মারফত সঞ্চারিত হলেও কেন শুধু পুরুষদের মধ্যেই তা বিকশিত হয় অথচ অন্যান্য যাবতীয় বৈশিষ্ট্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সমানভাবে সঞ্চারিত হয়—তার কারণটা অনুমান করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বেড়ালদের ক্ষেত্রে দু'-একটা ব্যতিক্রম বাদে কেন শুধু মাদি-বেড়ালদের শরীরে কচ্ছপের খোলার মতো রঙ ফুটে ওঠে, আমরা জানি না। মানুষের বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। কোনও কোনও পরিবারে হাতে বা পায়ে বেশি বা কম আঙুল থাকা, বর্ণান্ধতা ইত্যাদি কিছু বৈশিষ্ট্য কেন সেই পরিবারের শুধুমাত্র পুরুষ-সদস্যদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়, আবার অন্য কোনও পরিবারে ওই বৈশিষ্ট্যগুলোই কেন শুধুমাত্র স্ত্রী-সদস্যদের

১১। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর মিঃ টেগেটমেইয়ার-এর মতো একজন অভিজ্ঞ পায়রা-পালকের খুব সন্তোষজনক একটা মন্তব্য আমার নজরে এসেছে। পায়রাদের জীবনের কিছু বিচিত্র ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। গাত্রবর্ণ কীভাবে শুধুমাত্র একটি লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয় এবং তারপর কীভাবে ওই বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত একটি উপ-বর্গ গড়ে ওঠে, তার বিবরণ দেওয়ার পর তিনি মন্তব্য করেছেন : 'কৃত্রিম নির্বাচন মারফত পাখিদের স্ত্রী-পুরুষের গাত্রবর্ণের পরিবর্তন ঘটানোর যে-সম্ভাবনাটার কথা মিঃ ডারউইন উল্লেখ করেছেন, তা সত্যিই এক চমকপ্রদ বক্তব্য। ওই কথাগুলি যখন তিনি লিখেছিলেন, তখন আমার দ্বারা উপস্থাপিত এইসব তথ্যগুলোর কথা তাঁর জানাও ছিল না। অথচ তা সত্ত্বেও এই ব্যাপারটা ঘটানোর সঠিক পদ্ধতিটা কী হতে পারে, তা প্রায় নির্ভুলভাবেই তুলে ধরতে পেরেছিলেন তিনি।'

মধ্যে সঞ্চারিত হয়—(যদিও উভয় ক্ষেত্রেই এই বৈশিষ্ট্যগুলো সঞ্চারিত হয় বিপরীত লিঙ্গ ও সমলিঙ্গ, উভয় লিঙ্গেরই পূর্বপুরুষদের মারফত)—তার কারণও আমাদের জানা নেই। তবে এ-রকম অনেক কিছু আমাদের জানা না থাকলেও দুটো নিয়ম এ-সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেই মনে হয়। প্রথমত, যে-সব বৈশিষ্ট্য প্রথমে কোনও-একটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে বেশি বয়সে দেখা দেয়, সেইসব বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র সেই লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়। দ্বিতীয়ত, যে-সব বৈশিষ্ট্য প্রথমে কোনও-একটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে অল্প বয়সে দেখা দেয়, সেইসব বৈশিষ্ট্য তাদের উভয় লিঙ্গেরই বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। তবে এ দু'টোই যে এইসব ঘটনার একমাত্র নিয়ম বা কারণ, এমন কথা আমি মোটেই বলতে চাইছি না। যেহেতু এ বিষয়টা নিয়ে আমি অন্য কোথাও আলোচনা করিনি এবং যেহেতু যৌন নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু এটা নিয়ে এখানে একটু বিস্তৃত ও জটিল আলোচনায় যেতে বাধ্য হচ্ছি আমি।

একটা সম্ভাবনার কথা বলি। প্রাণীদের মধ্যে অল্প বয়সে কোনও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠলে সেই বৈশিষ্ট্যটা তাদের উভয় লিঙ্গের বংশধররাই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করতে পারে, কারণ প্রজনন-ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষের গঠনকাঠামোয় তেমন কোনও পার্থক্য থাকে না। অন্যদিকে, প্রজনন-ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পর যখন স্ত্রী ও পুরুষের গঠনকাঠামোর মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়, তখন একটি লিঙ্গের সদস্যদের যে-অঙ্গগুলি অন্য লিঙ্গের সদস্যদের থেকে আলাদা সেই অঙ্গগুলি থেকে নির্গত কোষগুলোর (gemmule—সর্বসৃষ্টিবাদের পরিভাষায় বললে) মধ্যে একই লিঙ্গের কলাগুলির (tissue) সঙ্গে মিলিত হওয়ার সক্ষমতা থাকাটা একান্তই স্বাভাবিক এবং তার ফলে বিপরীত লিঙ্গের কলাসমূহ ছাড়াই সেগুলি বিকশিত হয়ে উঠতে পারে।

আমি অনুমান করেছিলাম যে এ-রকম একটা সম্পর্কের অস্তিত্ব থাকলেও থাকতে পারে। কেন অনুমান করেছিলাম? আসলে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের পার্থক্যটা যখনই ঘটুক না কেন, সেই পার্থক্যটা যে-প্রকৃতির হয় ঠিক সেই প্রকৃতির পার্থক্যই তাদের থাকে অল্পবয়সী পুরুষ ও নারী, উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের সঙ্গেই—এই সূত্রটা থেকেই ওই অনুমানে পৌঁছেছিলাম আমি। এই ব্যাপারটা প্রায় সার্বজনীন। প্রায় সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, উভচর জীব এবং মাছেদের ক্ষেত্রে এটা সত্য। বিভিন্ন ধরনের কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণী (চিংড়ি, কাঁকড়া জাতীয়), মাকড়সা এবং কয়েক ধরনের কীটপতঙ্গ সম্বন্ধেও (যেমন পঙ্গপাল, গঙ্গাফড়িং ইত্যাদি) এই একই কথা প্রযোজ্য। এদের সবার ক্ষেত্রেই যে-সব পার্থক্যগুলোর পুঞ্জীভবনের ফল হিসেবে পুরুষরা তাদের যথাযথ পুরুষোচিত বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন করেছে, সেইসব

পার্থক্যগুলো নিশ্চয়ই তাদের জীবনে কিছুটা বেশি বয়সেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, অন্যথায় অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যেও এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যেতে পারত। এইসব বৈশিষ্ট্যসূচক পার্থক্যগুলো শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যেই সঞ্চারিত ও বিকশিত হয় এবং এটা এই নিয়মের অস্তিত্বকে আরও সপ্রমাণ করে। আবার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে যখন উভয় লিঙ্গেরই অল্পবয়সী সদস্যদের (দু'-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া যারা সবসময়েই পরস্পরের সদৃশ হয়) ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায়, তখন ওই প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক নারীদেরও সাধারণত সাদৃশ্য থাকে। এই ধরনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে-সব পার্থক্যগুলোর সাহায্যে অল্পবয়সী ও প্রাপ্তবয়স্করা তাদের বর্তমান চারিত্রিকতা লাভ করেছে, আমাদের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলো খুব সম্ভবত অল্প বয়সেই অর্জন করেছিল তারা। তবে এ ব্যাপারে সন্দেহের কিছুটা অবকাশ রয়েই যায়, কারণ অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে ওই বৈশিষ্ট্যগুলো পিতামাতার মধ্যে যে-বয়সে প্রথম দেখা দিয়েছিল, তার থেকে কম বয়সেই সেগুলো সঞ্চারিত হয়ে যায় সন্তানদের মধ্যে। অর্থাৎ পিতামাতা যে-বৈশিষ্ট্যগুলো বেশি বয়সে অর্জন করেছিল, সন্তানরা সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী হয়ে ওঠে অল্প বয়সেই। তাছাড়া এমন অনেক পশুও আছে যাদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকলেও তাদের অল্পবয়সী সন্তানদের সঙ্গে তাদের উভয়েরই পার্থক্য থাকে। এইসব ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক পশুরা তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিশ্চয়ই বেশি বয়সে অর্জন করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের উভয় লিঙ্গেরই বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় (আমাদের নিয়মের সঙ্গে যা আপাতভাবে সাযুজ্যপূর্ণ নয়)। তবে উভয় লিঙ্গের সদস্যরা একইরকম অবস্থায় থাকলে একটু বেশি বয়সে তাদের উভয়ের মধ্যেই একইসঙ্গে একই ধরনের আরও নানান বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠাও একেবারে অসম্ভব নয়। এইসব ক্ষেত্রে ওই বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের উভয় লিঙ্গেরই সন্তানদের মধ্যে একটু বেশি বয়সে সঞ্চারিত হবে। সেক্ষেত্রে ওই পূর্ববর্তী নিয়মটা, অর্থাৎ যে-বৈশিষ্ট্যগুলো বেশি বয়সে দেখা দেয়, সেই বৈশিষ্ট্যগুলো শুধু সেই লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয় যে-লিঙ্গের পূর্বপুরুষদের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথম দেখা দিয়েছিল—এই নিয়মটার সঙ্গে আমাদের শেষোক্ত বক্তব্যটার কোনও প্রকৃত বিরোধ থাকে না। দ্বিতীয় নিয়মটা, অর্থাৎ যে-কোনও লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য দেখা দিলে সেটা তাদের উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়—এই নিয়মটাই বরং আরও বেশি সার্বজনীন সত্য। সমগ্র প্রাণীজগতে এই দু'টি নিয়ম ঠিক কতখানি প্রসারিত তার পরিমাপ করা নিতান্তই অসম্ভব। তাই এদের মধ্যে থেকে কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তকে পর্যালোচনা করে সেই পর্যালোচনার ফলাফলের ওপরেই নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছি আমি।

এই পর্যালোচনার পক্ষে হরিণরা একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। এদের মাত্র একটি প্রজাতি বাদে বাকি সমস্ত প্রজাতির মধ্যে শুধুমাত্র পুরুষদের মাথাতেই শৃঙ্গ দেখা যায়—যদিও নিশ্চিতভাবেই তা স্ত্রী-হরিণদের মারফতই সঞ্চারিত হয় এবং তাদের শরীরেও এই অঙ্গটির অস্বাভাবিক বিকাশ ঘটতে পারে। আবার বল্‌গা-হরিণদের স্ত্রী-হরিণদের মাথাতেও শৃঙ্গ থাকে। আমাদের প্রস্তাবিত নিয়ম অনুযায়ী বলতে গেলে বলতে হয়—এই প্রজাতির মধ্যে মাথার শৃঙ্গটা নিশ্চয়ই খুব অল্পবয়সেই দেখা দেয়, অর্থাৎ দুটি লিঙ্গের সদস্যরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠে তাদের গঠনকাঠামোর ব্যাপক পার্থক্য দেখা দেওয়ার অনেক আগে। অন্য সমস্ত প্রজাতির মধ্যে শৃঙ্গটা নিশ্চয়ই বেশি বয়সে দেখা দেয়, ফলে সেটা শুধু সেই লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে যে-লিঙ্গের পূর্বপুরুষদের মধ্যেই সেটা প্রথম দেখা দিয়েছিল। ভিন্ন ভিন্নঅঞ্চলে বসবাসকারী হরিণদের বিভিন্ন বর্গের সাতটি প্রজাতির শুধু পুরুষদের মাথাতেই শৃঙ্গ থাকে। এই শৃঙ্গগুলো দেখা দেয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। রো প্রজাতির পুরুষ-হরিণদের মাথায় শৃঙ্গটা দেখা দেয় জন্মের ন'মাস পর। আকারে বড় অন্য ছ'টি প্রজাতির পুরুষ-হরিণদের মাথায় শৃঙ্গগুলো দেখা দিতে শুরু করে জন্মের দশ, বারো অথবা আরও কিছু মাস পর থেকে।[১২] বল্‌গা-হরিণদের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম। আমাকে সাহায্য করার জন্য ল্যাপল্যান্ড অঞ্চলে এ ব্যাপারে বিশেষ অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন অধ্যাপক নিলসন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে জন্মের চার-পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই এদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মাথাতেই শৃঙ্গ দেখা দেয়। অর্থাৎ এখানে আমরা হরিণদের এমন একটা প্রজাতির সন্ধান পাচ্ছি যাদের মধ্যে নিতান্ত অল্প বয়সেই একটা বিশেষ অঙ্গ দেখা দেয় এবং শুধু এই একটি প্রজাতির ক্ষেত্রেই অঙ্গটা দেখা দেয় উভয় লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যে।

কয়েক ধরনের কৃষ্ণসার মৃগদের শুধু পুরুষদের মাথাতেই শৃঙ্গ থাকে, তবে কৃষ্ণসার মৃগদের বেশির ভাগ বর্গের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মাথাতেই শৃঙ্গ দেখা যায়। এই শৃঙ্গ তাদের মধ্যে ঠিক কোন্ বয়সে দেখা দেয়, সে ব্যাপারে মিঃ ব্লাইদ

১২। এ ব্যাপারে মিঃ কাপ্‌ল্‌স্-এর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। ব্রেডালবেনের মার্কুইসের মুখ্য-বনপাল মিঃ রবার্টসনের কাছ থেকে স্কটল্যান্ডের রোবাক আর রেড ডিয়ারদের ব্যাপারে তথ্যগুলো তিনিই সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন আমার হয়ে। পিঙ্গলবর্ণ ফ্যালো-ডিয়ারদের ব্যাপারে তথ্যাদির জন্য আমি মিঃ ইটন ও অন্যান্যদের কাছে ঋণী। উত্তর আমেরিকার 'সার্ভেস আল্‌সেস'-দের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, 'ল্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটার,' ১৮৬৮, পৃঃ ২২১ ও ২৫৪। ওই মহাদেশেরই 'সি. ভার্জিনিয়ানাস' এবং 'স্ট্রঙ্গিলোসেরস'-দের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, জে. ডি. ক্যাটন-এর প্রবন্ধ, ''ওটাওয়া অ্যাকাডেমি অফ ন্যাচারাল সায়েন্স', ১৮৬৮, পৃঃ ১৩। পেগুর 'সার্ভেস এল্‌ডি'-দের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, লেফটেন্যান্ট বিভেন, 'প্রসিডিয়র অফ জুলজিক্যাল সোসাইটি', ১৮৬৭, পৃঃ ৭৬২।

আমাকে একটা তথ্য জানিয়েছেন। এক সময় চিড়িয়াখানায় একটা অল্পবয়সী কুডু হরিণ (Ant. strepsiceros) ছিল যাদের শুধুমাত্র পুরুষদের মাথাতেই শৃঙ্গ থাকে, আর এদের প্রায় সমগোত্রীয় ইল্যান্ড (Ant. oreas) প্রজাতির একটা অল্পবয়সী হরিণ ছিল যাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মাথাতেই শৃঙ্গ থাকে। এদের দু'জনের বেলাতেই আমাদের প্রস্তাবিত নিয়মটির সত্যতা লক্ষ করা গিয়েছিল। দশ মাস বয়সী পুরুষ-কুডুটির শৃঙ্গগুলো ছিল খুবই ছোট মাপের (অর্থাৎ শৃঙ্গগুলো শেষ পর্যন্ত যতটা বড় হয়, তার তুলনায় ছোট), অথচ ওই পুরুষ ইল্যান্ড হরিণটির বয়স মাত্র তিন মাস হওয়া সত্ত্বেও তার শৃঙ্গগুলো কুডু হরিণটির শৃঙ্গের চেয়ে অনেক বড় ছিল। আর-একটা উল্লেখযোগ্য তথ্যের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। কাঁটার মতো শৃঙ্গবিশিষ্ট কৃষ্ণসার মৃগদের[১৩] স্ত্রী-হরিণদের মধ্যে অল্প কয়েকজনের (মোটামুটি প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজনের) মাথায় শৃঙ্গ দেখা যায়। এই শৃঙ্গগুলো একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় থাকলেও কখনও-কখনও প্রায় চার ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। তাই বলা যায় যে শুধুমাত্র পুরুষদের মাথাতেই শৃঙ্গ থাকার নিয়মটির ব্যাপারে এই প্রজাতির প্রাণীরা একটা মধ্যবর্তী স্তরে আছে এবং জন্মের পর পাঁচ-ছ' মাস না-কাটা পর্যন্ত এদের মাথায় শৃঙ্গ দেখা দেয় না। অন্যান্য কৃষ্ণসার মৃগদের মাথায় এবং হরিণ, গবাদি পশু ইত্যাদি প্রাণীদের মাথায় শৃঙ্গের উদ্‌গম সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানি, তার সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হয় যে কাঁটার মতো শৃঙ্গবিশিষ্ট কৃষ্ণসার মৃগদের মাথায় শৃঙ্গ দেখা দেয় জীবনের একটা মাঝামাঝি সময়ে—গবাদি পশু আর ভেড়াদের মতো খুব আগেও নয়, আবার বড় বড় হরিণ ও বড় কৃষ্ণসার মৃগদের মতো খুব পরেও নয়। ভেড়া, ছাগল ও গবাদি পশুদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মাথাতেই সুবিকশিত শৃঙ্গ থাকে (স্ত্রী আর পুরুষের শৃঙ্গের মাপ অবশ্য সমান হয় না) এবং সেটা তাদের জন্মের সময়েই বা তার কয়েকদিন পরেই অনুভব করা যায়, এমনকী অনেক সময় দেখাও যায়।[১৪] তবে কয়েক ধরনের ভেড়াদের বেলায় এই নিয়মটা প্রযোজ্য নয়। যেমন মেরিনো ভেড়াদের শুধু পুরুষদের মাথাতেই শৃঙ্গ দেখা যায়। সাধারণ জাতের যে-সব ভেড়াদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মাথাতেই শৃঙ্গ দেখা যায়, তাদের এই শৃঙ্গ যে-বয়সে ফুটে ওঠে,

---

১৩। অ্যান্টিলোকাপ্রা আমেরিকানা। এদের স্ত্রী-হরিণদের শৃঙ্গের ব্যাপারে তথ্যের জন্য ডঃ ক্যান্‌ফিল্ড-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

১৪। উত্তর ওয়েল্‌স অঞ্চলের হরিণদের মাথায় শৃঙ্গের অস্তিত্ব তাদের জন্মের সময়েই অনুভব করা যায়, এমনকী কখনও-কখনও জন্মের সময়েই তা এক ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বাও হয়ে থাকে। ইউআট বলেছেন ('ক্যাট্‌ল', ১৮৩৪, পৃঃ ২৭৭) যে গবাদি পশুদের মাথার উঁচু ললাটাস্থিটা তাদের জন্মের সময়েই ত্বকের মধ্যে ঢুকে যায় এবং কিছুদিনের মধ্যেই ওই জায়গায় শৃঙ্গ গঠনের উপাদানগুলি সঞ্চিত হয়।

মেরিনো ভেড়াদের মাথার শৃঙ্গও যে সেই বয়সেই ফুটে ওঠে, সেটা আমি অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি।[১৫] গৃহপালিত ভেড়াদের ক্ষেত্রে কিন্তু শৃঙ্গের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিটা কোনও অপরিবর্তনীয় নিয়ম নয়। যেমন মেরিনো ভেড়ীদের কয়েকজনের মাথায় ছোট ছোট শৃঙ্গ দেখা যায়, আবার এদের কিছু কিছু পুরুষ-ভেড়া শৃঙ্গহীন হয়। অধিকাংশ বর্গের মধ্যেই মাঝেমাঝে শৃঙ্গহীন ভেড়ী দেখা যায়।

অনেক পাখির মাথায় যে স্ফীত অংশটি দেখা যায়, তা নিয়ে সম্প্রতি একটি বিশেষ পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন ডঃ ডব্লিউ. মার্শাল। ওই পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন : যে-সব প্রজাতির ক্ষেত্রে এই স্ফীত অংশটি শুধুমাত্র পুরুষদের মাথাতেই দেখা যায়, তাদের ক্ষেত্রে এটির উদ্গম ঘটে একটু বেশি বয়সে ; কিন্তু যে-সব প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মাথাতেই এই অংশটি দেখা যায়, তাদের ক্ষেত্রে এটির উদ্গম ঘটে খুব কম বয়সে। বংশগতির যে-দু'টি নিয়মের কথা আমি বলেছি, মিঃ মার্শালের এই সিদ্ধান্ত সেগুলিকে সত্য হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে।

ফেজ্যান্ট বর্গের অধিকাংশ প্রজাতির পাখিদের ক্ষেত্রেই স্ত্রী-পাখিদের সঙ্গে পুরুষ-পাখিদের প্রচুর পার্থক্য থাকে এবং পুরুষরা তাদের শরীরের অঙ্গসজ্জাগুলো অর্জন করে একটু বেশি বয়সে। তবে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় কর্ণযুক্ত ফেজ্যান্টদের (Crossoptilon auritum) ক্ষেত্রে। এদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের শরীরেই ল্যাজের শেষপ্রান্তে পালকগুচ্ছ থাকে, কানে বড় বড় রোমগুচ্ছ থাকে এবং মাথার চারপাশে থাকে টকটকে লাল রোমগুচ্ছ। এই যাবতীয় বৈশিষ্ট্যগুলো এদের মধ্যে খুব অল্প বয়সেই দেখা দেয় এবং সেটা আমাদের কথিত নিয়মের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণও বটে। তবে পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী-পাখিদের থেকে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ-পাখিদের আলাদা করে চিনে নেওয়া যায় তাদের পায়ের পিছনদিকে নখরতুল্য অঙ্গটির উপস্থিতির সাহায্যে। মিঃ বার্টলেট আমাকে জানিয়েছেন যে এদের এই অঙ্গটা ছ'মাস বয়সের আগে দেখা দেয় না (যা আমাদের কথিত নিয়মটিকে আবারও সত্য হিসেবে প্রতিপন্ন করে), এবং

১৫। এ ব্যাপারে অধ্যাপক ভিক্টর ক্যারুস-এর কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। স্যাক্সনির মেরিনো ভেড়াদের সম্বন্ধে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমার হয়ে তিনিই তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। তবে আফ্রিকার গিনি উপকূলে এক ধরনের ভেড়া দেখা যায় যাদের মধ্যেও মেরিনোদের মতোই শুধুমাত্র পুরুষ-ভেড়াদের মাথাতেই শৃঙ্গ থাকে। মিঃ উইনউড রিড তাঁর দেখা একটা ঘটনার কথা আমাকে জানিয়েছেন। একটি পুরুষ-ভেড়া জন্মেছিল ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখে। মার্চের ৬ তারিখে তার মাথায় প্রথম শৃঙ্গ দেখা দেয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শৃঙ্গের উদ্গম সাধারণ নিয়মের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ সময়েই হয়েছে এবং ওয়েল্‌স ভেড়াদের (যাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মাথাতেই শৃঙ্গ থাকে) মাথায় জীবনের যে-সময়ে শৃঙ্গ দেখা দেয় তার থেকে বেশ খানিকটা পরে এই ভেড়াটির মাথায় শৃঙ্গ দেখা দিয়েছে।

এমনকী ওই ছ'মাস বয়সেও স্ত্রী-পাখি আর পুরুষ-পাখিদের মধ্যে প্রায় কোনও পার্থক্যই চোখে পড়ে না।[১৬] স্ত্রী আর পুরুষ-ময়ূরদের পালকগুচ্ছের প্রতিটি অংশই পরস্পরের থেকে একেবারে আলাদা হয়, মিল থাকে একমাত্র মাথার চমৎকার ঝুঁটিতে। এই ঝুঁটিটা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মাথাতেই দেখা যায় এবং এটার উদ্গম ঘটে তাদের জীবনের একেবারে প্রথম দিকেই—শরীরের অন্যান্য অঙ্গসজ্জাগুলোর উদ্গম ঘটার অনেক আগে (ওই অঙ্গসজ্জাগুলো অবশ্য শুধুমাত্র পুরুষদের শরীরেই দেখা যায়)। বুনো হাঁসেদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার চোখে পড়ে। এদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ডানাতেই সবুজ রঙের চমৎকার ছিট-ছিট দাগ থাকে—স্ত্রী-হাঁসেদের ক্ষেত্রে অবশ্য দাগগুলো কিছুটা ফিকে আর কিছুটা ছোট মাপের হয়। এদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ডানাতেই এই দাগের উদ্গম হয় খুব অল্প বয়সে, আবার পুরুষ-হাঁসেদের ল্যাজের কুঞ্চিত পালক ও অন্যান্য অঙ্গসজ্জাগুলোর উদ্গম হয় একটু বেশি বয়সে।[১৭] লিঙ্গগত প্রচুর সাদৃশ্য এবং লিঙ্গগত ব্যাপক বৈসাদৃশ্যের এই ধরনের দৃষ্টান্তের (ক্রসোপ্টিলন আর ময়ূরদের মতো) মাঝামাঝি জায়গায় বহু অন্তর্বর্তী দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করা

১৬। সাধারণ ময়ূরদের (pavo cristatus) মধ্যে শুধুমাত্র পুরুষদেরই পায়ের পিছনদিকে নখরতুল্য অঙ্গ থাকে, আবার জাভা ময়ূরদের (P. muticus) স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পায়েই ওই অঙ্গটি দেখা যায়। আমার ধারণা ছিল জাভা ময়ূরদের শরীরে ওই অঙ্গটি অন্য ময়ূরদের তুলনায় অনেক কম বয়সেই দেখা দেয়। কিন্তু আমস্টার্ডামের বাসিন্দা মিঃ হেগ্‌ট্‌ আমাকে একটি ভিন্ন তথ্য জানিয়েছেন। ১৮৬৯ সালের ২৩ এপ্রিল তারিখে তিনি তার আগের বছরে জাত উভয় প্রজাতির কিছু অল্পবয়সী ময়ূরকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সেই পর্যবেক্ষণে উভয় প্রজাতির ময়ূরদের পায়ে ওই অঙ্গটির বিকাশে কোনও পার্থক্য তাঁর নজরে পড়েনি। তবে তাদের শরীরে ওই অঙ্গগুলো তখনও পর্যন্ত ছোট্ট একটা আব বা সামান্য একটু স্ফীতি ছাড়া আর কিছু ছিল না। এই পর্যবেক্ষণের পরবর্তীকালে ওই অঙ্গটির বিকাশের হারে উভয় প্রজাতির মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখা গিয়ে থাকলে মিঃ হেগ্‌ট্‌ নিশ্চয়ই আমাকে জানতেন।

১৭। পাতিহাঁসেদের অন্য কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের ডানার ওই ছিট-ছিট দাগের মধ্যে অনেক বেশি পার্থক্য চোখে পড়ে। আমাদের নিয়ম অনুযায়ী এইসব প্রজাতির পুরুষ-হাঁসেদের ডানার ওই দাগগুলো সাধারণ পুরুষ-পাতিহাঁসেদের থেকে বেশি বয়সে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়াটাই স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু বাস্তবে সত্যিই তেমনটা ঘটে কিনা তা আমি আবিষ্কার করতে পারিনি। তবে এদের সমগোত্রীয় 'মার্গাস কিউকুলেটাস'-দের ক্ষেত্রে এই ধরনের একটা ব্যাপার লক্ষ করা যায়। এদের স্ত্রী আর পুরুষদের সাধারণ পালকের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকে এবং ডানায় ছিট-ছিট দাগেও বেশ কিছু পার্থক্য থাকে—পুরুষদের দাগগুলো ধবধবে সাদা হয় আর স্ত্রীদের দাগগুলো ধূসর-সাদা হয়। এদের অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদের সঙ্গে প্রথমদিকে স্ত্রী-প্রাণীদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকে, অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদের ডানার দাগগুলোও ধূসর-সাদা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ-প্রাণীরা যে-বয়সে পৌঁছে তাদের অন্যান্য সুস্পষ্ট লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে, তার থেকে অনেকটা কম বয়সেই তাদের ডানার এই দাগগুলো ধবধবে সাদা হয়ে যায়। দ্রষ্টব্য, অডুবন, 'অর্নিথোলজিক্যাল বায়োগ্রাফি', খণ্ড ৩, পৃঃ ২৪৯-২৫০।

যায় যে-সব ক্ষেত্রে প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকাশ ঘটে আমাদের কথিত নিয়ম দু'টি অনুসারেই।

কীটপতঙ্গদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। অধিকাংশ কীটপতঙ্গই মূককীট দশা থেকে পরিণত হয়ে বেরিয়ে আসে। ফলে এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো কোনও-একটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে কিংবা উভয় লিঙ্গেরই প্রাণীদের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার ব্যাপারটা এদের বিকশিত হয়ে ওঠার সময়কালের মধ্যেই নির্ধারিত হয়ে যায় কিনা, তা বুঝে ওঠা দুষ্কর। এদের ব্যাপারে অনেক কিছুই জানা নেই আমাদের। উদাহরণ হিসেবে প্রজাপতিদের দু'টো প্রজাতির কথা বলা যায়। একটা প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের গায়ের রঙ একই হয়, অন্য প্রজাতিটার ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের গায়ের রঙ আলাদা আলাদা হয়। গাত্রবর্ণের এই এক হওয়া বা না-হওয়ার ব্যাপারটা তাদের গুটি (cocoon) অবস্থায় থাকার সময় একই বয়সে নির্ধারিত হয়ে যায় কিনা, তা আমাদের জানা নেই। আবার যে-সব প্রজাপতিদের ডানার কয়েকটা রঙিন দাগ শুধুমাত্র কোনও-একটা লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যেই দেখা যায় এবং কয়েকটা রঙিন দাগ উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়, তাদের এই সমস্ত দাগগুলোর উদ্গম একই সঙ্গে ঘটে কিনা, তা-ও আমরা জানি না। বিকশিত হয়ে ওঠার সময়েই এই ধরনের একটা পার্থক্য গড়ে ওঠার ব্যাপারটাকে আপাতভাবে অসম্ভব মনে হলেও সত্যিই কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে অসম্ভব কিছু নয়। উদাহরণ হিসেবে অর্থোপ্টেরা বর্গের (আরশোলা, গঙ্গাফড়িং, পঙ্গপাল জাতীয়) পতঙ্গদের কথা বলা যেতে পারে। পরিণত অবস্থায় উপনীত হওয়ার পথে এদের একবারমাত্র রূপান্তর ঘটে না, বরং বেশ কিছু নির্মোচনের (molt) পথ বেয়েই পরিণত হয়ে ওঠে ওরা। এদের কয়েকটি প্রজাতির অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদের সঙ্গে প্রথমদিকে স্ত্রী-প্রাণীদের কোনও পার্থক্যই থাকে না, পরবর্তী আর-একটি নির্মোচনের সময় পুরুষ-প্রাণীরা তাদের পুরুষোচিত বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে। কয়েক ধরনের কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের মধ্যেও নির্মোচনের সময়ে এই একই ঘটনা ঘটে থাকে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুক্ত অবস্থায় থাকা বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের বিকশিত হয়ে ওঠার সময়কালের সঙ্গে তাদের নানান বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারিত হওয়ার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমরা গৃহপালিত জীবজন্তুদের নিয়ে আলোচনা করব। শরীরে স্বাভাবিকের থেকে বেশি সংখ্যক আঙুল থাকা এবং আঙুলের কয়েকটি অস্থি না-থাকা—এগুলো অবশ্যই একেবারে ভ্রূণাবস্থাতেই নির্ধারিত হয়ে যায়। অত্যধিক রক্তপাতের প্রবণতা এবং সম্ভবত বর্ণান্ধতাও সহজাত ব্যাধি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এইসব বৈশিষ্ট্য এবং এই ধরনের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য প্রায়শই শুধুমাত্র একটি লিঙ্গের

প্রাণীদের মধ্যেই সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। অর্থাৎ জীবনের একেবারে প্রথমদিকে গড়ে ওঠা বৈশিষ্ট্যগুলো উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হওয়ার নিয়মটি এইসব ক্ষেত্রে একেবারেই প্রযোজ্য নয়। তবে আমরা আগেই বলেছি যে একটু বেশি বয়সে কোনও-একটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে দেখা দেওয়া বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের সমলিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়াটা যতটা সার্বজনীন সত্য, জীবনের প্রথম দিকে অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়াটা ঠিক ততটা সার্বজনীন সত্য নয়। যৌন কার্যকলাপ শুরু হওয়ার অনেক আগেই শুধুমাত্র একটি লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যেই কিছু অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রীভূত হওয়া সম্বন্ধে ওপরে আমরা যা বলেছি, তা থেকে অনুমান করা যায় যে একেবারে অল্প বয়স থেকেই স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকে। কোনও-একটি বিশেষ লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ব্যাধিগুলো জীবনের ঠিক কোন্ সময় থেকে দেখা দেয়, সে সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে গেঁটেবাত নামক ব্যাধিটা আমাদের নিয়মের আওতার মধ্যেই পড়ে, কারণ এটা সাধারণত যৌবনের অমিতাচারের ফলেই দেখা দেয় এবং এটা পিতার থেকে পুত্রদের মধ্যে যত বেশি করে সঞ্চারিত হয়, কন্যাদের মধ্যে তত বেশি করে সঞ্চারিত হয় না।

বিভিন্ন ধরনের গৃহপালিত ভেড়া, ছাগল ও গবাদি পশুদের লক্ষ করলে একটা ব্যাপার সহজেই চোখে পড়ে। এদের পুরুষ-প্রাণীদের মাথার শিং, কপাল, কেশর, গলকম্বল, ল্যাজ ও কাঁধের কুঁজের আকার বা বিকাশ স্ত্রী-প্রাণীদের থেকে আলাদা ধরনের হয়। একটু বেশি বয়সে না-পৌঁছনো পর্যন্ত এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো পুরোপুরিভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে না এবং ব্যাপারটা আমাদের কথিত নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কুকুরদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সাধারণত কোনও পার্থক্য থাকে না, তবে এদের কয়েকটি বর্গের মধ্যে, বিশেষত স্কটল্যান্ডের ডিয়ার-হাউন্ডদের মধ্যে পুরুষ-কুকুররা মাদি-কুকুরদের থেকে আকারে অনেক বড় এবং ওজনে অনেক ভারী হয়। পরবর্তী একটি পরিচ্ছেদে আমরা দেখব যে এই বর্গের পুরুষ-কুকুররা অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত আকারে ক্রমাগত বেড়েই চলে এবং আমাদের নিয়ম অনুযায়ী, এই কারণেই তাদের বর্ধিত আকৃতিটা শুধুমাত্র তাদের পুরুষ-সন্তানদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়। অন্যদিকে, বিড়ালদের ক্ষেত্রে কচ্ছপের খোলার মতো গাত্রবর্ণটা শুধুমাত্র মাদি-বিড়ালদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে আর তাদের জন্মের সময়েই সেটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়—এবং এই ঘটনাটা আমাদের নিয়মের সঙ্গে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এক জাতীয় পায়রাদের মধ্যে শুধুমাত্র পুরুষ-পায়রাদের গায়েই কালো রঙের ডোরা থাকে। একেবারে ছানা অবস্থাতেও ডোরাগুলো লক্ষ করা যায় ঠিকই, তবে

প্রতিবার নির্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে ডোরাগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এদের এই ব্যাপারটা আমাদের নিয়মের কিছুটা পক্ষে যায়, আবার কিছুটা বিপক্ষেও যায়। ইংলিশ ক্যারিয়ার পায়রা আর পাউটার বা নোটন পায়রাদের মাথার মাংসল উপাঙ্গ ও দেহমধ্যস্থ থলির মতো কোষটির (crop) পূর্ণ বিকাশ ঘটে একটু বেশি বয়সে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি পরিপূর্ণ রূপে সঞ্চারিত হয় শুধুমাত্র তাদের পুরুষ-বংশধরদের মধ্যেই (যা আমাদের ওই নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ)। নীচে যে-উদাহরণগুলো পেশ করা হচ্ছে সেগুলো সম্ভবত পূর্বোল্লিখিত সেই শ্রেণীটির অন্তর্ভুক্ত যেখানে উভয় লিঙ্গের প্রাণীরাই একটু বেশি বয়সে একই পদ্ধতিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন করে এবং তাদের এই নতুন বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের উভয় লিঙ্গেরই বংশধরদের মধ্যে ওই একই বয়সে ফুটে উঠতে শুরু করে। যদি তা-ই হয়, তাহলে এই উদাহরণগুলো আমাদের নিয়মের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। পায়রাদের এমন কয়েকটি উপ-বর্গের কথা নিউমেইস্টার উল্লেখ করেছেন যাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই গায়ের রঙ দু'-তিনটি নির্মোচনের সময় পাল্টে যায় (আমন্ড টাম্বলার পায়রাদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা চোখে পড়ে)। এই পরিবর্তনগুলো একটু বেশি বয়সে ঘটলেও উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যেই এটা ঘটে থাকে। লন্ডন প্রাইজ নামে এক ধরনের ক্যানারি পাখিদের মধ্যেও প্রায় একই ঘটনা চোখে পড়ে।

মুরগিদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হবে নাকি শুধু কোনও-একটি লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হবে, তা সাধারণত নির্ধারিত হয় যে-বয়সে ওই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা দেয় সেই বয়সের দ্বারাই। এদের যে-সব বর্গের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ-প্রাণীদের সঙ্গে স্ত্রী-প্রাণীদের এবং নিজেদের বন্য পূর্বপুরুষদের গায়ের রঙের বিপুল পার্থক্য থাকে, সেইসব বর্গের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদেরও গায়ের রঙের প্রচুর পার্থক্য চোখে পড়ে। এ থেকে বোঝা যায় এই নবার্জিত বৈশিষ্ট্যটা তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল একটু বেশি বয়সে। অন্যদিকে, যে-সব বর্গের মুরগিদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের গায়ের রঙ এক হয়, সেইসব বর্গের অল্পবয়সী মুরগিদের গায়ের রঙের সঙ্গে তাদের পিতামাতার গায়ের রঙের প্রায় কোনও পার্থক্যই থাকে না। এ থেকে বোঝা যায় যে এদের ওই গায়ের রঙটা দেখা দিয়েছিল খুব অল্প বয়সেই। সাদা-কালো রঙবিশিষ্ট প্রতিটি বর্গের মুরগিদের ক্ষেত্রেই এই ব্যাপারটা দেখা যায়—এদের উভয় লিঙ্গের অল্পবয়সী ও বেশি বয়সী মুরগিদের গায়ের রঙ একইরকম হয়। এক্ষেত্রে এমন কথাও বলা যাবে না যে এদের সাদা বা কালো রঙের পালকের মধ্যে এমন বিশেষ কিছু আছে যার দরুন তা তাদের উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, কারণ অধিকাংশ সাধারণ প্রজাতির মুরগিদের মধ্যে শুধু পুরুষদের গায়ের রঙই কালো বা সাদা হয় এবং স্ত্রী-প্রাণীদের

গায়ের রঙ অন্যরকম হয়ে থাকে। মুরগিদের তথাকথিত কাকু উপ-বর্গের সদস্যদের পালকে কালো রঙের আড়াআড়ি ডোরা থাকে এবং এদের স্ত্রী, পুরুষ ও ছানাদের গায়ের রঙ প্রায় একইরকম হয়। গৃহপালিত সেবরাইট মুরগিদের স্ত্রী-পুরুষের শরীরে একইরকম কারুকার্যময় পালক দেখা যায় এবং ছানাদের ডানার পালকেও সুস্পষ্ট কারুকার্য থাকে (অবশ্য এদের এই কারুকার্যগুলো কিছুটা অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে)। চুম্‌কিওয়ালা হ্যাম্‌বার্গদের মধ্যে অবশ্য এর কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। এদের আদি পূর্বপুরুষদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যতটা সাদৃশ্য ছিল, এদের এখনকার স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে তার থেকে অনেক বেশি সাদৃশ্য চোখে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা এদের বৈশিষ্ট্যসূচক পালকগুলো অর্জন করে অনেকটা বেশি বয়সে এবং সেটা বোঝা যায় এদের ছানাদের গায়ে অন্য ধরনের দাগের অস্তিত্ব থেকে। গায়ের রঙ ছাড়া অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাপারে বলা যায়—এদের বন্য-পূর্বপুরুষ প্রজাতির মধ্যে এবং অধিকাংশ গৃহপালিত বর্গের মধ্যে শুধু পুরুষ-প্রাণীদের মাথাতেই সুবিকশিত ঝুঁটি থাকে, কিন্তু স্প্যানিশ মুরগিদের ছানাদের মাথায় খুব অল্প বয়সেই বিশাল ঝুঁটি দেখা যায় এবং পুরুষদের মাথায় এত অল্প বয়সে ঝুঁটির উদ্গমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এদের পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী-প্রাণীদের মাথাতেও অস্বাভাবিক মাপের ঝুঁটি থাকতে দেখা যায়। লড়ুয়ে (Game) মুরগিদের মধ্যে একেবারে অল্প বয়স থেকেই যুদ্ধপ্রিয়তার মেজাজটা যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে, সে ব্যাপারে প্রমাণের কোনও অভাব নেই। এদের এই মেজাজটা এদের উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয় এবং তার ফলে মুরগিরা অত্যধিক যুদ্ধপ্রিয় হয়ে ওঠে বলে তাদের এখন আলাদা খাঁচায় রাখা হয়। পোলিশ বর্গের মুরগিদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করা যায়। ডিম ফুটে বাচ্চারা বেরিয়ে আসার আগেই তাদের মাথার অস্থিময় স্ফীত অংশটা (যে-অংশটাই ধরে রাখে এদের মাথার ঝুঁটিটাকে) আংশিকভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে এবং তার কিছুদিনের মধ্যেই ঝুঁটিটাও গড়ে উঠতে শুরু করে—যদিও প্রথমদিকে সেটা খুব অস্পষ্ট অবস্থায় থাকে। এই বর্গের উভয় লিঙ্গেরই পূর্ণবয়স্ক সদস্যদের মাথায় একটা বড়সড় অস্থিময় স্ফীত অংশ এবং একটা বিশাল ঝুঁটি দেখা যায়।

বিভিন্ন মুক্ত ও গৃহপালিত প্রজাতির মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকশিত হয়ে ওঠার সময়কাল এবং সেগুলি তাদের বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার পদ্ধতির মধ্যেই বা কেমন সম্পর্ক থাকে (যেমন যে-সব প্রজাতির হরিণদের শুধুমাত্র পুরুষদের মাথাতেই শৃঙ্গ থাকে তাদের মাথার শৃঙ্গ যে-বয়সে দেখা দেয়, তার থেকে অনেক কম বয়সেই শৃঙ্গ দেখা দেয় বল্‌গা-হরিণদের মাথায় এবং এদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মাথাতেই শৃঙ্গ থাকে)—তা আমরা এতক্ষণ ধরে দেখলাম। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে

বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বেশি বয়সে দেখা দেওয়াটা কোনও-একটি বিশেষ লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো সঞ্চারিত হওয়ার একমাত্র কারণ না হলেও অন্যতম কারণ বটেই। আবার যেখানে এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, সেখানে এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের অল্প বয়সে অর্জন করাটা একটা কারণ হিসেবে কাজ করে (যদিও এই কারণটা কিছুটা কম গুরুত্বপূর্ণ) এবং এইসব ক্ষেত্রে উভয় লিঙ্গের সদস্যদের শারীরিক গঠনে তেমন কোনও পার্থক্য থাকে না। তবে এ-সব সত্ত্বেও আমাদের মনে হয় যে একেবারে ভ্রূণাবস্থাতেও উভয় লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যে কিছু-না-কিছু পার্থক্য থাকে, কেননা এই বয়সে যে-বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা দেয় সেগুলো প্রায়ই বিশেষ কোনও-একটি লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায়।

সারসংক্ষেপ এবং উপসংহার : বংশগতির বিভিন্ন নিয়ম সম্বন্ধে আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম তা থেকে এটা স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে পিতামাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায়শই বা সবসময়েই তাদের সমলিঙ্গের সন্তানদের মধ্যে ফুটে উঠতে চায়, এবং তা ফুটে উঠতে শুরু করে পিতা কিংবা মাতা যে-বয়সে, বছরের যে-মরশুমে ওই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করেছিল ঠিক সেই বয়সে, ঠিক সেই মরশুমেই। কিন্তু এই নিয়মগুলো কোনও ধ্রুব ব্যাপার নয় এবং এই না-হওয়ার কারণটা আমাদের জানা নেই। তাই জন্যেই কোনও প্রজাতির যখন পরিবর্তন ঘটে তখন এই পরিবর্তনগুলো সঞ্চারিত হতে পারে বিভিন্ন ভাবে—কয়েকটা পরিবর্তন হয়তো কোনও-একটি বিশেষ লিঙ্গের সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, আবার কয়েকটা পরিবর্তন সঞ্চারিত হয় উভয় লিঙ্গের সন্তানদের মধ্যেই ; কিছু কিছু পরিবর্তন একটা বিশেষ বয়সের সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, আবার কিছু-কিছু পরিবর্তন সঞ্চারিত হয় যে-কোনও বয়সের সন্তানদের মধ্যেই। বংশগতির নিয়মগুলোই যে শুধু অত্যন্ত জটিল তাই নয়, যে-কারণগুলো পরিবর্তনশীলতার জন্ম দেয় ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই কারণগুলোও অত্যন্ত জটিল। এইভাবে উদ্ভূত পরিবর্তনগুলো সংরক্ষিত ও পুঞ্জীভূত হয় যৌন নির্বাচনের সাহায্যে। এই যৌন নির্বাচনও একটা রীতিমতো জটিল প্রক্রিয়া যা নির্ভর করে পুরুষদের ভালবাসার তীব্রতা, সাহস ও পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপরে এবং নারীদের উপলব্ধির ক্ষমতা, রুচি ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরে। যৌন নির্বাচন আবার বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা, যে-প্রাকৃতিক নির্বাচন কোনও প্রজাতির সামগ্রিক কল্যাণের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়। অর্থাৎ কোনও-একটি লিঙ্গের অথবা উভয় লিঙ্গেরই সদস্যরা যৌন নির্বাচনের দ্বারা যে-প্রক্রিয়ায় প্রভাবিত হয়, সেই প্রক্রিয়াটি চূড়ান্তরকম জটিল হতে বাধ্য।

কোনও প্রজাতির কোনও-একটি লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যে যখন বেশি বয়সে

কোনও পরিবর্তন ঘটে এবং তা তাদের সমলিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে ওই একই বয়সে সঞ্চারিত হয়, তখন অন্য লিঙ্গটির সদস্যরা এবং অল্পবয়সীরা এই পরিবর্তনের আওতার বাইরে থেকে যায়। এই পরিবর্তনগুলো যখন বেশি বয়সে ঘটে কিন্তু উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে একই বয়সে সঞ্চারিত হয়, তখন শুধু অল্পবয়সীরাই অপরিবর্তিত রয়ে যায়। তবে পরিবর্তন যে-কোনও বয়সেই ঘটতে পারে, ঘটতে পারে শুধুমাত্র একটি লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যে বা উভয় লিঙ্গেরই সদস্যদের মধ্যে এবং তা উভয় লিঙ্গেরই সব বয়সের বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে গোটা প্রজাতিটার সমস্ত সদস্য একইভাবে একই পরিবর্তনের আওতায় এসে পড়ে। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা দেখতে পাব প্রকৃতির রাজত্বে এ-ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে।

কোনও প্রাণী প্রজননক্ষম হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত যৌন নির্বাচন তার ওপরে ক্রিয়া করতে পারে না। যৌনতার ব্যাপারে পুরুষদের অতিরিক্ত ব্যগ্রতার দরুন যৌন নির্বাচন সাধারণভাবে পুরুষদের ক্ষেত্রেই বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে, নারীদের ক্ষেত্রে তেমনভাবে হয়নি। তার ফলেই পুরুষরা অর্জন করেছে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াই করার মতো অস্ত্রতুল্য অঙ্গ, সেইসঙ্গেই অর্জন করেছে নারীদের খুঁজে বার করা, আঁকড়ে ধরা এবং তাদের উত্তেজিত করা বা মোহিত করার উপযোগী অঙ্গসমূহ। এইসব অঙ্গের ব্যাপারে যখন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য থাকে, তখন প্রায় সব ক্ষেত্রেই পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদেরও কমবেশি পার্থক্য থাকেই। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, পর্যায়ক্রমিক যে-সব পরিবর্তনের পথ বেয়ে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ-প্রাণীরা পরিবর্তিত হয়, সেগুলো তারা প্রজননক্ষম হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত সাধারণত দেখা দেয় না। যে-সব ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনগুলো অল্প বয়সে দেখা দেয়, সেইসব ক্ষেত্রে অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীরাও পূর্ণবয়স্ক পুরুষ-প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো কমবেশি অর্জন করে থাকে। পূর্ণবয়স্ক ও অল্পবয়স্ক পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে এ-ধরনের পার্থক্য বহু প্রজাতির ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়।

অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদের শরীরে কখনও-কখনও এমন কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে যেগুলো ওই বয়সে তাদের কোনও কাজে তো লাগেই না, বরং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। যেমন তাদের গায়ের রঙ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠলে তারা শত্রুদের চোখে ধরা পড়ে যায় কিংবা মাথায় হঠাৎ বড় বড় শিং দেখা দিলে তাদের জীবনীশক্তি প্রচুর পরিমাণে খরচ হয়ে যায়। অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যেই এই ধরনের পরিবর্তন দেখা দিলেও প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে, পূর্ণবয়স্ক ও অভিজ্ঞ পুরুষ-প্রাণীরা এই ধরনের অঙ্গপ্রাপ্তি থেকে যে-সুবিধাটা পায়

সেটা তাদের নানান বিপদ থেকে রক্ষা করে এবং জীবনীশক্তির অপব্যয়কে কিছুটা প্রতিহত করে।

যে-সব পরিবর্তনগুলো পুরুষ-প্রাণীদের সক্ষম করে তোলে অন্য পুরুষ-প্রাণীদের পরাজিত করার ব্যাপারে, কিংবা যে-পরিবর্তনগুলো তাদের সাহায্য করে স্ত্রী-প্রাণীদের খুঁজে বার করতে, আঁকড়ে ধরতে বা মোহিত করতে, সেই পরিবর্তনগুলো স্ত্রী-প্রাণীদের শরীরে দেখা দিলে ফলটা কী দাঁড়াবে? না, এই পরিবর্তনগুলো তাদের কোনও কাজেই লাগবে না এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে। গৃহপালিত পশুদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে তাদের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনগুলো যদি খুব সতর্কভাবে নির্বাচন করে ঘটানো না হয়, তাহলে বিভিন্ন বর্গের প্রাণীদের মধ্যে যৌনসম্পর্ক ও আকস্মিক মৃত্যু মারফত অল্পদিনের মধ্যেই সেগুলো হারিয়ে ফেলবে তারা। প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকা স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে যদি এই ধরনের পরিবর্তনগুলো দেখা দেয় এবং সেগুলো যদি শুধুমাত্র তাদের সমলিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হতে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যেও এই পরিবর্তনগুলো বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না, বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু স্ত্রী-প্রাণীদের এই নবার্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো যদি তাদের উভয় লিঙ্গেরই সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহলে তাদের পুরুষ-সন্তানদের পক্ষে সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যগুলো যৌন নির্বাচন মারফত টিকে থাকতে পারবে তাদের মধ্যে এবং তার ফলস্বরূপ তাদের উভয় লিঙ্গের বংশধররা একইভাবে পরিবর্তিত হতে পারবে—যদিও এই বৈশিষ্ট্যগুলো স্ত্রী-প্রাণীদের জীবনে কোনও কাজেই লাগবে না। এইসব জটিলতর বিষয় নিয়ে এখানে আর বিশদ আলোচনা করছি না, এগুলোর প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা যাবে। শেষত, স্ত্রী-প্রাণীরা অনেক সময়েই সঞ্চারণ মারফত পুরুষ-প্রাণীদের কাছ থেকে তাদের নানান বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে এবং বাস্তবে তার অনেক প্রমাণও আছে।

যে-সব পরিবর্তন বেশি বয়সে দেখা দেয় এবং শুধুমাত্র একটি লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, প্রজাতির বংশবিস্তারের ব্যাপারে সেগুলো বরাবরই যৌন নির্বাচনের সহায়তা পেয়েছে এবং যৌন নির্বাচন মারফত পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। প্রাথমিক বিচারে এ থেকে স্পষ্টতই মনে হয় যে জীবনের সাধারণ অভ্যাস-আচরণের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিবর্তনগুলো প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত পুঞ্জীভূত না-হওয়াটাই স্বাভাবিক। তা যদি ঘটত তাহলে দু'টি লিঙ্গের প্রাণীদের পরিবর্তনটা ভিন্ন ভিন্ন কারণে প্রায়শই আলাদা আলাদা ধরনের হত, যেমন শিকার ধরার জন্য বা বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এদের পরিবর্তন ঘটত আলাদা আলাদা ভাবে। দু'টি

লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে এ-ধরনের পার্থক্য অবশ্য মাঝে-মধ্যে ঘটেও থাকে, বিশেষত নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে। কিন্তু সে-রকমটা ঘটার অর্থ এই দাঁড়ায় যে টিকে থাকার সংগ্রামে স্ত্রী-প্রাণী আর পুরুষ-প্রাণীরা আলাদা আলাদা অভ্যাস-আচরণের পথ বেয়ে এগোয়, যা উচ্চতর শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় না বললেই চলে। তবে প্রজনন সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা, কারণ প্রজনন সংক্রান্ত ব্যাপারে স্ত্রী-প্রাণী আর পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য থাকতে বাধ্য। প্রজনন সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের কোনও পরিবর্তন দেখা দিলে সেটা সাধারণত কোনও-একটি লিঙ্গের সদস্যদেরই কাজে লাগে এবং এই পরিবর্তনগুলো একটু বেশি বয়সে দেখা দেয় বলে এগুলো শুধুমাত্র কোনও-একটি লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়। এই ধরনের পরিবর্তনগুলো পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সংরক্ষিত হতে হতে ও সঞ্চারিত হতে হতে অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্ম দেয়।

পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমি সকল শ্রেণীর প্রাণীদের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করব এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর্তমান পরিচ্ছেদে আলোচিত নীতিগুলিকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করব। নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করার দরকার হবে না, কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীর প্রাণীদের নিয়ে, বিশেষত পাখিদের নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতে হবে আমাকে। যে-অসংখ্য অঙ্গের সাহায্যে পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের খুঁজে বার করে কিংবা খুঁজে পাওয়ার পর আঁকড়ে ধরে, তার মধ্যে থেকে দৃষ্টান্ত হিসেবে অল্প কয়েকটা অঙ্গের কথাই উল্লেখ করব আমি। অন্যদিকে, যে-সব অঙ্গ ও সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে পুরুষ-প্রাণীরা অন্য পুরুষ-প্রাণীদের পরাজিত করে এবং যেগুলোর সাহায্যে তারা স্ত্রী-প্রাণীদের প্রলুব্ধ বা উত্তেজিত করে তোলে সেগুলো নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব, কারণ সব দিক থেকেই এগুলো অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক।

বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে দু'টি লিঙ্গের সদস্যদের আনুপাতিক সংখ্যা প্রসঙ্গে সংযোজনী অংশ

সমগ্র প্রাণিজগতে স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যাগত অনুপাত প্রসঙ্গে আজ পর্যন্ত কেউই তেমন কিছু আলোচনা করেননি। আমি নিজে এ ব্যাপার যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তা এখানে পেশ করছি, তবে মনে রাখবেন এই তথ্যগুলো মোটেই পূর্ণাঙ্গ বা নিখুঁত নয়। এগুলোর মধ্যে অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে যথাযথ হিসাব পাওয়া গেছে এবং সেই সংখ্যাগুলোও খুব বেশি নয়। মানুষের ক্ষেত্রে এই অনুপাতটা সুনিশ্চিতভাবে জানা আছে বলে তুলনার মাপকাঠি হিসেবে তাদের কথা দিয়েই শুরু করছি আমি।

মানুষ

ইংল্যান্ডে দশ বছরে (১৮৫৭ থেকে ১৮৬৬ পর্যন্ত) জীবিত শিশুদের জন্মের গড় সংখ্যা ছিল ৭০৭.১২০ জন, যার মধ্যে প্রতি ১০৪.৫ জন পুরুষ-শিশু পিছু নারী-শিশু ছিল ১০০ জন। কিন্তু ১৮৫৭ সালে ইংল্যান্ডে পুরুষ-শিশুর জন্মের হার ছিল প্রতি ১০০ জন নারী-শিশু ১০৫.২ জন আর ১৮৬৫ সালে ছিল ১০৪.০ জন। আলাদা আলাদা জেলাগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই ওই দশ বছরে বাকিংহ্যামশায়ারে (যেখানে প্রতি বছর প্রায় ৫০০০ করে শিশু জন্মায়) পুরুষ-শিশু পিছু নারী-শিশুর জন্মের গড় অনুপাত ছিল প্রতি ১০২.৮ জন পিছু ১০০ জন। উত্তর ওয়েল্‌সে (যেখানে প্রতি বছর জন্মের গড় ১২৮৭৩ জন) এই সংখ্যাটা ছিল ১০৬.২ জন পিছু ১০০ জন। রুটল্যান্ডশায়ারের মতো ছোট্ট জেলাটির (যেখানে প্রতি বছরে গড়ে মাত্র ৭৩৯টি শিশু জন্মায়) দিকে তাকালে দেখা যায় ১৮৬৪ সালে প্রতি ১০০ জন নারী-শিশু পিছু পুরুষ-শিশুর জন্মের অনুপাত ছিল ১১৪.৬ জন আর ১৮৬২ সালে মাত্র ৯৭.০ জন। কিন্তু এই জেলাটিতেও ওই দশ বছরে জন্মানো মোট ৭৩৮৫টি শিশুর মধ্যে প্রতি ১০০ জন নারী-শিশু পিছু পুরুষ-শিশুর জন্মের অনুপাত ছিল ১০৪.৫ জন—অর্থাৎ সারা ইংল্যান্ডে ওই দশ বছরে পুরুষ-শিশু আর নারী-শিশুদের জন্মের গড় অনুপাতের সমান। অজানা কিছু কারণে এই অনুপাতটা মাঝেমাঝে কিছুটা এলোমেলো হয়ে যায়। অধ্যাপক ফেয়ি বলেছেন, 'নরওয়ের কয়েকটি জেলায় দশ বছরে পুরুষ-শিশুদের সংখ্যায় বেশ কিছুটা ঘাটতি দেখা দিয়েছে, আবার অন্য জেলাগুলিতে চিত্রটা ঠিক তার বিপরীত।' ফ্রান্সে চুয়াল্লিশ বছরে প্রতি ১০০ জন নারী-শিশু পিছু পুরুষ-শিশুর জন্মের হার ছিল ১০৬.২ জন। কিন্তু এই সময়কালের মধ্যে একটা বিভাগে পাঁচবার এবং অন্য একটা বিভাগে ছ'বার নারী-শিশুর জন্মের হার পুরুষ-শিশুর হারকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। রাশিয়ায় প্রতি ১০০ জন নারী-শিশু কিছু পুরুষ-শিশুর জন্মের হার ১০৮.৯ জন আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় ১১০.৫ জন। ইউরোপে প্রায় ৭ কোটি শিশুর জন্ম থেকে হিসেব করে বিকেস্ দেখিয়েছেন যে সেখানে এই অনুপাতটা ছিল প্রতি ১০০ জন নারী-শিশু পিছু ১০৬ জন পুরুষ-শিশু। অন্যদিকে, উত্তমাশা অন্তরীপে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ-শিশুর জন্মের হার ছিল খুবই কম। পরপর কয়েক বছরে প্রতি ১০০ জন শ্বেতাঙ্গ নারী-শিশু পিছু শ্বেতাঙ্গ পুরুষ-শিশুদের জন্মের হার ছিল ৯০ জন থেকে ৯৯ জন পর্যন্ত। এখানে একটা কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যের কথা উল্লেখ করা যায়—খ্রিস্টানদের থেকে ইহুদিদের মধ্যে পুরুষ-শিশুর জন্মের অনুপাত অনেক বেশি। প্রতি ১০০ জন ইহুদি নারী-শিশু পিছু ইহুদি পুরুষ-শিশুদের জন্মের অনুপাত প্রাশিয়ায় ১১৩ জন, ব্রেসলৌ-এ ১১৪ জন এবং লিভোনিয়ায় ১২০ জন। এইসব দেশে

খ্রিস্টান পুরুষ-শিশুদের জন্মের হার কিন্তু অন্য সব জায়গার মতোই স্বাভাবিক, যেমন লিভোনিয়ায় প্রতি ১০০ জন খ্রিস্টান নারী-শিশু পিছু ১০৪ জন করে খ্রিস্টান পুরুষ-শিশু জন্মায়।

অধ্যাপক ফেয়ি বলেছেন, 'গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবকালে উভয় লিঙ্গের শিশুদের মৃত্যুর হার সমান হলে পুরুষ-শিশুর সংখ্যা আরও অনেক বেশি হতে পারত। কিন্তু ঘটনা হল—বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে মৃত অবস্থায় জাত প্রতি ১০০ জন নারী-শিশু পিছু মৃত অবস্থায় জাত পুরুষ-শিশুর সংখ্যা ১৩৪.৬ জন থেকে শুরু করে ১৪৪.৯ জন পর্যন্ত হয়ে থাকে। জন্মানোর পর প্রথম চার-পাঁচ বছরের মধ্যে যত নারী-শিশু মারা যায়, পুরুষ-শিশু মারা যায় তার থেকে অনেক বেশি। যেমন ইংল্যান্ডে জন্মের পর প্রথম এক বছরের মধ্যে ১০০ জন নারী-শিশু মারা গেলে পুরুষ-শিশু মারা যায় ১২৬ জন। ফ্রান্সে এই সংখ্যাটা আরও বেশি।'[১৮] এই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডঃ স্টকটন-হগ বলেছেন যে নারীদের তুলনায় পুরুষদের শারীরিক বিকাশ প্রায়শই বেশি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে এবং এটা এই ঘটনার আংশিক কারণ হিসেবে কাজ করে। আমরা আগেই দেখেছি যে পুরুষদের শারীরিক গঠনের পরিবর্তনশীলতা নারীদের থেকে অনেক বেশি হয়, আর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহের পরিবর্তনশীলতা স্বাভাবিকভাবেই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। আবার নারী-শিশুদের তুলনায় পুরুষ-শিশুদের শরীরের আয়তন, বিশেষত মাথার আয়তন বড় হওয়াটাও এই ঘটনার অন্যতম কারণ, কেননা এর ফলে প্রসবের সময় পুরুষ-শিশুদের আঘাত লাগার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। এর ফলস্বরূপ মৃত অবস্থায় জাত পুরুষ-শিশুর সংখ্যাও অনেক বেশি হয়। ডঃ ক্রিকটন ব্রাউন[১৯]-এর মতো একজন সুযোগ্য ব্যক্তিও বলেছেন যে জন্মের পর কয়েক বছরের মধ্যে নারী-শিশুদের থেকে পুরুষ-শিশুরা অনেক বেশি অসুখে ভোগে। জন্মের সময় ও জন্মের কিছুদিন পরে পুরুষ-শিশুদের মৃত্যু-হারের এই আধিক্যের দরুন এবং বয়স্ক

১৮। ডঃ স্টার্ক বলেছেন ('টেন্‌থ অ্যানুয়াল রিপোর্টস অফ বার্থস, ডেথ্‌স্, এটসেটেরা ইন স্কটল্যান্ড', পৃঃ ২৮), 'এইসব উদাহরণ থেকে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, যে-কোনও বয়সেই স্কটল্যান্ডের নারীদের থেকে পুরুষদের মৃত্যুর সম্ভাবনা ও মৃত্যু-হার অনেক বেশি। তবে এই ঘটনাটা সবথেকে বেশি করে ঘটে শৈশবাবস্থায়, যখন নারী-শিশু আর পুরুষ-শিশুদের পোশাক, খাদ্য এবং সাধারণ চিকিৎসার মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না। এ থেকে মনে হয় পুরুষদের মৃত্যুহার বেশি হওয়ার ব্যাপারটা একটা প্রাকৃতিক ও শারীরিক গঠনগত বৈশিষ্ট্য যা গড়ে ওঠে একমাত্র লিঙ্গগত কারণেই।'

১৯। 'ওয়েস্ট রাইডিং লুনাটিক অ্যাসাইলাম রিপোর্টস', খণ্ড ১, ১৮৭১, পৃঃ ৮। স্যর জে. সিম্পসন প্রমাণ করেছেন, পুরুষ-শিশুর মাথার পরিধি নারী-শিশুর মাথায় পরিধির চেয়ে ৩/৮ ইঞ্চি আর আড়াআড়ি ব্যাস ১/৮ ইঞ্চি বড় হয়। কোয়েট্‌লেট দেখিয়েছেন যে জন্মের সময় নারী-শিশুদের শরীরের আয়তন পুরুষ-শিশুদের চেয়ে ছোট থাকে।

পুরুষদের বেশি মাত্রায় নানান বিপদের মুখোমুখি হওয়া ও দেশান্তরী হওয়ার প্রবণতার দরুন প্রাচীন জনবসতিগুলোয় (যে-সব জায়গার প্রামাণ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায়[২০]) পুরুষদের তুলনায় নারীদের সংখ্যা অনেক বেশ হতে দেখা যায়।

নেপ্‌ল্‌স্‌, প্রাশিয়া, ওয়েস্টফালিয়া, হল্যান্ড, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু বিশিষ্ট এই সব'কটা দেশেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ে। এইসব দেশে বৈধ নারী-শিশুর তুলনায় বৈধ পুরুষ-শিশুর সংখ্যা বেশি হলেও অবৈধ সন্তানদের মধ্যে পুরুষ-শিশুর সংখ্যা কিন্তু কিছুটা কমই থাকে। প্রথম দর্শনে ঘটনাটাকে রহস্যময় বলেই মনে হয়। বিভিন্ন লেখক ব্যাপারটাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, যেমন কেউ বলেছেন ওই সময় মায়েদের বয়স খুব কম থাকে বলেই এমনটা হয়, কেউ-বা বলেছেন প্রথম গর্ভাবস্থার অনুপাত অনেক বেশি হওয়াটাই এর কারণ ইত্যাদি। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে পুরুষ-শিশুদের মাথার আয়তন বড় হওয়ার দরুন প্রসবের সময় এরা বেশি কষ্ট পায়। আর গর্ভাবস্থাটা গোপন করার জন্য কোমরে শক্ত করে দড়ি বা লেন্স বাঁধা, কঠোর পরিশ্রম করা, মানসিক যন্ত্রণা ইত্যাদি নানান কারণে অবৈধ সন্তানের জন্মদাত্রীরা অন্য মায়েদের থেকে অনেক বেশি প্রসববেদনা ভোগ করে বলে তাদের পুরুষ-সন্তানরাও নারী-সন্তানদের থেকে বেশি কষ্টের মুখোমুখি হয়। বৈধ অবস্থায় জাত শিশুদের থেকে অবৈধ অবস্থায় জাত শিশুদের মধ্যে পুরুষ-সন্তানরা যে নারী-সন্তানদের চেয়ে কম সংখ্যায় জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, তার প্রধান কারণ সম্ভবত এটাই। বেশির ভাগ জীবজন্তুদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ-প্রাণীদের আয়তন প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-প্রাণীদের থেকে বড় হয়। আসলে স্ত্রী-প্রাণীদের দখল করার সংগ্রামে শক্তিশালী পুরুষ-প্রাণীরা দুর্বলতর পুরুষ-প্রাণীদের পরাজিত করে স্ত্রী-প্রাণীদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং ঠিক এই কারণেই অন্তত কিছু কিছু জীবজন্তুদের ক্ষেত্রে জন্মের সময়েই স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের শরীরের আয়তনে পার্থক্য থাকতে দেখা যায়। এইসব তথ্য থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে জন্মের সময় নারী-শিশুদের তুলনায় পুরুষ-শিশুদের মৃত্যু-হার বেশি হওয়ার (বিশেষত অবৈধ সন্তানদের ক্ষেত্রে) অন্তত আংশিক কারণ হিসেবে কাজ করে যৌন নির্বাচন।

অনেকে মনে করেন যে পিতামাতার আপেক্ষিক বয়স কত তা দিয়েই সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। মানুষ এবং কিছু গৃহপালিত পশুদের সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য পেশ করে অধ্যাপক লিউকার্ট দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে পিতা-মাতার আপেক্ষিক

২০। তথ্যনিষ্ঠ আজারা দেখিয়েছেন ('Voyages dans l'Amerique merid.' খণ্ড ২, ১৮০৯, পৃঃ ৬০, ১৭৯) যে প্যারাগুয়ের বন্য গুয়ারানিস-দের মধ্যে প্রতি ১৩ জন পুরুষ পিছু ১৪ জন করে নারী থাকে।

বয়সটা সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের একমাত্র কারণ না হলেও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বটেই। আবার কোন্ অবস্থায় নারীর গর্ভাধান হচ্ছে, সেটাকেও সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের অন্যতম কারণ বলে মনে করতেন অনেকে, তবে সাম্প্রতিক নানান গবেষণায় এই মতটি একেবারেই বাতিল হয়ে গেছে। ডঃ স্টকটন-হগের মতে, বছরের ঋতু, পিতামাতার দারিদ্র্য বা সচ্ছলতা, তারা গ্রামের বাসিন্দা নাকি শহরের, বিদেশ থেকে আসা কোনও পুরুষ বা নারীর সঙ্গে সংসর্গ ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারই সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের ব্যাপারে প্রভাব ফেলে। মানুষের ক্ষেত্রে পুরুষদের বহুগামিতাকেও নারী-শিশুর সংখ্যাধিক্যের একটা কারণ বলে মনে করেন অনেকে। কিন্তু শ্যামদেশের হারেমগুলোতে এ ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ চালিয়ে ডঃ জে. ক্যাম্পবেল জানিয়েছেন যে একবিবাহের ক্ষেত্রে নারী আর পুরুষ-সন্তানের অনুপাত যা থাকে, এখানেও ঠিক তা-ই থাকে। ইংল্যান্ডের ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াগুলোর থেকে বেশি বহুগামিতা বোধহয় পৃথিবীর অন্য কোনও প্রাণীর পুরুষদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু এদেরও পুরুষ-সন্তান আর নারী-সন্তানের সংখ্যা প্রায় সমান-সমান থাকে। বিভিন্ন ধরনের প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রী আর পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাত সম্বন্ধে যে-সব তথ্য আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি তা এবার পেশ করব পাঠকদের সামনে, অতঃপর সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব এই অনুপাত নির্ধারণের ব্যাপারে নির্বাচন কতখানি ভূমিকা পালন করেছে তা নিয়ে।

ঘোড়া। আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় হয়ে মিঃ টেগেট্‌মেইয়ার 'রেসিং ক্যালেন্ডার' ঘেঁটে ১৮৪৬ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত একুশ বছরে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াদের জন্মের একটা হিসেব পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে। এর মধ্যে ১৮৪৯ সালটা অবশ্য বাদ আছে, কারণ ওই বছরে ঘোড়াদের জন্মের কোনও হিসেব প্রকাশিত হয়নি। এই একুশ বছরে মোট ২৫৫৬০টি[২১] ঘোড়ার জন্ম হয়েছিল, যার মধ্যে পুরুষ-ঘোড়া ছিল ১২৭৬৩টি আর মাদি-ঘোড়া ১২৭৯৭টি, অর্থাৎ প্রতি ১০০টি মাদি-ঘোড়া পিছু পুরুষ-ঘোড়া জন্মেছিল ৯০.৭টি করে। সংখ্যাগুলো যেহেতু যথেষ্টই বেশি এবং যেহেতু এর মধ্যে বেশ কয়েক বছরে ইংল্যান্ডের সব জায়গার পরিসংখ্যানকেই

২১। যে-সব মাদি-ঘোড়া বন্ধ্যা অথবা নির্ধারিত সময়ের আগেই যাদের গর্ভপাত হয়ে গেছে, তাদের এগারো বছরের একটা হিসেব আমাদের হাতে আছে। এই হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে এইসব সযত্নলালিত ও আন্তঃপ্রজননজাত (interbred) প্রাণীদের প্রজনন-ক্ষমতা ভীষণরকম কমে গেছে, কারণ এইসব মাদি-ঘোড়াদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই জীবিত শাবকের জন্ম দিতে পারেনি। ১৮৬৬ সালে মোট ৮০৯টি পুরুষ-শাবক ও ৮১৬টি স্ত্রী-শাবক জন্ম নিয়েছিল এবং ৭৪৩টি মাদি-ঘোড়া কোনও শাবকের জন্ম দিতে সক্ষম হয়নি। ১৮৬৭ সালে জন্ম নিয়েছিল মোট ৮৩৬টি পুরুষ-শাবক ও ৯০২টি স্ত্রী-শাবক এবং ৭৯৪টি মাদি-ঘোড়া কোনও শাবকের জন্ম দিতে পারেনি।

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেহেতু আমরা জোর দিয়েই বলতে পারি যে গৃহপালিত ঘোড়াদের মধ্যে, বা অন্তত পক্ষে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াদের মধ্যে, স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণী প্রায় সমান সংখ্যাতেই জন্মায়। বিভিন্ন বছরে এই অনুপাতের যে-ওঠানামাটা ঘটে সেটা কোনও ছোট ও কম জনসংখ্যাবিশিষ্ট অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে ছেলে-মেয়ের জন্মহারের ওঠানামার মতোই—১৮৫৬ সালে প্রতি ১০০টি মাদি-ঘোড়া পিছু পুরুষ-ঘোড়া জন্মেছিল মাত্র ৯২৬টি। তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এই অনুপাত চক্রাকারে পরিবর্তিত হয়, কারণ পরপর ছ'বছর মাদি-ঘোড়ার থেকে পুরুষ-ঘোড়া বেশি জন্মেছে, আবার পরপর চার বছর করে মোট দু'বার পুরুষ-ঘোড়ার থেকে মাদি-ঘোড়া বেশি জন্মেছে। তবে এ ব্যাপারটা নিতান্ত কাকতালীয়ও হতে পারে। ১৮৬৬ সালের রেজিস্ট্রার'স রিপোর্টের দশ বছরের সারণি থেকে মানুষের ব্যাপারে এ ধরনের কোনও নজির আমি অন্তত খুঁজে পাইনি।

কুকুর। ১৮৫৭ থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত বারো বছরে সারা ইংল্যান্ডে কত গ্রেহাউন্ড কুকুর জন্মেছিল, তার একটা হিসেব প্রকাশিত হয়েছিল 'ফিল্ড' কাগজে। এই তথ্যগুলোও মিঃ টেগেট্‌মেইয়ারই যথাযথভাবে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে ওই বারো বছরে মোট ৬৮৭৮টি গ্রেহাউন্ড কুকুর জন্মেছিল যার মধ্যে ৩৬০৫টি ছিল পুরুষ-কুকুর আর ৩২৭৩টি মাদি-কুকুর, অর্থাৎ প্রতি ১০০টি স্ত্রী-কুকুর পিছু পুরুষ-কুকুর জন্মেছিল ১১০.১টি করে। এই পরিসংখ্যানের সবথেকে বড় ওঠানামা ঘটেছিল ১৬৮৪ আর ১৮৬৭ সালে। ১৮৬৪ সালে প্রতি ১০০টি মাদি-কুকুর পিছু পুরুষ-কুকুর জন্মেছিল ৯৫.৩টি আর ১৮৬৭ সালে ১১৬.৩টি। ১০০টি মাদি-কুকুর পিছু ১১০.১টি পুরুষ-কুকুর জন্মানোর গড় অনুপাতটা গ্রেহাউন্ডদের ক্ষেত্রে সম্ভবত প্রায় নিশ্চিত, তবে অন্যান্য গৃহপালিত কুকুরদের ক্ষেত্রেও এই অনুপাতটা একই থাকে কিনা তা বলা একটু মুশকিল। বেশ কিছু বিখ্যাত কুকুর-পালকের সঙ্গে কথা বলে মিঃ কাপ্‌ল্‌স্‌ দেখেছেন, সব ধরনের কুকুরদের মধ্যেই মাদি-কুকুর বেশি জন্মায়। তবে তাঁর মতে কুকুর-পালকদের এই ধারণাটা তৈরি হয়েছে সম্ভবত মাদি-কুকুরের দাম কম বলেই—অর্থাৎ দাম কম বলে মাদি-কুকুর জন্মালে কুকুর-পালকরা কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ে আর তার ফলে তাদের মনে মাদি-কুকুরদের সম্বন্ধে একটা বিরূপ ধারণা তৈরি হয়ে যায়।

ভেড়া। জন্মের পর বেশ কয়েক মাস না-কাটা পর্যন্ত (অর্থাৎ যে-সময় পুরুষ-ভেড়াদের খাসি করা হয় তার আগে পর্যন্ত) ভেড়াদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। ঠিক সেই কারণেই নীচের হিসেবগুলো থেকে জন্মের সময় ভেড়াদের স্ত্রী-পুরুষের অনুপাতের কোনও হদিশ পাওয়া যাবে না। তাছাড়া

স্কটল্যান্ডের কয়েকজন বিখ্যাত ভেড়াপালক, যাঁরা বছরে প্রায় হাজারটা করে ভেড়ার জন্ম দেন, তাঁদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে আমি জেনেছি, জন্মের পর প্রথম দু'-এক বছরের মধ্যে স্ত্রী-ভেড়ার তুলনায় অনেক বেশি পুরুষ-ভেড়া মারা যায়। এ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে খাসি করার সময় পুরুষ-ভেড়ার অনুপাত যত থাকে, জন্মের সময় তার থেকে কিছুটা অন্তত বেশিই থাকে। আমরা আগেই দেখেছি যে মানুষদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অনেকটা একই ঘটে থাকে এবং দু'টো ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা সম্ভবত একই কারণেই ঘটে থাকে—সত্যিই এটা একটা আশ্চর্য সমাপতন। ইংল্যান্ডের চারজন ভদ্রলোক যাঁরা নিম্নাঞ্চলের (বিশেষত লিসেস্টার্সের) ভেড়া-পালক হিসেবে সুপরিচিত, তাঁদের কাছে বিগত দশ থেকে ষোলো বছরের একটা হিসেব পেয়েছি আমি। এই হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই সময়ের মধ্যে মোট ৮৯৬৫টি ভেড়ার জন্ম হয়েছে যার মধ্যে ৪৪০৭টি পুরুষ-ভেড়া আর ৪৫৫৮টি স্ত্রী-ভেড়া। অর্থাৎ প্রতি ১০০টি স্ত্রী-ভেড়া পিছু ৯৬.৭টি করে পুরুষ-ভেড়ার জন্ম হয়েছে। স্কটল্যান্ডের শেভিয়ট এবং কালো-মুখ ভেড়াদের ব্যাপারে ছ'জন ভেড়া-পালকের কাছ থেকে, বিশেষত দু'জনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি আমি। এই হিসেব মূলত ১৮৬৭-১৮৬৯ সালের সময়কার, তবে এমনকী সেই ১৮৬২ সালের কিছু তথ্যও এর মধ্যে আছে। এই হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে মোট ৫০৬৮৫টি ভেড়ার জন্ম হয়েছে যার মধ্যে ২৫০৭১টি পুরুষ-ভেড়া আর ২৫৬১৪টি স্ত্রী-ভেড়া—অর্থাৎ প্রতি ১০০টি স্ত্রী-ভেড়া পিছু ৯৭.৯টি করে পুরুষ-ভেড়া। ইংল্যান্ড আর স্কটল্যান্ডের হিসেবকে একত্র করে দেখলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোট ৫৯৬৫০টি ভেড়ার জন্ম হয়েছে যার মধ্যে ২৯৪৭৮টি পুরুষ-ভেড়া আর ৩০১৭২টি স্ত্রী-ভেড়া—অর্থাৎ প্রতি ১০০টি স্ত্রী-ভেড়া পিছু ৯৭.৭টি করে পুরুষ-ভেড়া। অর্থাৎ পুরুষদের যখন খাসি করা হয়, সেই বয়সে স্ত্রী-ভেড়ার সংখ্যা পুরুষ-ভেড়াদের চেয়ে বেশি থাকে, তবে জন্মের সময়েও তা-ই থাকে কিনা বলা মুশকিল।[২২]

গবাদি পশু। গবাদি পশুদের ব্যাপারে ন'জন ভদ্রলোকের কাছ থেকে যে-হিসেব আমি পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে মোট গবাদি পশু জন্মেছে ৯৮২টি। সংখ্যাটা এতই কম যে বিশ্বাস করা শক্ত। এর মধ্যে ৪৭৭টি এঁড়ে-বাছুর আর ৫০৫টি বক্‌না-বাছুর, অর্থাৎ প্রতি ১০০টি বক্‌না-বাছুর পিছু ৯৪.৪টি করে এঁড়ে-বাছুর। রেভারেন্ড ডব্লিউ.

২২। স্কটল্যান্ড থেকে এইসব পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য এবং গবাদি পশুদের ব্যাপারেও কিছু তথ্য সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য মিঃ কাপ্‌ল্‌স্‌-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পুরুষ-ভেড়াদের অকালমৃত্যুর দিকে প্রথম আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করেন লেইউডের মিঃ আর. এলিয়ট, পরে এই তথ্যটিকে সমর্থন করেন মিঃ এইচিসন ও অন্যান্যরা। ভেড়াদের ব্যাপারে বহু তথ্য জোগানোর জন্য মিঃ এইচিসন ও মিঃ পায়ান-এর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

ডি. ফক্স আমাকে জানিয়েছেন যে ১৮৬৭ সালে ডার্বিশায়ারের একটা গোয়ালে জন্মানো ৩৪টি গো-শাবকের মধ্যে এঁড়ে-বাছুর ছিল মাত্র একটি। বেশ কিছু শূকর-পালকের সঙ্গে কথা বলে মিঃ হ্যারিসন ভাইর আমাকে যে-তথ্য দিয়েছেন, তা থেকে দেখা যাচ্ছে প্রতি ৬টি স্ত্রী-শূকর কিছু পুরুষ-শূকর জন্মায় ৭টি করে। এই মিঃ ভাইর অনেক বছর ধরে খরগোশ পালন করে আসছেন। নিজের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন স্ত্রী-খরগোশের থেকে পুরুষ-খরগোশ অনেক বেশি জন্মায়। তবে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য তিনি দেননি।

অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী। প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকা অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ব্যাপারে আমি বিশেষ কোনও তথ্য জোগাড় করে উঠতে পারিনি। সাধারণ ইঁদুরদের ব্যাপারে কিছু পরস্পরবিরোধী তথ্য আমার হাতে এসেছে। লেইউডের মিঃ আর. এলিয়ট আমাকে একটি তথ্য জানিয়েছেন। জনৈক ইঁদুর-ধরিয়ের কাছ থেকে তিনি জেনেছেন যে সে সবসময়ই ইঁদুরদের মধ্যে পুরুষ-ইঁদুরদেরই সংখ্যাধিক্য দেখেছে, এমনকী গর্তে থাকা ইঁদুরছানাদের মধ্যেও। এর পর মিঃ এলিয়ট নিজে শ'খানেক পূর্ণবয়স্ক ইঁদুরকে পরীক্ষা করেও এই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। মিঃ এফ. বাক্‌ল্যান্ড বেশ কিছু সাদা ইঁদুর পুষেছিলেন। তাঁর মতে এদের ক্ষেত্রে পুরুষ-ইঁদুরদের সংখ্যা স্ত্রী-ইঁদুরদের থেকে অনেক বেশি হয়ে থাকে। ছুঁচোদের সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে 'পুরুষ-ছুঁচোদের সংখ্যা স্ত্রী-ছুঁচোদের থেকে অনেক বেশি হয়।' এইসব প্রাণীদের ফাঁদে ফেলে ধরাটা যেহেতু একটা বিশেষ বৃত্তি, সেহেতু এই বৃত্তিতে নিযুক্ত লোকেদের বক্তব্যটা সত্যি বলেই ধরে নেওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার এক ধরনের কৃষ্ণসার মৃগ (Kobus ellipsiprymnus) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্যর এ. স্মিথ মন্তব্য করেছিলেন যে এই প্রজাতির মধ্যে এবং অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে এক-একটা দলে স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যা কম হয়ে থাকে। ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা জন্মের সময় থেকেই এদের মধ্যে স্ত্রী-প্রাণীর সংখ্যা বেশি থাকে, আবার অনেকের মতে অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদের দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় বলেই স্ত্রী-প্রাণীদের সংখ্যাটা বেশি বলে মনে হয়। স্যর এ. স্মিথ বলেছেন যে শুধুমাত্র অল্পবয়সী কৃষ্ণসার মৃগদের কোনও দল তিনি নিজে দেখেননি বটে, তবে অন্যদের কাছে এ ধরনের দলের অস্তিত্বের কথা শুনেছেন। অল্পবয়সী মৃগরা নিজেদের দল থেকে বিতাড়িত হলে খুব সহজেই বনের হিংস্র জীবজন্তুদের শিকারে পরিণত হতে পারে।

পাখি

পাখিদের মধ্যে মুরগিদের ব্যাপারে মাত্র একটা তথ্যই জোগাড় করতে পেরেছি আমি। মিঃ স্ট্রেচের উচ্চ হারে জন্মদানে সক্ষম কোচিন মুরগিরা আট বছরে মোট ১০০১টি ছানার জন্ম দিয়েছিল, যার মধ্যে ৪৮৭টি ছিল মোরগ আর ৫১৪টি মুরগি, অর্থাৎ প্রতি ১০০টি মুরগি পিছু ৯৪.৭টি করে মোরগ জন্মেছিল। গৃহপালিত পায়রাদের মধ্যে পুরুষ-পায়রাই যে সংখ্যায় বেশি জন্মায় অথবা বেশিদিন বাঁচে, সে ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই পাখিরা অবধারিতভাবেই জোড় বাঁধে, এবং মিঃ টেগেট্‌মেইয়ার জানিয়েছেন, স্ত্রী-পায়রার থেকে পুরুষ-পায়রার দাম সর্বদাই কম হয়। একই বাসায় দু'টো ডিম ফুটে দু'টো ছানা বেরোলে সাধারণত তাদের মধ্যে একটা পুরুষ আর একটা স্ত্রী হয়। কিন্তু মিঃ হ্যারিসন ভাইর-এর মতো একজন অভিজ্ঞ মুরগি-পালক আমাকে জানিয়েছেন যে একই বাসার দু'টো ডিম থেকে তিনি প্রায়শই দু'টো মোরগকে জন্মাতে দেখেছেন, কিন্তু দু'টো মুরগিকে জন্মাতে দেখেছেন খুবই কম। তাছাড়া মোরগ আর মুরগির মধ্যে মুরগিরাই একটু কমজোরি হয়, ফলে মোরগদের তুলনায় এদের মারা যাওয়ার সম্ভাবনাও একটু বেশিই থাকে।

প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকা পাখিদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মিঃ গোল্ড ও অন্যান্যরা বলেছেন—এদের মধ্যে পুরুষ-পাখিরাই সংখ্যায় অনেক বেশি থাকে। আর অনেক প্রজাতির অল্পবয়সী পুরুষ-পাখিদের দেখতে ঠিক স্ত্রী-পাখিদের মতো হয় বলে বাইরে থেকে মনে হয় স্ত্রী-পাখিরাই বোধহয় সংখ্যায় বেশি। বন্য ফেজ্যান্ট পাখিদের পেড়ে যাওয়া ডিম ফুটিয়ে প্রচুর ফেজ্যান্ট পাখির জন্ম দিয়েছেন লিডেনহল-এর মিঃ বেকার। মিঃ জেনার ভাইর-কে তিনি জানিয়েছেন যে এদের মধ্যে সাধারণত একটি স্ত্রী-পাখি পিছু চার-পাঁচটি করে পুরুষ-পাখি জন্মায়। জনৈক অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক জানিয়েছেন—স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ক্যাপারকেল্‌জি ও ব্ল্যাক-কক্‌দের মধ্যে স্ত্রী-পাখির থেকে পুরুষ-পাখির সংখ্যা বেশি হয় এবং দাল-রিপাদের (এক ধরনের টারমিগান পাখি) মধ্যে স্ত্রী-পাখিদের তুলনায় পুরুষ-পাখিরা সঙ্গমের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলে অনেক বেশি সংখ্যায় হাজির থাকে। তবে এই শেষোক্ত ঘটনাটার সম্বন্ধে কয়েকজন বলেছেন যে কীটমূষিকের আক্রমণে প্রচুর সংখ্যক স্ত্রী-পাখি মারা যায় বলেই এদের মধ্যে পুরুষ-পাখির সংখ্যাধিক্য ঘটে। সেলবোর্নের হোয়াইট কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যসমূহ থেকে দেখা যাচ্ছে ইংল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলের তিতির পাখিদের মধ্যে পুরুষ-পাখিরা সংখ্যায় অনেক বেশি। স্কটল্যান্ডের তিতির পাখিদের মধ্যেও এই একই ব্যাপার লক্ষ করা যায়। যে-সব ব্যবসায়ীদের কাছে বিশেষ বিশেষ মরশুমে প্রচুর রাফ (Machetes pugnax) পাখি চালান আসে, তাদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে মিঃ ভাইর জেনেছেন যে এদের মধ্যেও পুরুষ-পাখিরা সংখ্যায় অনেক বেশি

থাকে। এই প্রাণিবিজ্ঞানী মিঃ ভাইর আমার হয়ে কিছু পাখি-ধরিয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। লন্ডনের বাজারে বিক্রি করার জন্য এই পাখি-ধরিয়েরা প্রতি বছর নানারকম ছোট ছোট প্রজাতির পাখি প্রচুর সংখ্যায় ধরে থাকে। এদের মধ্যে জনৈক বৃদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য পাখি-ধরিয়ে মিঃ ভাইর-এর প্রশ্নের উত্তরে নির্দ্বিধায় জানিয়েছিল যে চ্যাফিঞ্চ পাখিদের মধ্যে পুরুষ-পাখিরা সংখ্যায় অনেক বেশি থাকে—প্রতি ১টি স্ত্রী-পাখি পিছু ২টি করে পুরুষ-পাখি, কিংবা ৩টি স্ত্রী-পাখি পিছু অন্তত ৫টি করে পুরুষ-পাখি থাকেই।[২৩] সে আরও জানিয়েছিল যে ব্ল্যাকবার্ড বা শ্যামাপাখিদের মধ্যে পুরুষ-পাখিরা সংখ্যায় আরও বেশি হয়—তা সে ফাঁদ পেতে ধরা পাখিদের মধ্যেই হোক বা রাত্রে জালে ধরা পাখিদের মধ্যেই হোক। কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়, কারণ এই পাখি-ধরিয়েটি একইসঙ্গে এ কথাও জানিয়েছিল যে ভরতপাখি, ট্যুইটপাখি (Linaria montana) আর গোল্ডফিঞ্চদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান থাকে। এর পাশাপাশি সে এ-ও জানিয়েছিল যে সাধারণ লিনিট পাখিদের মধ্যে স্ত্রী-পাখিরা সংখ্যায় অনেক বেশি থাকে, তবে বিভিন্ন বছরে তাদের এই সংখ্যাধিক্যের হেরফের ঘটতে দেখা যায়—কোনও-কোনও বছরে ১টি পুরুষ-পাখি পিছু ৪টি করে স্ত্রী-পাখিও দেখা গেছে। তবে মনে রাখা দরকার পাখি ধরার আসল মরশুমটা সেপ্টেম্বর মাসের আগে শুরু হয় না। তার আগেই হয়তো কোনও-কোনও প্রজাতির পাখিদের দেশান্তর যাত্রাটা আংশিকভাবে শুরু হয়ে যায়, ফলে এই সময়ে অনেক দলে শুধু স্ত্রী-পাখিদেরই নজরে পড়ে। মধ্য আমেরিকার হামিং বার্ডদের বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন মিঃ স্যালভিন। তাঁর মতে এদের অধিকাংশ প্রজাতির মধ্যেই পুরুষদের সংখ্যাধিক্য থাকে। এক বছর তিনি এদের দশটি প্রজাতির মোট ২০৪টি পাখি সংগ্রহ করেছিলেন যার মধ্যে ১৬৬টি ছিল পুরুষ-পাখি আর ৩৮টি ছিল স্ত্রী-পাখি। এদের অন্য দু'টো প্রজাতির মধ্যে স্ত্রী-পাখিদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ করেছিলেন মিঃ স্যালভিন, তবে এইসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন মরশুমে বা বিভিন্ন অঞ্চলভেদে সংখ্যার অনুপাতটা পাল্টে যায়। যেমন একবার ক্যাম্পাই লোপ্‌টেরাস হেমিলিউকুরাস প্রজাতির মধ্যে প্রতি ২টি স্ত্রী-পাখি পিছু ৫টি করে পুরুষ-পাখি দেখেছিলেন তিনি, আবার অন্য এক জায়গায় দেখেছিলেন প্রতি ২টি পুরুষ-পাখি পিছু ৫টি করে স্ত্রী-পাখি। এই শেষ ব্যাপারটার সম্বন্ধে অন্য একটা

২৩। এর পরের বছর অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে এই একই তথ্য জানতে পেরেছিলেন মিঃ জেনার ভাইর। জীবন্ত অবস্থায় ধরা চ্যাফিঞ্চ পাখিদের ব্যাপারে একটা তথ্য এখানে উল্লেখ করা যায়। ১৮৬৯ সালে দু'জন ওস্তাদ পাখি-ধরিয়ের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতায় প্রথমজন একদিনে ধরেছিল ৬২টা পুরুষ-চ্যাফিঞ্চ, দ্বিতীয়জন ধরেছিল ৪০টা পুরুষ-চ্যাফিঞ্চ। আজ পর্যন্ত একদিনে সবথেকে বেশি সংখ্যক পুরুষ-চ্যাফিঞ্চ ধরেছিল অন্য একজন পাখি-ধরিয়ে—৭০টা।

তথ্যও এখানে জানিয়ে রাখা যায়। কোরফু এবং এপিরাসে চ্যাফিঞ্চদের স্ত্রী ও পুরুষদের আলাদা করে মিঃ পাওইস দেখেছিলেন, 'এদের মধ্যে স্ত্রী-পাখির সংখ্যা অতিরিক্তরকম বেশি।' আবার প্যালেস্তাইনে মিঃ ত্রিস্ত্রাম দেখেছিলেন, 'স্ত্রী-পাখির তুলনায় পুরুষ-পাখির সংখ্যা অনেক বেশি।' কুইস্ক্যালাস মেজর-দের সম্বন্ধে মিঃ জে. টেলর বলেছেন যে ফ্লোরিডায় 'পুরুষ-পাখির তুলনায় স্ত্রী-পাখির সংখ্যা নিতান্তই কম।' আবার হন্ডুরাসে এই পাখিদের মধ্যেই স্ত্রী-পাখিদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায় এবং সেখানে পুরুষ-পাখিরা সাধারণত বহুগামী হয়ে থাকে।

মাছ

মাছেদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যা নির্ধারণের একটাই উপায় আছে—প্রাপ্তবয়স্ক অথবা প্রায়-প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় তাদের ধরে এনে পরীক্ষা করে দেখা। এমনকী সেক্ষেত্রেও কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো খুব সহজ কাজ নয়।[২৪] প্রজননশক্তিহীন স্ত্রী-মাছেদের পুরুষ-মাছ বলে ভুল করা একান্তই স্বাভাবিক—ট্রাউট মাছেদের ব্যাপারে ঠিক এই কথাটাই আমাকে জানিয়েছেন ডঃ গুন্থার। অনেকে বলেন কোনও-কোনও প্রজাতির পুরুষ-মাছেরা নাকি স্ত্রী-মাছেদের গর্ভবতী করার পরই মারা যায়। আবার অনেক প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী-মাছেদের থেকে পুরুষ-মাছেরা আকারে অনেক ছোট হয়, ফলে যে-জালে স্ত্রী-মাছেরা ধরা পড়ে সেই জাল থেকে সহজেই পালিয়ে যায় তারা। মঁসিয়ে কার্বোনিয়ের, যিনি বানমাছেদের (Esox lucius) ইতিহাস নিয়ে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তিনি জানিয়েছেন যে এদের পুরুষ-মাছেরা আকারে ছোট হয় বলে বড় আকারের স্ত্রী-মাছেরা প্রায়শই তাদের খেয়ে ফেলে। তাঁর মতে, বেশির ভাগ প্রজাতির ক্ষেত্রেই পুরুষ-মাছেরা আকারে ছোট হয় বলে স্ত্রী-মাছেদের তুলনায় তাদের অনেক বেশি বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অল্প যে-কয়েকটি ক্ষেত্রে মাছেদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যার হিসেব পাওয়া গেছে, সেইসব ক্ষেত্রে দেখা গেছে স্ত্রী-মাছেদের তুলনায় পুরুষ-মাছের সংখ্যা অনেক বেশি। স্টরমন্টফিল্ডে অনুসন্ধান-কার্যের সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ আর. বুইস্ট বলেছেন—১৮৬৫ সালে ডিম্বাণু অর্জনের জন্য প্রথম ডাঙায় আসা ৭০টি স্যামন মাছের মধ্যে ৬০টিরও বেশ ছিল পুরুষ-স্যামন। ১৮৬৭ সালে তিনি আবার 'স্ত্রী-মাছেদের তুলনায় পুরুষ-মাছেদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের দিকে সবার দৃষ্টি-আকর্ষণ করেন। শুরুতেই দেখা যায় প্রতি একটি স্ত্রী-মাছ পিছু

২৪। লিউকার্ট এ ব্যাপারে ব্রুখ-কে উদ্ধৃত করে (ভাগনার, "Handworterbuch der Phys.", খণ্ড ৪, পৃঃ ৭৭৫) বলেছেন যে মাছেদের মধ্যে স্ত্রী-মাছেদের তুলনায় দ্বিগুণ পুরুষ-মাছ থাকে।

অন্তত দশটি করে পুরুষ-মাছ আছে।' পরবর্তীকালে ডিম্বাণু অর্জনের জন্য আগত যথেষ্ট সংখ্যক স্ত্রী-মাছেদের দেখা পাওয়া যায়। মিঃ বুইস্ট বলেছেন, 'পুরুষ-মাছেদের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ার ফলে প্রজননের গোটা এলাকাটা জুড়ে সারাক্ষণই তারা নিজেদের মধ্যে মারদাঙ্গায় ব্যস্ত থাকে।' পুরুষ-মাছেদের এই সংখ্যাধিক্যের একটা কারণ হল এই যে স্ত্রী-মাছেদের থেকে অনেক আগেই তারা নদীতে ঢুকে পড়ে, ফলে তাদেরকেই বেশি করে দেখা যায়—তবে এটাই এই সংখ্যাধিক্যের একমাত্র কারণ কিনা, বলা মুশকিল। ট্রাউট মাছেদের ব্যাপারে মিঃ এফ বাক্‌ল্যান্ড বলেছেন, 'লক্ষণীয় ব্যাপার হল, এদের মধ্যে স্ত্রী-মাছেদের তুলনায় পুরুষ-মাছের সংখ্যা অনেক বেশি হয়। জালে করে যখন ট্রাউট মাছেদের ধরা হয়, তখন অবধারিতভাবেই স্ত্রী-মাছেদের তুলনায় অন্তত সাত-আট গুণ বেশি পুরুষ-মাছ ধরা পড়ে। এর কারণ ঠিক কী, আমার জানা নেই। হয়তো স্ত্রী-মাছেদের তুলনায় পুরুষ-মাছেরা সত্যিই সংখ্যায় অনেক বেশি থাকে, কিংবা হয়তো স্ত্রী-মাছেরা পালানোর চেষ্টা না করে কোথাও লুকিয়ে পড়ে বলেই বেশি সংখ্যায় ধরা পড়ে না।' এরপর তিনি বলেছেন যে নদীর পাড়ে ভালভাবে অনুসন্ধান চালালে ডিম্বাণু অর্জনের জন্য আগত যথেষ্ট সংখ্যক স্ত্রী-মাছের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। মিঃ এইচ. লী আমাকে জানিয়েছেন যে লর্ড পোর্টসমাউথ'স পার্ক থেকে এই উদ্দেশ্যের জন্য সংগৃহীত ২১২টি ট্রাউট মাছের মধ্যে ১৫০টি ছিল পুরুষ-মাছ আর ৬২টি ছিল স্ত্রী-মাছ।

সাইপ্রিনিডি (Cyprinidae) মাছেদের মধ্যেও পুরুষ-মাছেদের সংখ্যাধিক্য চোখে পড়ে। তবে এই বর্গের কিছু কিছু মাছ, যেমন ক্র্যাপ, টেন্‌শ্‌, ব্রিম ও মিনেট, এদের স্ত্রী-মাছেরা সর্বদাই বহুগামী হয়ে থাকে, যা সমগ্র প্রাণিজগতেই এক বিরল ঘটনা। সঙ্গমের মরশুমে প্রতিটি স্ত্রী-মাছের সঙ্গে দু'টি করে পুরুষ-মাছ থাকে, একজন এপাশে একজন ওপাশে, আর ব্রিম মাছেদের ক্ষেত্রে তো প্রতিটি স্ত্রী-মাছের সঙ্গে অন্তত তিন-চারটি করে পুরুষ-মাছ থাকে। এই ঘটনাটা রীতিমতো বহুলপ্রচারিত বলেই যে-কোনও পুকুরে একটি স্ত্রী-টেন্‌শ্‌-এর জন্য দু'টি করে পুরুষ-টেন্‌শ্‌, নিদেনপক্ষে দু'টি স্ত্রী-টেন্‌শ্‌-এর জন্য তিনটি করে পুরুষ-টেন্‌শ্‌ ছাড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। জনৈক বিশিষ্ট পর্যবেক্ষক জানিয়েছেন যে প্রজনন-ক্ষেত্রে যতগুলি স্ত্রী-মিনেট থাকে তার চেয়ে অন্তত দশ গুণ পুরুষ-মিনেট ঘুরে বেড়ায় সেখানে। কোনও স্ত্রী-মিনেট যখন পুরুষ-মিনিটদের মধ্যে আসে, 'তখন দু'দিক থেকে দু'টো পুরুষ-মাছ চেপে ধরে তাকে। ওইভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর ওই দু'টো পুরুষ-মাছকে সরিয়ে দিয়ে তাদের জায়গাটা দখল করে নেয় অন্য দু'টো পুরুষ-মাছ।'

কীটপতঙ্গ

এই বিরাট শ্রেণীটার মধ্যে একমাত্র লেপিডোপ্‌টেরা বর্গের প্রাণীদেরই স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাত নির্ণয়ের উপায় আমাদের হাতে আছে, কারণ বেশ কিছু উৎকৃষ্ট পর্যবেক্ষক বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে এদের সংগ্রহ করেছেন এবং ডিম বা শুঁয়োপোকা অবস্থা থেকে তাদের পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নিয়ে এসেছেন। আমি আশা করেছিলাম রেশমপোকা-উৎপাদকেরা নিশ্চয়ই রেশমপোকাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাতের ব্যাপারে কিছু নথিপত্র সংরক্ষণ করেন, কিন্তু ফ্রান্স ও ইতালিতে খোঁজখবর নিয়ে এবং বিভিন্ন লেখাপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে এ-রকম কোনও তথ্য আমি খুঁজে পাইনি। লোকে বলে এদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা নাকি প্রায় সমান-সমান হয়, কিন্তু অধ্যাপক কানেস্‌ত্রিনি আমাকে জানিয়েছেন যে ইতালির বহু রেশমপোকা-উৎপাদক মনে করে এদের মধ্যে স্ত্রী-পোকাদেরই সংখ্যাধিক্য থাকে। আবার এই অধ্যাপক কানেস্‌ত্রিনিই আমাকে জানিয়েছেন যে আইল্যান্‌থাস রেশমপোকাদের (Bombyx cynthia) দু'-বছরের জন্মের হিসেবে দেখা গিয়েছিল প্রথম বছরে পুরুষ-পোকরা অনেক বেশি সংখ্যায় জন্মেছে এবং দ্বিতীয় বছরে স্ত্রী-পুরুষ প্রায় সমান সংখ্যায় জন্মেছে অথবা স্ত্রী-পোকাদেরই কিছুটা সংখ্যাধিক্য থেকেছে।

প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকা প্রজাপতিদের মধ্যে পুরুষ-প্রজাপতিদের বিপুল সংখ্যাধিক্য লক্ষ করেছেন বেশ কিছু পর্যবেক্ষক।[২৫] উচ্চ আমাজন অঞ্চলের শ'খানেক প্রজাতির প্রজাপতিদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মিঃ বেট্‌স্‌ বলেছেন, এদের মধ্যে স্ত্রী-প্রাণীর তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যা অনেক বেশি, এমনকী কোথাও-কোথাও একটি স্ত্রী-প্রজাপতি পিছু একশোটি করে পুরুষ-প্রজাপতিও দেখা যায়। সুগভীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এডওয়ার্ডস উত্তর আমেরিকার প্যাপিলিও বর্গের প্রজাপতিদের সম্বন্ধে বলেছেন—এদের মধ্যে প্রতি একটি স্ত্রী-প্রাণী পিছু চারটি করে পুরুষ-প্রাণী থাকে। এডওয়ার্ডসের এই মন্তব্যটির কথা আমাকে জানিয়েছেন মিঃ ওয়াল্‌শ্‌। সেইসঙ্গেই মিঃ ওয়াল্‌শ্‌ জানিয়েছেন যে পি. টার্নাস বর্গের প্রজাপতিদের মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত একটি স্ত্রী-প্রাণী পিছু চারটি করে পুরুষ-প্রাণী। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯টি প্রজাতির মধ্যে পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ করেছেন আর. ট্রিমেন। এদের একটা প্রজাতি, যারা খোলা জায়গায় ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ায়, তাদের মধ্যে প্রতি একটি স্ত্রী-প্রজাপতি-পিছু

২৫। লিউকার্ট এ প্রসঙ্গে মেইনেকি-কে উদ্ধৃত করে (ভাগ্‌নার, 'Handworterbuch der Phys.', খণ্ড ৪, পৃঃ ৭৭৫) বলেছেন যে প্রজাপতিদের মধ্যে স্ত্রী-প্রজাপতিদের তুলনায় পুরুষ-প্রজাপতিদের সংখ্যা তিন-চার গুণ বেশি হয়।

পঞ্চাশটি করে পুরুষ-প্রজাতির উপস্থিতি চোখে পড়েছিল তাঁর। অন্য আর-একটি প্রজাতি, যাদের মধ্যে কয়েকটা অঞ্চলে পুরুষদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়, তাদের ক্ষেত্রে সাত বছরে মাত্র পাঁচটি স্ত্রী-প্রজাপতি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তিনি। বুর্বোঁ দ্বীপে প্যাপিলিওদের একটা প্রজাতির মধ্যে স্ত্রী-প্রজাপতিদের তুলনায় কুড়ি গুণ বেশি পুরুষ-প্রজাপতির উপস্থিতি লক্ষ করেছিলেন মঁসিয়ে ম্যালিয়ার্ড। নিজের দেখা এবং অন্যদের কাছ থেকে শোনা তথ্যের ভিত্তিতে মিঃ ট্রিমেন আমাকে জানিয়েছেন যে প্রজাপতিদের প্রায় কোনও প্রজাতির মধ্যেই পুরুষ-প্রাণীদের থেকে স্ত্রী-প্রাণীদের সংখ্যা বেশি হয় না, তবে দক্ষিণ আফ্রিকার তিনটি প্রজাতির ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। মালয় দ্বীপপুঞ্জের অর্নিথোপ্‌টেরা ক্রিসাস প্রজাতির প্রজাপতিদের ব্যাপারে মিঃ ওয়ালেস বলেছেন যে এদের মধ্যে স্ত্রী-প্রাণীরাই সংখ্যায় বেশি এবং এদের ধরাও বেশি সহজ—তবে এটা একটা বিরল প্রজাতির প্রজাপতি। আর-একটা তথ্যের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। মথেদের একটা বর্গ হাইপেরিথ্রা-দের ব্যাপারে গেনী বলেছেন—ভারতে এদের প্রতি একটি পুরুষ-প্রজাপতি পিছু চার-পাঁচটি করে স্ত্রী-প্রজাপতি দেখা যায়।

কীটপতঙ্গদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাতের এই প্রসঙ্গটা যখন এন্টোমোলজিক্যাল সোসাইটিতে উত্থাপিত হয়, তখন তাঁরা সাধারণভাবে মেনে নিয়েছিলেন যে লেপিডোপ্‌টেরা বর্গের অধিকাংশ প্রজাতির ক্ষেত্রেই স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের (পূর্ণবয়স্ক বা সমঙ্গ অবস্থায়) অনেক বেশি সংখ্যায় ধরা যায়। তবে অনেক পর্যবেক্ষকই বলেছিলেন যে স্ত্রী-প্রাণীদের অলস স্বভাব এবং গুটি কেটে পুরুষ-প্রাণীদের আগে বেরিয়ে আসাটাই এর প্রধান কারণ। লেপিডোপ্‌টেরা বর্গের বেশির ভাগ প্রজাতির ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গদের ক্ষেত্রেও এই শেষোক্ত ব্যাপারটা চোখে পড়ে—গুটি কেটে পুরুষরাই আগে বেরিয়ে আসে। মঁসিয়ে পার্সোন্যা বলেছেন—এই ব্যাপারটার ফলেই গৃহপালিত বম্বিক্স ইয়ামামাই প্রজাতির ক্ষেত্রে মরশুমের গোড়ার দিকে পুরুষ-প্রাণীরা সঙ্গিনীর অভাবে বসে থাকে অকর্মণ্য অবস্থায় এবং মরসুমের শেষের দিকে স্ত্রী-প্রাণীরা সঙ্গীর অভাবে বসে থাকে অকর্মণ্য অবস্থায়। তবে কয়েকটি অঞ্চলের নিজস্ব কিছু প্রজাপতিদের যে-দৃষ্টান্তগুলো ওপরে উল্লিখিত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে পুরুষদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের পিছনে এটাই একমাত্র কারণ হিসেবে কাজ করে বলে মেনে নিতে আমার কিছুটা আপত্তি আছে। মিঃ স্টেইনটন, যিনি বহু বছর ধরে ক্ষুদ্রাকৃতি মথেদের পর্যবেক্ষণ করে আসছেন, তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে সমঙ্গ (imago) অবস্থায় এদের সংগ্রহ করার সময় তাঁর ধারণা ছিল স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায়

পুরুষ-প্রাণীর সংখ্যা অন্তত দশগুণ বেশি হবে, কিন্তু শুঁয়োপোকা অবস্থা থেকে প্রচুর সংখ্যক মথকে ফুটিয়ে তোলার পর তিনি নিশ্চিত হন যে স্ত্রী-প্রাণীরাই সংখ্যায় বেশি। বেশ কিছু পতঙ্গবিদ এই মতকে সমর্থন করেছেন। তবে মিঃ ডাব্‌ল্‌ডে এবং অন্য কয়েকজন আবার উল্টো কথা বলেছেন। তাঁদের বক্তব্য হল—ডিম থেকে এবং শুঁয়োপোকা থেকে যত মথকে তাঁরা ফুটিয়ে তুলেছেন, তাদের মধ্যে স্ত্রী-প্রাণীর থেকে পুরুষ-প্রাণীরাই সংখ্যায় বেশি।

পুরুষ-প্রাণীরা অধিকতর সক্রিয় স্বভাবের হয়, গুটি কেটে তারা আগেই বেরিয়ে আসে, কোনও-কোনও ক্ষেত্রে বেশি খোলামেলা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় তারা—এগুলো নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ। তবে সমঙ্গ অবস্থায় ধরা এবং ডিম বা শুঁয়োপোকা অবস্থা থেকে বড় করে তোলা লেপিডোপ্‌টেরা বর্গের পতঙ্গদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যার আপাত বা প্রকৃত পার্থক্যের আরও কিছু কারণও আছে। অধ্যাপক কানেস্‌ত্রিনি আমাকে জানিয়েছেন—ইতালির অনেক রেশমচাষি মনে করে রেশমপোকাদের মধ্যে পুরুষ-শুঁয়োপোকাদের তুলনায় স্ত্রী-শুঁয়োপোকারা রোগে আক্রান্ত হয় অনেক বেশি সংখ্যায়। ডঃ স্টডিংগার জানিয়েছেন—লেপিডোপ্‌টেরাদের ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রাণীদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক স্ত্রী-প্রাণী গুটির মধ্যে মারা যায়। অনেক প্রজাতির মধ্যে পুরুষ-শুঁয়োপোকাদের চেয়ে স্ত্রী-শুঁয়োপোকারা আকারে বড় হয় এবং শুঁয়োপোকা-সংগ্রাহকরা সবথেকে সুন্দর নমুনাগুলোই সংগ্রহ করতে আগ্রহী হওয়ার দরুন স্ত্রী-প্রাণীদেরই বেশি সংখ্যায় সংগ্রহ করে নিয়ে যান তাঁরা। তিনজন সংগ্রাহক আমাকে এই কথা জানিয়েছেন। আবার ডঃ ওয়ালেস নিশ্চিতভাবে মনে করেন যে বিরল প্রজাতির শুঁয়োপোকারাই সংগ্রহের যোগ্য এবং বিরল প্রজাতির যে-কোনও শুঁয়োপোকাই সংগ্রহ করেন বেশির ভাগ সংগ্রাহকরা—এ ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের কোনও বাছবিচার তাঁরা করেন না। মুখের কাছে শুঁয়োপোকাদের দঙ্গল দেখলে পাখিরা সম্ভবত সবথেকে বড় শুঁয়োপোকাগুলোকেই খাওয়ার কাজে মন দেয়। অধ্যাপক কানেস্‌ত্রিনি আমাকে জানিয়েছেন—ইতালির কিছু কিছু রেশমচাষি মনে করে এইল্যান্‌থাস রেশমপোকাদের প্রথম শুঁয়োপোকাগুলোর মধ্যে পুরুষ-শুঁয়োপোকাদের তুলনায় স্ত্রী-শুঁয়োপোকাদেরই অধিক সংখ্যায় নষ্ট করে বোলতার দল (এই তথ্যের স্বপক্ষে খুব বেশি প্রমাণ অবশ্য তাদের হাতে নেই)। ডঃ ওয়ালেস আরও বলেছেন যে পুরুষ-শুঁয়োপোকাদের তুলনায় স্ত্রী-শুঁয়োপোকারা আকারে বড় হয় বলে তাদের বিকশিত হয়ে ওঠার জন্য বেশি সময় লাগে এবং বেশি খাদ্য ও বেশি আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়, ফলে বেজি বা পাখিদের কাছ থেকে বিপদের সম্ভাবনাও তাদের বেশিদিন ধরে থাকে এবং খাদ্যের অভাব দেখা দিলে তারাই বেশি সংখ্যায় মারা পড়ে। এ থেকে মনে হয়

যে প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকার সময় লেপিডোপ্টেরা বর্গের মধ্যে পুরুষ-প্রাণীদের তুলনায় কম সংখ্যক স্ত্রী-প্রাণী পূর্ণবয়স্ক হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর পক্ষে প্রয়োজনীয় হল এই পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় তাদের স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যাটাই, কারণ একমাত্র পূর্ণবয়স্ক অবস্থাতেই তারা বংশবিস্তারের ক্ষমতাটা অর্জন করে থাকে।

কয়েক জাতের পুরুষ-মথেরা যেভাবে বহুজনে মিলে একটিমাত্র স্ত্রী-মথের চারপাশে জড়ো হয়, তা থেকে মনে হয় এদের মধ্যে স্ত্রীদের থেকে পুরুষদের সংখ্যা অনেক বেশি—অবশ্য গুটি থেকে স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের আগে বেরিয়ে আসাটাও এর কারণ হতে পারে। মিঃ স্টেইনটন আমাকে জানিয়েছেন—এলাচিস্টা রুফোসিনেরিয়া-দের একটি স্ত্রী-প্রাণীর চারপাশে প্রায়শই কুড়ি-পঁচিশটি পুরুষ-প্রাণীকে জড়ো হতে দেখা যায়। এটা সুবিদিত যে কোনও খাঁচার মধ্যে ল্যাসিওক্যাম্পা কোয়েরকাস বা স্যাটারনিয়া কার্পিনি প্রজাতির একটি স্ত্রী-প্রাণীকে রাখা হলে খাঁচাটির চারপাশে প্রচুর সংখ্যক পুরুষ-প্রাণী জড়ো হয়ে যায়, আর স্ত্রী-প্রাণীটিকে কোনও ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখলে পুরুষ-প্রাণীরা সেই ঘরের চিম্‌নির মধ্যে দিয়ে গলে তার কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করে। মিঃ ডাব্‌ল্‌ডে জানিয়েছেন—এই দু'টি প্রজাতির একটি করে স্ত্রী-প্রাণীকে একটা ঘরে আটকে রেখে তিনি দেখেছিলেন মাত্র একদিনে পঞ্চাশ থেকে একশোটা পুরুষ-প্রাণী এসে জড়ো হয়েছিল তাদের চারপাশে। উইট দ্বীপে মিঃ ট্রিমেন একটা পরীক্ষা করেছিলেন। আগের দিন বন্দী করা ল্যাসিওক্যাম্পা প্রজাতির একটা স্ত্রী-পতঙ্গকে একটা বাক্সে রেখে নজর রাখছিলেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই প্রজাতির পাঁচটা পুরুষ-পতঙ্গ ওখানে এসে জোটে এবং বাক্সটার মধ্যে ঢোকার জন্যে নানারকম চেষ্টা শুরু করে দেয়। অস্ট্রেলিয়ায় মঁসিয়ে ভেরু (Verreaux) পরীক্ষা করেছিলেন বম্বিক্স প্রজাতির একটা স্ত্রী-পতঙ্গকে নিয়ে। ছোট একটা বম্বিক্স স্ত্রী-পতঙ্গকে একটা বাক্সে পুরে বাক্সটা নিজের পকেটে রেখে দিয়েছিলেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই প্রজাতির একরাশ পুরুষ-পতঙ্গ এসে ভিড় করে তাঁর চারপাশে। তিনি যখন বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেন তখন তাঁর সঙ্গে প্রায় ২০০টা পুরুষ-পতঙ্গও ঢুকে পড়ে বাড়ির মধ্যে।

লেপিডোপ্টেরা বর্গের পতঙ্গদের যে-তালিকাটা মঁসিয়ে স্টডিংগার তৈরি করেছেন, তার দিকে আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছিলেন মিঃ ডাব্‌ল্‌ডে। ওই তালিকায় প্রজাপতিদের (Rhopalocera) ৩০০টি প্রজাতির পুরুষ ও স্ত্রী-পতঙ্গদের দাম উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে যাচ্ছে, নিতান্ত সাধারণ প্রজাতির স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের দামে কোনও পার্থক্য নেই, কিন্তু ১১৪টি বিরল প্রজাতির

প্রজাপতিদের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের দামে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এদের মধ্যে মাত্র একটা প্রজাতি বাদে বাকি সবক'টা প্রজাতির ক্ষেত্রেই স্ত্রী-প্রজাপতিদের তুলনায় পুরুষ-প্রজাপতিদের দাম কম। এই ১১৩টি প্রজাতির দামের গড় হিসেব করলে দেখা যাবে স্ত্রী-প্রজাপতিদের দাম ১৪৯ এবং পুরুষ-প্রজাপতিদের দাম ১০০। দামের এই তফাত থেকে একটা আপাত-সত্য হিসেব বেরিয়ে আসে—প্রতি ১০০টি স্ত্রী-প্রজাপতি পিছু পুরুষ-প্রজাপতি থাকে ১৪৯টি। মথেদের (Heterocera) প্রায় ২ হাজার প্রজাতির নাম তালিকায় নথিভুক্ত করা হয়েছে (যে-সব প্রজাতির স্ত্রী-মথেদের ডানা থাকে না, তাদের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের আচরণে অনেক পার্থক্য বলে তাদের নাম এই তালিকায় রাখা হয়নি)। এই ২ হাজার প্রজাতির মধ্যে ১৪১টি প্রজাতির স্ত্রী আর পুরুষ-মথেদের দামে পার্থক্য লক্ষ করা যায়—১৩০টি প্রজাতির ক্ষেত্রে পুরুষ-মথেদের দাম স্ত্রী-মথেদের চেয়ে কম আর মাত্র ১১টি প্রজাতির ক্ষেত্রে পুরুষ-মথেদের দাম স্ত্রী-মথেদের চেয়ে বেশি। প্রথমোক্ত ১৩০টি প্রজাতির ক্ষেত্রে পুরুষ-মথেদের গড় দাম ১০০ এবং স্ত্রী-মথেদের গড় দাম ১৪৩। এই তালিকায় নথিভুক্ত প্রজাপতিদের ব্যাপারে মিঃ ডাব্‌ল্‌ডে মনে করেন (এ ব্যাপারে সারা ইংল্যান্ডে তাঁর চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা আর কারুরই নেই) যে এদের আচার-আচরণের মধ্যে এমন কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই যার দরুন এদের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের দামের এত তারতম্য হতে পারে। তাঁর মতে, পুরুষ-পতঙ্গদের সংখ্যা অনেক বেশি হয় বলেই তাদের দাম কম হয়। কিন্তু ডঃ স্টডিংগার আমাকে জানিয়েছেন যে এ ব্যাপারে তিনি ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে—স্ত্রী-পতঙ্গরা একটু অলস স্বভাবের হয় বলে আর গুটি থেকে পুরুষ-পতঙ্গরা আগে বেরিয়ে আসে বলেই প্রজাপতি-সংগ্রাহকরা স্ত্রী-পতঙ্গদের তুলনায় অনেক বেশি পুরুষ-পতঙ্গ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় এবং তার ফলেই পুরুষ-পতঙ্গদের দামটা অনেক কম হয়ে যায়। শুঁয়োপোকা অবস্থা থেকে যে-সব প্রজাপতিকে বড় করে তোলা হয়, তাদের ব্যাপারে ডঃ স্টডিংগার মনে করেন যে গুটি অবস্থায় থাকার সময় এদের মধ্যে পুরুষ-পতঙ্গদের চেয়ে স্ত্রী-পতঙ্গরা অনেক বেশি সংখ্যায় মারা যায়। তিনি আরও বলেছেন যে কয়েকটি প্রজাতির মধ্যে মাঝেমাঝে কয়েক বছর করে কোনও-একটি লিঙ্গের পতঙ্গদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়।

লেপিডোপ্‌টেরা বর্গের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের (ডিম থেকে কিংবা শুঁয়োপোকা অবস্থা থেকে বড় করে তোলা) ব্যাপারে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের যে-ক'টি তথ্য আমি হাতে পেয়েছি, এখানে তা পেশ করছি পাঠকদের সামনে :

	পুরুষ	স্ত্রী
১৮৬৮ সালে এক্সারটার-এর রেভারেন্ড জে. হেলিন্স্[২৬] মোট ৭৩টি প্রজাতির সমঙ্গকে (imago) বড় করেছিলেন, যার মধ্যে ছিল...	১৫৩	১৩৭
১৮৬৮ সালে এল্ট্হ্যাম-এর মিঃ অ্যালবার্ট জোন্স্ ৯টি প্রজাতির সমঙ্গকে বড় করেছিলেন, যার মধ্যে ছিল...	১৫৯	১২৬
১৮৬৯ সালে তিনি ৪টি প্রজাতির সমঙ্গকে বড় করেছিলেন, যার মধ্যে ছিল...	১১৪	১১২
১৮৬৯ সালে হ্যান্টস্-এর এম্স্ওয়ার্থ অঞ্চলের মিঃ বাক্লার ৭৪টি প্রজাতির সমঙ্গকে বড় করেছিলেন, যার মধ্যে ছিল...	১৮০	১৬৯
কোল্চেস্টার-এর ডঃ ওয়ালেস বম্বিক্স সিন্থিয়া প্রজাতির একগুচ্ছ ডিম ফুটিয়ে বার করেছিলেন...	৫২	৪৮
১৮৬৯ সালে চীন থেকে পাঠানো বম্বিক্স পেরনায়ি-দের গুটি থেকে ডঃ ওয়ালেস বার করেছিলেন...	২২৪	১২৩
১৮৬৮ এবং ১৮৬৯ সালে বম্বিক্স ইয়ামামাই-দের দু'গুচ্ছ গুটি থেকে ডঃ ওয়ালেস বার করেছিলেন...	৫২	৪৬
মোট	৯৩৬	৭৬১

এই আটগুচ্ছ গুটি ও ডিমের হিসেবে পুরুষ-পতঙ্গদেরই সংখ্যাধিক্যের প্রমাণ পাচ্ছি আমরা। সবটা মিলিয়ে হিসেব করলে প্রতি ১০০টি স্ত্রী-পতঙ্গ পিছু ১২.৭টি করে পুরুষ-পতঙ্গ জন্ম নিয়েছে। তবে এখানের এই সংখ্যাগুলো এতই কম যে এগুলোকে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা শক্ত।

এখানে যা-কিছু তথ্যপ্রমাণ পেশ করা হল, তা মোটামুটিভাবে একইদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছে। এ থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছচ্ছি যে লেপিডোপ্টেরা বর্গের অধিকাংশ প্রজাতির মধ্যে ডিম ফুটে বেরোনোর সময় স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গের সংখ্যাগত অনুপাত যা-ই থাকুক না কেন, পূর্ণবয়স্ক পুরুষ-পতঙ্গদের সংখ্যা পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে সাধারণত বেশিই হয়ে থাকে।

অন্যান্য কীটপতঙ্গদের ব্যাপারে খুব বেশি নির্ভরযোগ্য তথ্য আমি জোগাড় করে উঠতে পারিনি। স্ট্যাগ-বিট্ল্-দের (Lucanus cervus) মধ্যে 'পুরুষ-পতঙ্গদের

২৬। এই প্রাণিবিজ্ঞানীটি আমার কাছে এর পূর্ববর্তী বছরগুলোর কিছু পরিসংখ্যানও পাঠিয়ে দিয়েছেন, যেখানে স্ত্রী-পতঙ্গদের সংখ্যাধিক্যের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই পরিসংখ্যানের মধ্যে অনেকগুলোই আনুমানিক বলে সেগুলোকে আমি এখানে উপস্থাপিত করিনি।

সংখ্যা স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে অনেক বেশি হয়।' তবে ১৮৬৭ সালে কর্নেলিয়াস বলেছিলেন যে ওই বছরে জার্মানির একটা অংশে যখন এই পোকারা প্রচুর সংখ্যায় এসে জুটেছিল, তখন তাদের মধ্যে স্ত্রী-পতঙ্গদের সংখ্যা পুরুষ-পতঙ্গদের চেয়ে প্রায় ছ'গুণ বেশি ছিল। এলাটেরিডি-দের একটি প্রজাতির ব্যাপারে বলা হয় যে এদের মধ্যে স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে পুরুষ-পতঙ্গদের সংখ্যা অনেক বেশি হয় এবং 'প্রায়শই একটি স্ত্রী-পতঙ্গের সঙ্গে দু'-তিনটি পুরুষ-পতঙ্গকে থাকতে দেখা যায়। অর্থাৎ এদের মধ্যে স্ত্রী-পতঙ্গদের বহুগামিতা চালু আছে।' সায়াগোনিয়াম (Staphylinidae) প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের মাথায় হুল বা শৃঙ্গ থাকে এবং 'এদের মধ্যে স্ত্রী-পতঙ্গদের সংখ্যা পুরুষ-পতঙ্গদের চেয়ে অনেক বেশি হয়।' এনটোমোলজিক্যাল সোসাইটির সভায় মিঃ জ্যাকসন বলেছেন—বল্কলভোজী টমিকাস ভিলোসাস-দের মধ্যে স্ত্রী-পতঙ্গদের বিপুল সংখ্যাধিক্য থাকে আর পুরুষ-পতঙ্গদের সংখ্যা এত কম হয় যে তাদের প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না।

কীটপতঙ্গদের কয়েকটি প্রজাতি ও কয়েকটি শাখার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাতের ব্যাপারে কিছু বলতে যাওয়া নিতান্তই অর্থহীন, কারণ এদের মধ্যে পুরুষ-পতঙ্গ প্রায় থাকেই না এবং স্ত্রী-পতঙ্গরা যৌনসংসর্গ ব্যতীতই গর্ভবতী হতে পারে। সাইনিপিডি বর্গের বেশ কিছু পতঙ্গদের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা লক্ষ করা যায়। গাছের গায়ে স্ফীতি তৈরি করতে সক্ষম (gallmaking) সাইনিপিডি বর্গের যে-পতঙ্গদের মিঃ ওয়াল্‌শ্‌ লক্ষ করেছেন, তাদের মধ্যে পুরুষ-পতঙ্গদের চেয়ে স্ত্রী-পতঙ্গদের সংখ্যা অন্তত চার-পাঁচ গুণ বেশি। তিনি আমাকে আরও জানিয়েছেন যে গাছের গায়ে স্ফীতি তৈরি করতে সক্ষম সেসিডোমাইডি-দের (Diptera) ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। সাধারণ প্রজাতির কয়েক ধরনের করাতে-মাছিদের (Tenthredinae) সব মাপের কয়েকশো শূককীট থেকে পূর্ণাঙ্গ মাছি ফুটিয়েছেন মিঃ এফ. স্মিথ, কিন্তু তাদের মধ্যে একটাও পুরুষ-মাছি ছিল না। অন্যদিকে, কুর্টিস বলেছেন যে তিনি এমন কিছু প্রজাতির (Athalia) পূর্ণাঙ্গ মাছি ফুটিয়েছেন যাদের মধ্যে পুরুষ-মাছিদের সংখ্যা স্ত্রী-মাছিদের থেকে ছ'গুণ বেশি ছিল, আবার এইসব প্রজাতিরই পূর্ণাঙ্গ মাছিদের মাঠ-ময়দান থেকে ধরে এনে তিনি দেখেছেন তাদের মধ্যে অনুপাতটা এর ঠিক বিপরীত—স্ত্রী-মাছিদের সংখ্যাই পুরুষ-মাছিদের থেকে ছ'গুণ বেশি। মৌমাছিদের নানান প্রজাতির বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন হারমান মূলার, আবার একইসঙ্গে গুটি অবস্থা থেকে বেশ কিছু মৌমাছিকে পূর্ণাঙ্গ করেও তুলেছিলেন তিনি। অতঃপর এইসব প্রজাতির মৌমাছিদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাটা গুনে দেখার চেষ্টা করেন তিনি। গুনতে গিয়ে তিনি দেখেন কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে পুরুষ-মৌমাছিদের সংখ্যা স্ত্রী-মৌমাছিদের থেকে অনেক বেশি,

কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী-মৌমাছিদের সংখ্যা পুরুষ-মৌমাছিদের থেকে অনেক বেশি, আবার কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান-সমান। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ-মৌমাছিরা স্ত্রী-মৌমাছিদের থেকে আগে গুটি কেটে বেরিয়ে এসেছিল বলে প্রজনন-মরশুমের শুরুতে পুরুষ-মৌমাছিরাই সংখ্যায় অধিক ছিল। মুলার আরও দেখেছিলেন যে কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী আর পুরুষ-মৌমাছিদের সংখ্যাগত অনুপাতটা এক-এক অঞ্চলে এক-একরকম হয়—একটা অঞ্চলের অনুপাতের সঙ্গে অন্য একটা অঞ্চলের অনুপাতের বিপুল পার্থক্য থাকে। তবে হারমান মুলার নিজেই আমাকে জানিয়েছেন যে এইসব হিসেবগুলো একেবারে নিখুঁত বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়, কারণ পর্যবেক্ষণের সময় কোনও-একটা লিঙ্গের পতঙ্গরা সহজেই পর্যবেক্ষকের নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তাঁর ভাই ফ্রিৎজ্ মুলার ব্রাজিলে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন একই প্রজাতির স্ত্রী আর পুরুষ-মৌমাছিরা মাঝেমাঝে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ফুলের ওপরে গিয়ে বসে। অর্থোপ্‌টেরা বর্গের পতঙ্গদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যার ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানা নেই আমার। তবে কোর্তে বলেছেন যে তাঁর দ্বারা পরীক্ষিত ৫০০টি পঙ্গপালের মধ্যে প্রতি ৫টি পুরুষ-পঙ্গপাল পিছু ৬টি করে স্ত্রী-পঙ্গপাল ছিল। নিউরোপ্‌টেরা বর্গের পতঙ্গদের ব্যাপারে মিঃ ওয়াল্‌শ বলেছেন যে এদের অনেক প্রজাতির মধ্যেই (তবে ওডোনেটাস শ্রেণীর সব প্রজাতির মধ্যে নয়) পুরুষ-পতঙ্গদের বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। এদের হেটেরিনা বর্গের মধ্যে স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে পুরুষ-পতঙ্গদের সংখ্যা অন্তত চার গুণ বেশি হয়। গম্ফাস বর্গের মধ্যেও পুরুষ-পতঙ্গদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়, আবার অন্য দু'টি প্রজাতির মধ্যে পুরুষ-পতঙ্গদের চেয়ে স্ত্রী-পতঙ্গদের সংখ্যা দু'-তিন গুণ বেশি হয়। সোকাস (Psocus) বর্গের কয়েকটি ইউরোপীয় প্রজাতির ক্ষেত্রে এমন ঘটনাও দেখা যায় যে কয়েক হাজার স্ত্রী-পতঙ্গ সংগ্রহ করা হল অথচ একটাও পুরুষ-পতঙ্গ খুঁজে পাওয়া গেল না, আবার এই বর্গেরই অন্য কয়েকটি প্রজাতির মধ্যে উভয় লিঙ্গের পতঙ্গরা মোটামুটি সমান সংখ্যাতেই বিদ্যমান থাকে। ইংল্যান্ডে মিঃ ম্যাকলাখ্‌লান 'আপাটানিয়া মুলিব্রিস্' প্রজাতির বেশ কয়েকশো স্ত্রী-পতঙ্গ সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু একটাও পুরুষ-পতঙ্গ তাঁর চোখে পড়েনি। 'বোরিয়াস হাইমেলিস' প্রজাতির মাত্র চার-পাঁচটি পুরুষ-পতঙ্গের দেখা পেয়েছিলেন তিনি। অথচ এইসব প্রজাতিগুলোর অধিকাংশের ক্ষেত্রেই (একমাত্র টেনথ্রেডাইনে-রা বাদে) এখনও পর্যন্ত এমন কোনও প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি যা থেকে বলা চলে এদের স্ত্রী-পতঙ্গরা যৌনসংসর্গ ব্যতীতই গর্ভবতী হয়। এ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে এইসব প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের সংখ্যাগত অনুপাতের এই আপাত বৈষম্যের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কত সীমিত।

আর্টিকুলাটা বর্গের অন্যান্য শ্রেণীগুলোর ব্যাপারে আমার হাতে আরও কম তথ্য আছে। বহু বছর ধরে মাকড়সাদের সযত্নে পর্যবেক্ষণ করেছেন মিঃ ব্ল্যাকওয়াল। তিনি আমাকে জানিয়েছেন—পুরুষ-মাকড়সা বেশি অস্থির স্বভাবের হয় বলে সাধারণত তাদেরই বেশি চোখে পড়ে এবং তার ফলে আমরা মনে করি মাকড়সাদের মধ্যে পুরুষ-মাকড়সারাই সংখ্যায় বেশি থাকে। এদের কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটে থাকে। কিন্তু এদের ছয়টি বর্গের এমন কয়েকটি প্রজাতির কথা মিঃ ব্ল্যাকওয়াল উল্লেখ করেছেন যাদের মধ্যে স্ত্রী-মাকড়সাদেরই সংখ্যাধিক্য থাকে বলে মনে হয়।[২৭] স্ত্রী-মাকড়সাদের তুলনায় পুরুষ-মাকড়সাদের শরীরের আকার ছোট হওয়া (যে-পার্থক্যটা কখনও-কখনও অতিরিক্তরকম স্পষ্ট হয়ে ওঠে এদের মধ্যে) এবং স্ত্রী-মাকড়সাদের সঙ্গে পুরুষ-মাকড়সাদের চেহারার বিপুল পার্থক্য—এই দু'টো কারণেই বোধহয় কোনও-কোনও ক্ষেত্রে এদের সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে ওঠে।

নিম্নশ্রেণীর কিছু কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীরা যৌনসংসর্গের সাহায্যে বংশবিস্তারে সক্ষম হয় এবং ঠিক এই কারণেই তাদের মধ্যে পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম হয়ে থাকে। একুশটি জায়গা থেকে সংগ্রহ করা অ্যাপাস-দের ১৩ হাজার নমুনা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন ফন সিবল্ড। এই ১৩ হাজারের মধ্যে পুরুষ-প্রাণী ছিল মাত্র ৩১৯টি। এই বর্গের অন্য কিছু প্রাণীদের (টানাই-সাইপ্রি) ব্যাপারে ফ্রিৎজ্ মুলার আমাকে জানিয়েছেন যে এদের পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের চেয়ে অনেক কম দিন বাঁচে। যদি ধরে নেওয়া যায় জন্মের সময় এদের মধ্যে স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যা সমান-সমান থাকে, তাহলে পুরুষ-প্রাণীদের এই কমদিন বাঁচাটাকেই এদের মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হিসেবে মেনে নেওয়া যায়। আবার ব্রাজিলের উপকূল থেকে ডায়াস্টিলাইডি আর সাইপ্রিডিনা-দের যে-নমুনাগুলো মূলার সংগ্রহ করেছিলেন, তাদের মধ্যে স্ত্রী-প্রাণীদের চেয়ে পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। যেমন একই দিনে ধরা ৬৩টি সাইপ্রিডিনার মধ্যে ৫৭টিই ছিল পুরুষ-প্রাণী। তবে তিনি বলেছেন যে এদের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের আচার-আচরণের কোনও অজানা পার্থক্যের জন্যই হয়তো পুরুষদের এই সংখ্যাধিক্যটা আমাদের চোখে পড়ে। ব্রাজিলের এক ধরনের উন্নত শ্রেণীর কাঁকড়াদের (যাদের গেলাসিমাস বলা হয়) ক্ষেত্রে ফ্রিৎজ্ মুলার দেখেছিলেন যে এদের মধ্যে স্ত্রী-কাঁকড়াদের থেকে পুরুষ-কাঁকড়াদের সংখ্যা অনেক বেশি হয়। আবার বিপুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মিঃ সি.

২৭। এই শ্রেণীটির ব্যাপারে আর-একজন বিশেষজ্ঞ উপ্সালার অধ্যাপক মুলার বলেছেন ('অন ইউরোপিয়ান স্পাইডারস', ১৮৬৯-৭০, খণ্ড ১, পৃঃ ২০৫) যে এদের মধ্যে প্রায় সবসময়েই পুরুষ-মাকড়সাদের চেয়ে স্ত্রী-মাকড়সাদের সংখ্যা বেশি হয়।

স্পেন্স বেট ইংল্যান্ডের ছ'রকম সাধারণ শ্রেণীর কাঁকড়াদের মধ্যে এর ঠিক বিপরীত ঘটনাটাই লক্ষ করেছিলেন এবং এই ছ'রকম কাঁকড়াদের নামও আমাকে জানিয়েছেন তিনি।

প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাত

এ কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে নির্বাচনের সাহায্যে মানুষ তার নিজের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পেরেছে। কিছু মহিলা তাঁদের সারা জীবনে কোনও-একটি বিশেষ লিঙ্গের সন্তানদেরই অধিক সংখ্যায় জন্ম দিয়ে থাকেন। জীবজন্তুদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য, যেমন গরু ও ঘোড়াদের ক্ষেত্রে। ইয়েল্ডার্সলি হাউসের মিঃ রাইট তাঁর একটি আরবি মাদি-ঘোড়ার কথা জানিয়েছেন আমাকে। এই মাদি-ঘোড়াটির সঙ্গে সাতবার সাতটি আলাদা আলাদা পুরুষ-ঘোড়ার সঙ্গম ঘটানো হয়, কিন্তু প্রতিবারই সে একটি করে স্ত্রী-শাবকের জন্ম দেয়। এ ব্যাপারে আমার হাতে খুব বেশি প্রমাণ নেই ঠিকই, তবু অন্যান্য নানান ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে দেখলে মনে হয় বিশেষ কোনও-একটি লিঙ্গের সন্তানের জন্ম দেওয়ার প্রবণতাটা অন্য সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মতো (যেমন যমজ-সন্তানের জন্ম দেওয়ার মতো) উত্তরাধিকারসূত্রেই অর্জিত হয়ে থাকে। এই প্রবণতাটির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ মিঃ জে. ডাউনিং আমাকে এমন কিছু তথ্য জানিয়েছেন যা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় ছোট মাপের শৃঙ্গবিশিষ্ট কয়েক ধরনের গবাদি পশুর মধ্যে ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটে থাকে। ভারতবর্ষের টোডা নামক একটি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রতি একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন কর্নেল মার্শাল। এদের মধ্যে সব বয়স মিলিয়ে মোট ১১২ জন পুরুষ এবং ৮৪ জন নারী আছে, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন নারী পিছু ১৩৩.৩ জন করে পুরুষ। টোডাদের মধ্যে নারীদের বহুবিবাহ চালু আছে। অতীতে এদের মধ্যে নিশ্চয়ই নারী-শিশুদের হত্যা করার রীতি চালু ছিল, তবে অনেক বছর আগে থেকেই সে প্রথাটা বন্ধ হয়ে গেছে। বিগত কয়েক বছরে এদের সমাজে যত শিশুর জন্ম হয়েছে তাদের মধ্যে নারী-শিশুদের চেয়ে পুরুষ-শিশুদের সংখ্যা অনেক বেশি—প্রতি ১০০টি নারী-শিশু পিছু ১২৪টি করে পুরুষ-শিশু জন্মেছে। এ ব্যাপারে কর্নেল মার্শাল লিখেছেন, 'ধরা যাক তিনটি পরিবারই এই গোটা জনগোষ্ঠীটার প্রতিনিধিস্বরূপ। আরও ধরে নেওয়া যাক যে এদের মধ্যে প্রথম পরিবারের মহিলাটি ছয়টি কন্যার জন্ম দিলেন কিন্তু একটিও পুত্রের জন্ম দিতে পারলেন না, দ্বিতীয় পরিবারের মহিলাটি জন্ম দিলেন ছয়টি পুত্রের এবং তৃতীয় পরিবারের মহিলাটির গর্ভ থেকে জন্ম নিল তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা। এ-রকম অবস্থায় গোষ্ঠীর রীতি অনুযায়ী প্রথম মহিলাটি তাঁর চারটি কন্যাকে হত্যা

করবেন এবং দু'টিকে বাঁচিয়ে রাখবেন, দ্বিতীয় মহিলাটি তাঁর ছয়টি পুত্রকেই বাঁচিয়ে রাখবেন আর তৃতীয় মহিলাটি তাঁর দু'টি কন্যাকে হত্যা করে একটি কন্যা ও তিনটি পুত্রকে বাঁচিয়ে রাখবেন। তাহলে এই তিনটি পরিবার মিলিয়ে মোট নয়টি পুত্র আর তিনটি কন্যা জীবিত রইল, যারাই বয়ে নিয়ে যাবে গোষ্ঠীর বংশধারাকে। অর্থাৎ পুত্রসন্তানের জন্ম হওয়াটা এদের কাছে আনন্দের ব্যাপার হলেও কন্যাসন্তান মোটেই আকাঙ্ক্ষিত নয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকে এই পক্ষপাতটা, তারপর একসময় দেখা যায় এদের পরিবারগুলোর মধ্যে কন্যাসন্তানের থেকে পুত্রসন্তানই অধিক সংখ্যায় জন্মেছে।'

শিশুহত্যার যে-পদ্ধতির কথা ওপরে বলা হয়েছে, তার ফলটা এ-রকম হওয়াই স্বাভাবিক, অর্থাৎ যদি ধরে নেওয়া যায় যে বিশেষ একটি লিঙ্গের সন্তানের জন্ম দেওয়ার প্রবণতাটা এরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে তাহলে তার পরিণতিটা এ-রকমই ঘটতে বাধ্য। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত পরিসংখ্যানগুলো নিতান্তই কম বলে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলাম আমি। তথ্য কিছু পেয়েছি ঠিকই, তবে সেগুলো কতখানি নির্ভরযোগ্য তা বুঝে উঠতে পারিনি। তবুও তথ্যগুলো পেশ করছি পাঠকদের সামনে। নিউজিল্যান্ডের মাওরি-দের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই শিশুহত্যার রীতি চালু ছিল। মিঃ ফেন্টন[২৮] বলেছেন যে তিনি 'এমন বেশ কিছু মহিলাকে দেখেছেন যারা কেউ চারটি, কেউ ছয়টি, কেউ-বা নিজেদের সাতটি করে সন্তানকে হত্যা করেছেন এবং এই সন্তানদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কন্যাসন্তান। তবে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বক্তব্য থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে যে এই প্রথাটা অনেক বছর আগেই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। খুব সম্ভবত ১৮৩৫ সালেই নির্মূল হয়ে গিয়েছিল প্রথাটা।' টোডাদের মতোই নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীদের মধ্যেও এখন পুত্রসন্তান জন্মানো অনেক বেড়ে গেছে। মিঃ ফেন্টন বলেছেন, 'পুত্রসন্তান আর কন্যাসন্তান জন্মানোর মধ্যে ঠিক কবে থেকে এই সংখ্যাগত বৈষম্যটা দেখা দিয়েছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও একটা ব্যাপার কিন্তু নিশ্চিত—কন্যাসন্তানের জন্মহার কমার এই প্রক্রিয়াটা ১৮৩০ থেকে ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত সময়কালে পূর্ণমাত্রাতেই সক্রিয় ছিল, কারণ ওই সময় এদের সমস্ত অ-প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা গুনে দেখা হয়েছিল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটা এদের মধ্যে একইভাবে কাজ করে চলেছে।' নীচে যে-কথাগুলো উল্লেখ করছি সেগুলোও মিঃ ফেন্টনের বিবৃতি থেকেই নেওয়া, কিন্তু যেহেতু এখানে উল্লিখিত সংখ্যাগুলো মোটেই পর্যাপ্ত নয় এবং যেহেতু জনগণনার কাজটাও একেবারে নিখুঁত ছিল না, সেহেতু এ থেকে কোনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছনো দুষ্কর। এদের ব্যাপারে এবং পরবর্তী উদাহরণগুলোর

২৮। 'আবরিজিন্যাল ইনহ্যাবিট্যান্টস অফ নিউজিল্যান্ড ; গভর্নমেন্ট রিপোর্ট', ১৮৫৯, পৃঃ ৩৬।

ব্যাপারে একটা কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখা দরকার—যে-কোনও অঞ্চলের, বিশেষত যে-কোনও সুসভ্য দেশের জনসংখ্যায় নারীদেরই সংখ্যাধিক্য থাকে যার প্রধান কারণ যৌবনকালে পুরুষদের অধিক মৃত্যু-হার এবং আংশিক কারণ জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে তাদের নানা ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হওয়া। ১৮৫৮ সালে নিউজিল্যান্ডে সব বয়স মিলিয়ে মোট ৩১৬৬৭ জন পুরুষ আর ২৪৩০৩ জন নারী ছিল, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন নারী-পিছু পুরুষ ছিল ১৩০.৩ জন করে। অথচ ওই বছরই কয়েকটা জেলায় খুব নিখুঁতভাবে গণনা করে দেখা গিয়েছিল ওইসব জেলায় সব বয়স মিলিয়ে মোট ৭৫৩ জন পুরুষ আর ৬১৬ জন নারী আছে, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন নারী-পিছু ১২২.২ জন করে পুরুষ। আমাদের আলোচনার পক্ষে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল—ওই ১৮৫৮ সালেই ওই জেলাগুলির একটিতে অ-প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ছিল ১৭৮ জন আর অ-প্রাপ্তবয়স্ক নারী ছিল ১৪২ জন, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন অ-প্রাপ্তবয়স্ক নারী পিছু ১২৫.৩ জন করে অ-প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। এইসঙ্গেই উল্লেখ করা যায় যে ১৮৪৪ সালে, যখন নারী-শিশু হত্যার প্রথাটা সবে বন্ধ হয়েছে, তখন একটা জেলায় অ-প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সংখ্যা ছিল ২৮১ জন আর অ-প্রাপ্তবয়স্ক নারী ছিল মাত্র ১৯৪ জন, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন অ-প্রাপ্তবয়স্ক নারী পিছু অ-প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ছিল ১৪৪.৮ জন করে।

স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জে নারীদের চেয়ে পুরুষদের সংখ্যা অনেক বেশি। একসময় এখানে শিশুহত্যার ঘটনা আকছার ঘটত, তবে মিঃ এলিস-এর লেখা থেকে এবং আমার কাছে পাঠানো বিশপ স্টেলি এবং রেভারেন্ড মিঃ কোন্-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে শিশুহত্যার এই ব্যাপারটা শুধুমাত্র নারী-শিশুদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আর-একজন নির্ভরযোগ্য লেখক মিঃ জার্ভিস, যিনি এই সমগ্র দ্বীপপুঞ্জটাকেই ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তিনি লিখেছেন, 'এখানে এমন অনেক স্ত্রীলোকের দেখা পাওয়া যায় যারা স্বীকার করে যে তারা তাদের তিনটি বা ছয়টি কিংবা আটটি সন্তানকে হত্যা করেছে।' এইসঙ্গেই তিনি বলেছেন, 'পুরুষদের থেকে নারীদের কম প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয় আর তাই নারী-শিশু হত্যার ঘটনাটাই বেশি সংখ্যায় ঘটেছে।' পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল থেকে শিশুহত্যার ব্যাপারে যা-কিছু জানা গেছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মনে হয় মিঃ জার্ভিসের এই বক্তব্যটা সত্য হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়, তবে এ থেকে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আমাদের। ১৮১৯ সালে যখন স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জে মূর্তিপূজার অবসান ঘটে এবং মিশনারিরা তাঁদের প্রচারকার্য শুরু করেন, তখন থেকেই এখানে শিশুহত্যার প্রথাটা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৩৯ সালে কাউআই দ্বীপে এবং ওয়াহু-র একটা জেলায় প্রাপ্তবয়স্ক ও করযোগ্য (taxable) পুরুষ ও নারীদের সংখ্যা গণনা করা হয়েছিল যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে। তাতে দেখা গিয়েছিল পুরুষের সংখ্যা ৪৭২৩ জন আর নারী ৩৭৭৬ জন, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন

নারী-পিছু ১২৫.০৮ জন করে পুরুষ। ওই সময়ে কাউআই দ্বীপে চোদ্দো বছরের নীচে এবং ওয়াহু-তে আঠারো বছরের নীচে পুরুষদের সংখ্যা ছিল ১৭৯৭ জন আর ওই বয়সী নারীদের সংখ্যা ছিল ১৪২৯ জন, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন নারী-পিছু পুরুষ ছিল ১২৫.৭৫ জন করে।

১৮৫০ সালে সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের জনগণনায় দেখা যায় সব বয়স মিলিয়ে পুরুষদের সংখ্যা ৩৬২৭২ জন আর নারীদের সংখ্যা ৩৩১২৮ জন, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন নারী-পিছু ১০৯.৪৯ জন করে পুরুষ। সতেরো বছরের থেকে কমবয়সী পুরুষদের সংখ্যা ছিল ১০৭৭৩ জন আর ওই বয়সী নারী ছিল ৯৫৯৩ জন, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন নারী-পিছু ১১২.৩ করে পুরুষ। ১৮৭২ সালের জনগণনায় সব বয়স মিলিয়ে (বর্ণসঙ্কররা-সহ) নারী-পুরুষের অনুপাত ছিল প্রতি ১০০ জন নারী পিছু ১২৫.৩৬ জন করে পুরুষ। মনে রাখা দরকার, স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যার এই হিসেবগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র জীবিত পুরুষদের সঙ্গে জীবিত নারীদের সংখ্যাগত অনুপাতটাই বিধৃত হয়েছে, জন্মের সময় তাদের সংখ্যাগত অনুপাতের হিসেব এর মধ্যে নেই। সুসভ্য দেশগুলির অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে আমরা বলতে পারি—জন্মের সময়কার হিসেবটাও এর অন্তর্ভুক্ত করা হলে পুরুষদের অনুপাতটা আরও অনেক বেড়ে যেত।[২৯]

উপরে যে-ঘটনাগুলোর কথা বলা হল তা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি উপরোল্লিখিত পন্থায় শিশুহত্যার ঘটনা ঘটে চললে সমাজে পুরুষদের সংখ্যাধিক্য দেখা দিতেই পারে। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই প্রথাটাকে কিংবা অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে এর সমতুল কোনও প্রক্রিয়াকে পুরুষের সংখ্যাধিক্যের একমাত্র কারণ বলে মেনে নিতে আমি রাজি নই। যে-সব জাতি ইতিমধ্যেই নতুন নতুন সন্তান উৎপাদনের

২৯। ১৮৩০ সাল নাগাদ ক্যালিফোর্নিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ডঃ কুল্‌টার ('Journal R. Geograph. Soc.', খণ্ড ৫, ১৮৩৫, পৃঃ ৬৭) বলেছেন—স্পেনীয় মিশনারিরা একসময় এখানকার যে আদি-বাসিন্দাদের চরিত্র-সংশোধন করেছিলেন তারা এখন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা যাচ্ছে, যদিও তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করা হয়, নিজেদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িতও করা হয়নি তাদের এবং মদ্যপানের অভ্যাসও ত্যাগ করেছে তারা। তাঁর মতে নারীদের থেকে পুরুষদের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে যাওয়াটাই তাদের এই বিলুপ্তির মূল কারণ, তবে নারীদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ কন্যাসন্তান কম জন্মানো নাকি অল্পবয়সী নারীদের অধিক মৃত্যু-হার—তা তিনি নির্ধারণ করতে পারেননি। অন্যান্য জায়গার উদাহরণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, এই শেষোক্ত ব্যাপারটা ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম। তিনি আরও বলেছেন, 'শিশুহত্যার ব্যাপারটা এদের মধ্যে খুব-একটা চালু নেই, তবে গর্ভপাতের ঘটনা আক্‌ছারই ঘটে থাকে।' শিশুহত্যা সম্বন্ধে ডঃ কুল্‌টারের এই বক্তব্য যদি সঠিক হয়, তাহলে এটা কর্নেল মার্শালের দৃষ্টিভঙ্গীকে ভুল বলে প্রমাণ করে। চরিত্র সংশোধনের পরেও এখানকার আদি-বাসিন্দাদের সংখ্যা দ্রুত কমে যাওয়া থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে উল্লেখিত অন্যান্য জনগোষ্ঠীগুলোর মতো এদেরও প্রজননশক্তি অনেক কমে গেছে এবং জীবনযাপনের অভ্যাস-আচরণের পরিবর্তনই তার মূল কারণ।

ব্যাপারে কিছুটা অক্ষম হয়ে পড়েছে, তাদের মধ্যে হয়তো আমাদের অজানা কোনও নিয়ম কাজ করে চলে এবং তার ফলেই হয়তো তাদের সমাজে পুরুষদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। পুরুষদের সংখ্যাধিক্যের যে-কারণগুলোর কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো ছাড়া আর-একটা কারণের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। বন্য দশায় থাকা মানুষদের প্রসব অনেক সহজ হয় এবং তার ফলে তাদের পুত্রসন্তানদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিপদও অনেক কম থাকে। এর ফলে তাদের মধ্যে জীবিত কন্যাসন্তানদের থেকে জীবিত পুত্রসন্তানদের সংখ্যাগত অনুপাত বেশি হয়। তবে বন্য দশার জীবন আর পুরুষদের সংখ্যাধিক্যের মধ্যে কোনও আবশ্যিক সম্পর্ক আছে, এমন কথা আমি বলতে চাইছি না। টাসমানিয়ার যে-অধিবাসীরা কিছুদিন আগেও বিদ্যমান ছিল তাদের অল্পসংখ্যক সন্তানসন্ততির কথা এবং বর্তমানে নরফোক দ্বীপপুঞ্জে বসবাসকারী তাহিতির বাসিন্দাদের সঙ্কর সন্তানদের ব্যাপারটা থেকেই বোঝা যায় যে এই দু'টো ব্যাপারের মধ্যে কোনও আবশ্যিক সম্পর্ক নেই।

বহু ধরনের প্রাণীদের পুরুষ ও স্ত্রী-প্রাণীর মধ্যে অভ্যাস-আচরণের অনেক পার্থক্য থাকে এবং উভয় লিঙ্গের প্রাণীর বিপদের সম্ভাবনাটাও ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার হয়ে থাকে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে কোনও-একটি লিঙ্গের প্রাণীদের চেয়ে অন্য লিঙ্গটির প্রাণীদের বেশি সংখ্যায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু নানান কারণের এই জটিল জটের উৎস খুঁজতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে—যে-কোনও একটি লিঙ্গের প্রাণীরা নির্বিচারে (তা সে যত বেশি সংখ্যাতেই হোক না কেন) ধ্বংস হয়ে গেলেও ওই নির্দিষ্ট প্রজাতিটির মধ্যে ওই বিশেষ লিঙ্গের প্রাণীদের জন্ম দেওয়ার

আমি আশা করেছিলাম কুকুরদের জীবনধারা থেকে এ ব্যাপারে নতুন কোনও সূত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। সম্ভবত একমাত্র গ্রেহাউন্ডরা বাদে অন্য সব ধরনের কুকুরদের মধ্যে পুরুষ-ছানাদের থেকে স্ত্রী-ছানারা অনেক বেশি সংখ্যায় মারা যায়—ঠিক টোডা শিশুদের মতোই। মিঃ কাপ্‌ল্‌স্ আমাকে জানিয়েছেন যে স্কটল্যান্ডের ডিয়ারহাউন্ডদের ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা ঘটে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত একমাত্র গ্রেহাউন্ড বাদে অন্য কোনও জাতের কুকুরদের স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই আমার—গ্রেহাউন্ডদের মধ্যে প্রতি ১০০টি স্ত্রী-কুকুর পিছু পুরুষ-কুকুর জন্মায় ১১০.১ করে। বিভিন্ন কুকুর-পালকের বক্তব্য থেকে মনে হয়, স্ত্রী-কুকুরদের নিয়ে বেশি ঝামেলা পোহাতে হলেও স্ত্রী-কুকুরই তাদের কাছে বেশি মূল্যবান। তাদের বক্তব্য থেকে আরও জানা যায় যে সবথেকে ভালোভাবে পালিত কুকুরদের স্ত্রী-শাবকদের তাদের পুরুষ-শাবকদের থেকে মোটেই বেশি সংখ্যায় মারা হয় না, তবে অল্প কিছু ক্ষেত্রে এ-রকম একটা ঘটনা মাঝেমধ্যে ঘটে থাকে। এ অবস্থায় উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে বিচার করে যদি আমার কাছে জানতে চাওয়া হয় গ্রেহাউন্ডদের মধ্যে কেন পুরুষ-কুকুরদের সংখ্যাধিক্য থাকে, তাহলে তার উত্তর দিতে আমি অক্ষম। অন্যদিকে, ঘোড়া, গবাদি পশু আর ভেড়াদের ব্যাপারে (যাদের স্ত্রী-শাবক ও পুরুষ-শাবক দু'টোই সমান মূল্যবান বলে কোনওটাকেই হত্যা করা যায় না) আমরা দেখেছি যে এদের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যায় যদি আদৌ কোনও পার্থক্য থাকে, তাহলে সংখ্যাধিক্যের পাল্লাটা স্ত্রী-প্রাণীদের দিকেই সামান্য ঝুঁকে থাকে।

ক্ষমতার কোনও পরিবর্তন তার ফলে ঘটে না। মৌমাছি বা পিঁপড়েদের মতো পুরোপুরি সমাজবদ্ধ প্রাণী, যাদের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক বন্ধ্যা ও প্রজনন-অক্ষম স্ত্রী-প্রাণী জন্মায় এবং যাদের জীবনে স্ত্রী-প্রাণীদের এই সংখ্যাধিক্যটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তাদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে তাদের মধ্যে সেই দলগুলোই সবথেকে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে যাদের স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে আরও বেশি বেশি সংখ্যায় স্ত্রী-প্রাণীর জন্ম দেওয়ার একটা সহজাত প্রবণতা থাকে। এইসব ক্ষেত্রে অসম সংখ্যায় পুরুষ-প্রাণী আর স্ত্রী-প্রাণীদের জন্ম দেওয়ার প্রবণতাটা শেষ পর্যন্ত পাকাপাকি রূপ নেয় প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত। যে-সব প্রাণীরা দল বেঁধে বাস করে, যাদের মধ্যে দলকে রক্ষা করার জন্যে সামনে এগিয়ে আসে পুরুষ-প্রাণীরা (যেমন উত্তর আমেরিকার বাইসনরা এবং কয়েক ধরনের বেবুনরা), তাদের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত বেশি সংখ্যায় পুরুষ-প্রাণী উৎপাদনের প্রবণতা গড়ে ওঠাটা একান্তই স্বাভাবিক, কারণ যে-দলের সদস্যরা অধিকতর সুরক্ষিত থাকবে তারা বেশি সংখ্যক বংশধর রেখে যেতেও সক্ষম হবে। মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষদের সংখ্যাধিক্য একটা সুবিধার জন্ম দেয় এবং স্ত্রী-শিশু হত্যার প্রথাটা চালু হওয়ার পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করে সেটা।

উভয় লিঙ্গের প্রাণীদেরই সমান সংখ্যায় জন্ম দেওয়া কিংবা কোনও-একটি লিঙ্গের প্রাণীদের বেশি সংখ্যায় জন্ম দেওয়ার সহজাত প্রবণতাটা কখনোই কোনও প্রজাতির কয়েকজন সদস্যের ক্ষেত্রে অন্যদের থেকে সরাসরিভাবে বেশি সুবিধাজনক বা বেশি অসুবিধাজনক হয়ে উঠতে পারে না। যেমন, কোনও প্রজাতির একজন সদস্যের মধ্যে যদি স্ত্রী-সন্তানের তুলনায় বেশি সংখ্যক পুরুষ-সন্তানের জন্ম দেওয়ার প্রবণতা থাকে এবং অন্য একজনের মধ্যে থাকে তার ঠিক বিপরীত প্রবণতা, তাহলে জীবনসংগ্রামে দ্বিতীয়জনের তুলনায় প্রথমজন বেশি সফল হবে এমনটা ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। তাই এ-ধরনের প্রবণতাগুলো প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত অর্জিত হতে পারে না। তথাপি কিছু কিছু প্রাণীদের মধ্যে (যেমন মাছ আর সিরিপেড বা গুগ্‌লি-শামুক জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে) একটি স্ত্রী-প্রাণীকে গর্ভবতী করার জন্য দুই বা ততোধিক পুরুষ-প্রাণীর প্রয়োজন হয় এবং তাদের মধ্যে পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যা অনেক বেশি হয়। কিন্তু বেশি সংখ্যায় পুরুষ-সন্তানের জন্ম দেওয়ার এই প্রবণতাটা তারা ঠিক কীভাবে অর্জন করে, সেটা আমাদের কাছে আদৌ স্পষ্ট নয়। আগে আমি মনে করতাম, যে-সব ক্ষেত্রে উভয় লিঙ্গের সন্তানদের সমান সংখ্যায় জন্ম দেওয়াটা কোনও প্রজাতির ক্ষেত্রে সুবিধাজনক, সেইসব ক্ষেত্রে এই প্রবণতাটা নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফতই গড়ে ওঠে। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি—সমস্যাটা এত বেশি জটিল যে এখনই এর কোনও উত্তর না-খুঁজে সমাধানের ভারটা ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

ডিসেন্ট অফ ম্যান

দ্বিতীয় খণ্ড ❑ প্রথম ভাগ

❑ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ❑

নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ

নিম্নতম শ্রেণীগুলির মধ্যে এইসব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না—উজ্জ্বল রঙ—মল্যাস্কা বা শম্বুক জাতীয় কোমলাঙ্গ প্রাণিবিশেষ—অ্যালেলিড বা কেঁচো, জোঁক জাতীয় প্রাণী—চিংড়ি, কাঁকড়া জাতীয় কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণী, যাদের মধ্যে অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যগুলি অত্যন্ত প্রকট ; ডাইমরফিজ্‌ম্ বা দ্বিরূপতা ; রঙ ; পরিণত হয়ে না-ওঠা যে-বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা দেয় না—মাকড়সা, লিঙ্গভেদে রঙের তফাত ; পুরুষ-মাকড়সাদের কর্কশতা—মিরিয়াপডা বা বৃশ্চিক, কেন্নো জাতীয় বহুপদ সরীসৃপ।

নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে প্রায়শই একই প্রাণীর শরীরে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্যগুলোই বর্তমান থাকে, ফলে এদের মধ্যে অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যগুলো বিকশিত হতে পারে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে দু'টি লিঙ্গের প্রাণীরা আলাদা আলাদা হলেও উভয়েই সারাজীবন কোনও-না-কোনও অবলম্বনে আবদ্ধ থাকে এবং একে অপরকে খুঁজে নিতে বা একে অপরকে পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে পারে না। তাছাড়া এটাও প্রায় নিশ্চিত যে এইসব প্রাণীদের অনুভূতি বা মানসিক ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল বলে এরা একে অপরের সৌন্দর্য বা অন্যান্য আকর্ষণকে উপলব্ধি করতে কিংবা কাউকে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলেও অনুভব করতে পারে না।

এইসব কারণে এই শ্রেণীগুলোর মধ্যে, যেমন প্রোটোজোয়া, কোলেনটেরাটা, এচিনোডারমাটা, স্কোলেসিডা প্রভৃতিদের মধ্যে আমাদের আলোচনার আওতাভুক্ত কোনও অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। এই ঘটনা সেই ধারণাটিকেই সত্য বলে প্রতিপন্ন করে, যে-ধারণা মতে উচ্চতর শ্রেণীর প্রাণীরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে যৌন নির্বাচনের সাহায্যেই, যে-নির্বাচন নির্ভর করে উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও পছন্দ-অপছন্দের ওপর। তবে এ-সব সত্ত্বেও কিছু কিছু আপাত ব্যতিক্রমের কথাও জানতে পারি আমরা। যেমন ডঃ বেয়ার্ড আমাকে জানিয়েছেন—কয়েক ধরনের এন্‌টোজোয়া বা আভ্যন্তরীণ পরজীবী কৃমির পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীদের গাত্রবর্ণের সামান্য পার্থক্য থাকে। তবে এ-ধরনের পার্থক্যগুলো যে যৌন নির্বাচনের ফলেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, এমনটা ধরে নেওয়ার কোনও কারণ আমাদের নেই। যে-সব অঙ্গ বা উপায়ের সাহায্যে পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের আঁকড়ে ধরে এবং কোনও প্রজাতির বংশবিস্তারের ব্যাপারে যেগুলো নিতান্তই অপরিহার্য অঙ্গ বা উপায়, সেগুলো যৌন নির্বাচন মারফত অর্জিত হয়নি, অর্জিত হয়েছে সাধারণ নির্বাচন মারফতই।

নিম্নতর শ্রেণীর অনেক প্রাণীর (তা তারা উভলিঙ্গ কিংবা আলাদা আলাদা স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণী বিশিষ্ট, যা-ই হোক না কেন) গাত্রবর্ণ খুব উজ্জ্বল রঙের হয় কিংবা তাদের গায়ে খুব সুন্দর ডোরা থাকে। যেমন, বেশ কিছু প্রবাল ও সামুদ্রিক বায়ু-পরাগী ফুল (Actiniae), কয়েক ধরনের জেলি-ফিশ (মেডুসা, পর্পিটা ইত্যাদি), কিছু কিছু প্ল্যানারি, বেশ কিছু তারা-মাছ, একিনি (তীক্ষ্ণ কণ্টকাবৃত সামুদ্রিক শামুক), অ্যাসিডিয়ান (এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী) প্রভৃতি। কিন্তু যে-কারণগুলোর কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি—অর্থাৎ এইসব প্রাণীদের কারও-কারও ক্ষেত্রে একই শরীরে দু'টি লিঙ্গই বিদ্যমান থাকা, অন্যদের কোনও-না-কোনও অবলম্বনে সারা জীবন আবদ্ধ থাকা এবং এদের সকলকার মানসিক ক্ষমতা নিম্নস্তরের হওয়া—এই কারণগুলো মাথায় রাখলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এদের এই গাত্রবর্ণ যৌন-আকর্ষণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে না এবং এই গাত্রবর্ণ যৌন নির্বাচন মারফত অর্জিতও হয়নি। মনে রাখা দরকার কোনও ক্ষেত্রেই আমাদের হাতে এমন পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই যার ভিত্তিতে এইভাবে অর্জিত গাত্রবর্ণকে তাদের দু'টি লিঙ্গের প্রাণীদের গায়ের রঙ আলাদা হওয়ার যুক্তিসম্মত কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে (একমাত্র যে-সব ক্ষেত্রে একটি লিঙ্গের প্রাণীদের গায়ের রঙ অন্য লিঙ্গের প্রাণীদের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল কিংবা অনেক বেশি চমকদার হয় এবং যেখানে উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের অভ্যাস-আচরণে কোনও পার্থক্য থাকে না, সেইসব ক্ষেত্র বাদে)। তবে যখন অধিকতর চাকচিক্যবিশিষ্ট প্রাণীরা (প্রায় সব ক্ষেত্রে পুরুষরাই) তাদের বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীদের সামনে নিজেদের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলো প্রদর্শন করে তাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে, তখন এই প্রমাণটা একেবারে দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ এই ধরনের প্রদর্শনকে আমরা অর্থহীন বলে মনে করতে পারি না এবং এই ব্যাপারটা তাদের পক্ষে সুবিধাজনক হলে প্রায় অনিবার্যভাবেই তার পিছু-পিছু দেখা দেবে যৌন নির্বাচন। তবে কোনও প্রজাতির উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের গাত্রবর্ণ যদি এক হয় এবং তাদের এই গাত্রবর্ণের সঙ্গে যদি একই বর্গের অন্য কোনও প্রজাতির যে-কোনও একটি লিঙ্গের সদস্যদের গাত্রবর্ণের হুবহু সাদৃশ্য থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তটিকে ওই প্রথম প্রজাতিটির উভয় লিঙ্গের সদস্যদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

তাহলে একেবারে নিম্নতম শ্রেণীর বিভিন্ন প্রাণীদের গায়ের চমৎকার, এমনকী কখনও-কখনও জমকালো রঙের ব্যাপারটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করব আমরা? এই ধরনের গাত্রবর্ণ এদের নিরাপত্তার সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে কিনা, সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। তবে এ বিষয়ে মিঃ ওয়ালেস-এর চমৎকার রচনাটি পড়ে

দেখলে যে-কেউই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে এ ব্যাপারে ভ্রান্তির শিকার হওয়াটা আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। যেমন, প্রথম নজরে কারুরই মনে হবে না যে মেডুসা বা জেলি-ফিশদের গায়ের স্বচ্ছতাটা তাদের নিরাপত্তার পক্ষে খুব সহায়ক কোনও ভূমিকা নিতে পারে। এক্ষেত্রে হ্যাকেল-এর কথাটা আমাদের মনে রাখা দরকার। হ্যাকেল বলেছিলেন যে শুধু মেডুসাদেরই নয়, শম্বুক জাতীয় নানা ধরনের ভাসমান কোমলাঙ্গ প্রাণী (Mollusca), কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণী, এমনকী কয়েক ধরনের ছোট ছোট সামুদ্রিক মাছেদের গাত্রবর্ণও এইরকম কাচের মতো স্বচ্ছ হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা থেকে সাতটি রঙ ঠিকরে পড়ে। হ্যাকেলের এই কথাটা মনে রাখলে আমাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না যে এর সাহায্যে তারা নিজেদের বিভিন্ন সামুদ্রিক পাখি ও অন্যান্য শত্রুদের নজরে পড়ার সম্ভাবনা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। মঁসিয়ে গিয়ার্ড-ও বলেছেন, কয়েক ধরনের স্পঞ্জ ও অ্যাসিডিয়ানের অঙ্গের উজ্জ্বল আভা তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। একইভাবে, বহু প্রাণীর গায়ের চমকদার রঙও তাদের জীবনে খুব প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। এই ধরনের রঙ দেখে তাদের সম্ভাব্য খাদকরা মনে করে যে খাদ্য হিসেবে তারা মোটেই খুব রুচিকর হবে না অথবা মনে করে যে ওই রঙটা তাদের আত্মরক্ষার একটা বিশেষ কিছু উপায়। তবে এই বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার।

নিম্নতম শ্রেণীর অধিকাংশ প্রাণীদের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই সীমিত। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে তাদের শরীরের উজ্জ্বল আভাটা সৃষ্টি হয় তাদের টিস্যু বা কলার রাসায়নিক প্রকৃতি কিংবা অতিক্ষুদ্র গঠনকাঠামোর ফল হিসেবেই—এর দরুন যে-সুবিধেটা পাওয়া যায় তার সঙ্গে এই আভা সৃষ্টি হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। শিরায়-শিরায় বহমান রক্তের রঙের থেকে সূক্ষ্মতর কোনও রঙের সন্ধান পাওয়া শক্ত। কিন্তু তাই বলে এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই যে রক্তের এই রঙটা আমাদের কোনও বাড়তি সুবিধে জুগিয়ে থাকে। কুমারীর কপোলের সৌন্দর্য এই রক্তিমাভায় আরও বাড়ে ঠিকই, কিন্তু সেই সৌন্দর্যকে বাড়ানোর জন্যেই যে তার রক্তের রঙ লাল হয়ে উঠেছে—এমনটা দাবি করার মতো মূর্খ কেউই নয়। একইভাবে অনেক প্রাণীর, বিশেষত নিম্নতর শ্রেণীর অনেক প্রাণীর, পিত্ত খুব উজ্জ্বল রঙের হয়। যেমন, মিঃ হ্যান্‌কক আমাকে জানিয়েছেন যে ইওলিডি-দের (খোলাহীন সামুদ্রিক শামুক) আশ্চর্য সৌন্দর্যের প্রধান কারণ হল ঈষদচ্ছ ত্বকের মধ্যে দিয়ে পরিদৃশ্যমান তাদের পিত্তগ্রন্থি—কিন্তু সম্ভবত এই সৌন্দর্য তাদের কোনও কাজেই লাগে না। আমেরিকার একটা অরণ্যের গাছপালার শুকনো পাতার রঙকে সকলেই খুব জমকালো বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কেউ বলেননি যে পাতার এই জমকালো রঙটা ওই গাছগুলোর পক্ষে

কোনও সুবিধাজনক ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাকৃতিক জৈবিক পদার্থের প্রায় সমতুল বহু পদার্থ সম্প্রতিকালে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন রসায়নবিদরা এবং সেগুলি অত্যন্ত বর্ণময়ও বটে। এই কথাটা মনে রেখে আমরা বলতে পারি যে জীবজগতের জটিল পরীক্ষাগারেও যদি এ-রকম বর্ণময় সজীব পদার্থ সৃষ্টি না হত তাহলে তা এক আশ্চর্য ঘটনাই হত। এ-রকম বর্ণময় সজীব পদার্থ জীবজগতের পরীক্ষাগারে যথেষ্টই সৃষ্টি হয়, কিন্তু এই বর্ণময়তা তাদের প্রায় কোনও কাজেই লাগে না।

শামুক জাতীয় কোমলাঙ্গ প্রাণীদের উপ-বিভাগ। আমি যতদূর জানি তাতে প্রাণীজগতের এই বিশাল বিভাগটার মধ্যে অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। প্রাণীজগতের তিনটি নিম্নতম শ্রেণী, অর্থাৎ অ্যাসিডিয়ান, পলিজোয়া (প্রবাল ইত্যাদি) ও ব্র্যাকিওপড (অনেকে এই তিনটি শ্রেণীকে মিলিতভাবে মল্যাসকইডা নামে চিহ্নিত করে থাকেন)—এদের মধ্যেও অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি আশা করা যায় না, কেননা এইসব প্রাণীদের অধিকাংশই সারা জীবন কোনও-একটা অবলম্বনের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে, আবার এদের অনেকের একই শরীরের মধ্যেই দু'টি লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে। ল্যামেলিব্রাংকিআটা বা দ্বিপুটক শামুক জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে উভলিঙ্গতা মোটেই কোনও বিরল ঘটনা নয়। এর পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণী গ্যাস্টারোপডা বা একপুটক শামুক জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে একই শরীরে দু'টি লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে, আবার অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী আর পুরুষ আলাদা আলাদা হয়। কিন্তু এই শেষোক্ত ক্ষেত্রটিতে স্ত্রী-প্রাণীদের খুঁজে বার করা, আঁকড়ে ধরা, মোহিত করা কিংবা অন্য পুরুষদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য কোনও বিশেষ অঙ্গ পুরুষ-প্রাণীদের শরীরে কখনোই থাকে না। মিঃ গোইন জেফ্রিস আমাকে জানিয়েছেন যে এদের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের বহিরঙ্গের পার্থক্যটা থাকে একমাত্র খোলায়—দু'টি লিঙ্গের প্রাণীদের খোলার আকারে সামান্য পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন পুরুষ-গেঁড়িদের (Littorina littorea) খোলা স্ত্রী-গেঁড়িদের তুলনায় কিছুটা সরু হয় এবং সামনের প্যাঁচালো অংশটা কিছুটা বড় হয়। তবে ধরে নেওয়া যায় যে এই পার্থক্যগুলো হয় জননক্রিয়ার সঙ্গে নয়তো ডিম্বাণুর বিকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত।

গ্যাস্টারোপডা-রা চলাফেরা করতে পারে এবং অসম্পূর্ণ ধরনের চোখও থাকে তাদের, কিন্তু একই লিঙ্গের অন্য প্রাণীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখে তাদের সঙ্গে লড়াই করার মতো মানসিক ক্ষমতা এদের থাকে না, ফলে কোনও অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যও অর্জন করতে পারে না এরা। তবে প্লামোনিফেরাস গ্যাস্টারোপড বা স্থলচর শামুকরা জোড়-বাঁধার আগে প্রণয় নিবেদন করে থাকে। আসলে উভলিঙ্গ হলেও এদের শরীরের গঠনকাঠামো এমন যাতে করে জোড় বাঁধতে বাধ্যই হয়

এরা। আগাসি বলেছেন, 'শামুকদের প্রণয়-নিবেদন-পর্ব যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা কেউই ওই সময়ে তাদের শারীরিক নড়াচড়া ও প্রলোভনমূলক ব্যাপারগুলোর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন না—এইসব কাজের মধ্যে দিয়েই এই উভলিঙ্গ প্রাণীদের একইসঙ্গে দু'প্রস্থ যৌন সম্পর্ক শুরু হয় ও সম্পন্ন হয়।'

এই স্থলচর শামুকরা বরাবরের মতো জোড় বাঁধতেও কিছুটা সক্ষম বলে মনে হয়। নিখুঁত পর্যবেক্ষক মিঃ লন্‌স্‌ডেল আমাকে একটা ঘটনার কথা জানিয়েছেন। একজোড়া স্থলচর শামুককে (Helix pomatia) একটা ছোট ও খাদ্য সংগ্রহের পক্ষে অসুবিধেজনক বাগানে রেখে দিয়েছিলেন তিনি, যাদের মধ্যে একটা শামুক ছিল খুব দুর্বল ধরনের। কিছুক্ষণ পরে বাগানে গিয়ে শক্তিশালী ও হৃষ্টপুষ্ট শামুকটাকে দেখতে পাননি তিনি। পরে তার শরীর-নিঃসৃত আঠালো রসের দাগ অনুসরণ করে দেখেন যে একটা দেয়াল টপকে পাশের একটা খাদ্যপূর্ণ বাগানে চলে গেছে শামুকটা। ঘটনাটা দেখে মিঃ লন্‌স্‌ডেল ধরে নেন যে নিজের দুর্বল সঙ্গীকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে শামুকটা। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা পর সেই শামুকটা আবার ফিরে আসে, নিজের সফল অভিযানের কাহিনি সঙ্গীটিকে জানায় (মানে ব্যাপারটা সেইরকমই দাঁড়ায় আর কি), তারপর দু'জনে একই পথরেখা ধরে এগিয়ে দেয়াল টপকে পাশের বাগানে চলে যায়।

মল্যাস্কা বা শামুক জাতীয় কোমলাঙ্গ প্রাণীদের উচ্চতম শ্রেণীর সদস্য হচ্ছে সেফ্যালোপডা বা কাট্‌ল্‌ফিশ-রা। এদের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীরা আলাদা আলাদা হয়। কিন্তু আমি যতদূর জানি তাতে এমনকী এদের মধ্যেও আমাদের আলোচনার অন্তর্গত কোনও অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। এটা একটা রীতিমতো বিস্ময়কর ব্যাপার, কেননা এইসব প্রাণীদের অনুভূতির অঙ্গসমূহ অত্যন্ত উন্নত ধরনের হয় এবং বেশ ভালোরকম মানসিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এরা—শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এদের সুকৌশলী প্রয়াস যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা সকলেই এ কথাটা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। তবে এদের কারুর কারুর মধ্যে একটা অস্বাভাবিক যৌন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এদের পুরুষ-প্রাণীরা তাদের একটা হাত বা কর্ষিকা (tentacle) দিয়ে স্ত্রী-প্রাণীদের আঁকড়ে ধরে (যে-হাত বা কর্ষিকাটা তখন খোলা অবস্থায় থাকে), সেই কর্ষিকার চোষক-চাকতিটার সাহায্যে স্ত্রী-প্রাণীদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকে এবং ওই কর্ষিকাটা কিছুক্ষণের জন্য মূল দেহ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা স্বাধীন জীবন যাপন করে আসে। এই বিচ্ছিন্ন কর্ষিকাটাকে একটা সম্পূর্ণ পৃথক প্রাণী বলে মনে হওয়ার জন্যই কুভিয়ের এটাকে এক ধরনের পরজীবী কৃমি হিসেবে চিহ্নিত করে নাম দিয়েছিলেন হেক্‌টোকোটাইল। তবে এদের এই আশ্চর্য ব্যাপারটাকে অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত না-করে মুখ্য যৌন বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত করাই বোধহয় অধিকতর সঙ্গত।

শামুক জাতীয় কোমলাঙ্গ প্রাণীদের মধ্যে যৌন নির্বাচনের অস্তিত্ব লক্ষ করা না

গেলেও বেশ কিছু একপুটক ও দ্বিপুটক শামুকের, যেমন কুণ্ডলাকার শামুক, শাঙ্কবাকার শামুক, অর্ধবৃত্তাকার শামুক ইত্যাদিদের রঙ ও আকৃতি খুব সুন্দর হতে দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রঙটা তাদের আত্মরক্ষার কোনও কাজে লাগে বলে মনে হয় না। নিম্নতম শ্রেণীর প্রাণীদের মতোই এদের এই রঙও খুব সম্ভবত টিস্যু বা কলার প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই দেখা দেয়। আর খোলার আকৃতি ও নির্মিতিটা নির্ভর করে তাদের বৃদ্ধির ধরনের ওপর। আলোর পরিমাণও বোধহয় এর ওপরে কিছুটা প্রভাব ফেলে। যদিও মিঃ গোইন জেফ্রিস বারবারই বলেছেন জলের অনেকটা গভীরে বসবাসকারী কয়েকটি প্রজাতির খোলা খুব উজ্জ্বল বর্ণের হয়, তবুও আমরা সাধারণত এটাই দেখি যে এদের শরীরের নীচের দিকটা এবং আন্ত্রযন্ত্রের ত্বকে ঢাকা পড়ে থাকা অংশগুলো শরীরের ওপরের অংশ ও অনাবৃত অংশের তুলনায় অনুজ্জ্বল রঙের হয়ে থাকে।[১] কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যেমন প্রবাল বা উজ্জ্বল আভাবিশিষ্ট সামুদ্রিক লতাগুল্মের মধ্যে বসবাসকারী শামুক জাতীয় প্রাণীদের শরীরের উজ্জ্বল রঙটা হয়তো তাদের আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে কাজ করে থাকে। কিন্তু নুডিব্রাঞ্চ মল্যাস্কা বা খোলাহীন সামুদ্রিক শামুকদের গায়ের রঙও যে খুব সুন্দর হয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় অ্যাল্ডার এবং হ্যান্‌কক-এর চমৎকার গ্রন্থটির মধ্যে। মিঃ হ্যান্‌কক আমাকে যে-সব তথ্য জানিয়েছেন তা থেকে মনে হয় এই রঙটা তাদের আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে আদৌ কাজ করে না। কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে গায়ের রঙ হয়তো আত্মরক্ষার একটা উপায় হিসেবে কাজ করে থাকে, যেমন সামুদ্রিক শৈবালের সবুজ-সবুজ পাতার মধ্যে বসবাসকারী গাঢ় সবুজ বর্ণবিশিষ্ট একটি প্রজাতির ক্ষেত্রে। কিন্তু অন্য অনেক গাঢ় রঙ বা সাদা রঙ কিংবা অন্য কোনও চমকদার রঙবিশিষ্ট প্রজাতির প্রাণীরা নিজেদের লুকিয়ে রাখার জন্য কোনও আড়াল খোঁজে না। আবার একইরকম চমকদার রঙবিশিষ্ট এবং অনুজ্জ্বল রঙবিশিষ্ট কিছু কিছু প্রজাতির প্রাণীরা পাথরের নীচে বা কোনও অন্ধকার জায়গায় বসবাস করে। অর্থাৎ নুডিব্রাঞ্চ মল্যাস্কা শ্রেণীর এইসব প্রাণীদের বসবাসের জায়গার সঙ্গে তাদের গায়ের রঙের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।

এই খোলাহীন সামুদ্রিক শামুকরা উভলিঙ্গ হলেও ডাঙার শামুকদের মতোই (যাদের মধ্যে অনেকের গায়েই খুব সুন্দর খোলা থাকে) এরাও জোড় বাঁধে। দু'টি উভলিঙ্গ প্রাণী পরস্পরের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে জোড় বাঁধতে পারে এবং এমন সন্তানের জন্ম দিতে পারে যারা তাদের জনক-জননীর সৌন্দর্যের উত্তরাধিকারী হয়—এটা খুব-একটা

১। পর্ণাঙ্গ জাতীয় এক ধরনের প্রলেপ বা আবরণের রঙের ওপর আলোর প্রভাবের একটা বিচিত্র দৃষ্টান্তের কথা অন্যত্র উল্লেখ করেছি আমি ('জিওলজিক্যাল অবজার্ভেশনস অন ভল্‌ক্যানিক আইল্যান্ডস,' পৃঃ ৫৩)। অ্যাসেনশন-এর উপকূলবর্তী পাথরের ওপর সমুদ্রতরঙ্গের ফেনা এসে পড়ে এই প্রলেপ জমা হয় এবং এগুলো গড়ে ওঠে সামুদ্রিক শামুকখোলা চূর্ণের দ্রবণের সাহায্যে।

অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এত নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটা একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া একজোড়া সুন্দরতর উভলিঙ্গ প্রাণীর সন্তানরা একজোড়া কম সুন্দর উভলিঙ্গ প্রাণীর সন্তানদের থেকে সংখ্যায় বেড়ে ওঠার ব্যাপারে কোন্ বিশেষ সুবিধেটা পেতে পারে, সেটাও বুঝে ওঠা দুষ্কর—অধিকতর সৌন্দর্যের সঙ্গে অধিকতর প্রাণশক্তি যুক্ত হলে তবেই তো সংখ্যায় বেড়ে ওঠার ব্যাপারে একটা বাড়তি সুবিধে পাওয়া যেতে পারে। কিছু কিছু পুরুষ-প্রাণী যে স্ত্রী-প্রাণীদের থেকে আগেই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে এবং বেশি প্রাণশক্তিসম্পন্ন স্ত্রী-প্রাণীরা বেশি সৌন্দর্যসম্পন্ন পুরুষ-প্রাণীদের বেছে নেয়, তা সত্যি বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে সে কথাটা প্রযোজ্য নয়। তবে জীবনযাপনের সাধারণ অভ্যাস-আচরণের ব্যাপারে উজ্জ্বল গাত্রবর্ণটা যদি কোনও উভলিঙ্গ প্রাণীর পক্ষে সত্যিই সুবিধেজনক হত, তাহলে ওই উজ্জ্বল গাত্রবর্ণবিশিষ্ট প্রাণীরাই সবথেকে ভালোভাবে টিকে থাকত এবং সংখ্যায় সবথেকে বেশি হয়ে উঠত। তবে বাস্তবে যদি এমনটা ঘটতও, তাহলে সেটা যৌন নির্বাচনের ঘটনা হত না, সেটাকে চিহ্নিত করতে হত প্রাকৃতিক নির্বাচন হিসেবেই।

ভার্মিস উপ-বিভাগ : অ্যানেলিডা (সামুদ্রিক পোকা, কেঁচো ইত্যাদি) শ্রেণী। এই শ্রেণীর স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীরা যে-সব ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা হয়, সেইসব ক্ষেত্রে অনেক সময় এদের বৈশিষ্ট্যগুলোও পরস্পরের থেকে এত আলাদা ধরনের হয় যে তাদের ভিন্ন ভিন্ন বর্গের বা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের পরস্পরের মধ্যেকার এই পার্থক্য সেই গোত্রের নয় যাকে যৌন নির্বাচনের ফল হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। এইসব প্রাণীদের গায়ের রঙ প্রায়শই খুব সুন্দর হয়ে থাকে, কিন্তু এ ব্যাপারে এদের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না বলে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই। এমনকী অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর নেমেরশিয়ান-রাও (ফিতা-কৃমি জাতীয়) 'সৌন্দর্যে এবং রঙের বৈচিত্র্য অমেরুদণ্ডী শ্রেণীর যে-কোনও প্রাণীর সমকক্ষ।' কথাটা বলেছেন ডাঃ ম্যাকিনটশ, কিন্তু এ-কথা বলা সত্ত্বেও এদের এই গাত্রবর্ণের বিশেষ কোনও উপযোগিতা খুঁজে পাননি তিনি। মঁসিয়ে কাত্রেফাজ বলেছেন যে প্রজননের পর্যায়টা অতিক্রম করার পর একই জায়গায় থাকতে অভ্যস্ত সামুদ্রিক কেঁচো জাতীয় প্রাণীদের গায়ের রঙ অনেকটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। আমার ধারণা ওই সময় তাদের প্রাণশক্তির অভাবের দরুনই এটা ঘটে থাকে। কেঁচো জাতীয় এইসব প্রাণীদের উভয় লিঙ্গের সদস্যরাই এত নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী যে তাদের পক্ষে নিজেদের সঙ্গী বা সঙ্গিনী হিসেবে বিশেষ কাউকে বেছে নেওয়া কিংবা একই লিঙ্গের প্রাণীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে লড়াই করা একেবারেই অসম্ভব।

আর্থ্রোপডা (কাঁকড়া, কীটপতঙ্গ, মাকড়সা ইত্যাদি জাতীয়) উপ-বিভাগ : কঠিন

খোলাযুক্ত প্রাণীদের শ্রেণী। এই বিরাট শ্রেণীটার মধ্যেই অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট নজির প্রথম চোখে পড়ে আমাদের, যে-বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায়শই খুব বিচিত্রভাবে গড়ে ওঠে। দুর্ভাগ্যবশত এই কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের বিভিন্ন অভ্যাস-আচরণের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই সীমিত। এদের উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের শরীরে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যস্বরূপ এমন অনেক অঙ্গ আছে যেগুলোর কাজ বা উপযোগিতার ব্যাখ্যা দেওয়ার মতো জ্ঞান আমাদের নেই। নিম্নতর শ্রেণীর পরজীবী প্রজাতির প্রাণীদের ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রাণীরা আকারে তুলনামূলকভাবে ছোট হয় এবং শুধু তাদের শরীরেই থাকে যথাযথ সন্তরণ-পা, শুঙ্গ ও বিভিন্ন অনুভূতি-ইন্দ্রিয়। স্ত্রী-প্রাণীদের এইসব অঙ্গ থাকে না বলে তাদের শরীরটা প্রায়শই স্রেফ একটা বিকৃত পিণ্ডের চেহারা নেয়। কিন্তু এদের উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে এই অস্বাভাবিক পার্থক্যের কারণটা নিঃসন্দেহে তাদের জীবনযাপনের অভ্যাস-আচরণের ব্যাপক পার্থক্যের মধ্যেই নিহিত থাকে, ফলে আমাদের আলোচনার পক্ষে বিষয়টার তেমন কোনও তাৎপর্য থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন বর্গের বিভিন্ন কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের সামনের শুঙ্গটিতে প্যাঁচালো সুতোর মতো বিচিত্র কিছু অংশ থাকে। অনেকের মতে এগুলো তাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় হিসেবে কাজ করে। স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে এই প্যাঁচালো সুতোর মতো অংশগুলো সংখ্যায় অনেক বেশি থাকে। পুরুষ-প্রাণীদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কোনও অস্বাভাবিক বিকাশ ঘটে না অথচ আগে অথবা পরে স্ত্রী-প্রাণীদের খুঁজে বার করতে তারা ঠিকই সমর্থ হয়। এ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে ঘ্রাণের সঙ্গে যুক্ত ওই প্যাঁচালো অংশগুলো স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের শরীরে বেশি সংখ্যায় থাকার পেছনে যৌন নির্বাচনই সক্রিয় থেকেছে, যৌন নির্বাচন মারফতই এগুলো বেশি সংখ্যায় অর্জন করেছে তারা এবং যে-সব পুরুষ-প্রাণীদের শরীরে এগুলো উৎকৃষ্টতর অবস্থায় থেকেছে তারা সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে অন্যদের থেকে বেশি সফল হয়েছে এবং বেশি সংখ্যক সন্তানের জন্ম দিতেও সক্ষম হয়েছে। টানাই-দের আলাদা আলাদা স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণী বিশিষ্ট একটি বিচিত্র প্রজাতির কথা উল্লেখ করেছেন ফ্রিৎজ্ মুলার। এদের মধ্যে দু'ধরনের পুরুষ থাকে এবং এই দু' ধরনের পুরুষরা কখনোই তাদের বিপরীত ধরনের পুরুষদের বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করতে পারে না। প্রথম ধরনের পুরুষ-প্রাণীদের শরীরে ঘ্রাণ সংক্রান্ত ওই প্যাঁচালো অংশগুলো অনেক বেশি সংখ্যায় থাকে, আর দ্বিতীয় ধরনের পুরুষদের শরীরে থাকে বেশি শক্তিশালী ও বেশি লম্বা দাঁড়া যার সাহায্যে তারা স্ত্রী-প্রাণীদের ভালোভাবে আঁকড়ে ধরতে সক্ষম হয়। একই প্রজাতির দু'ধরনের পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যেকার এই পার্থক্যের উৎস খুঁজতে গিয়ে ফ্রিৎজ্ মুলার বলেছেন যে হয়তো একসময় এদের কিছু কিছু পুরুষ-প্রাণীর মধ্যে ওই ঘ্রাণ-সংক্রান্ত প্যাঁচালো অংশগুলোর সংখ্যায়

পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল আর অন্য কিছু পুরুষ-প্রাণীর পরিবর্তনটা দেখা দিয়েছিল দাঁড়ার আকৃতি ও মাপের ক্ষেত্রে ; প্রথমোক্তদের মধ্যে যারা স্ত্রী-প্রাণীদের খুঁজে বার করতে সবথেকে বেশি সক্ষম হয়েছিল এবং শেষোক্তদের মধ্যে যারা স্ত্রী-প্রাণীদের সবথেকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরতে সক্ষম হয়েছিল, তারাই তাদের নিজ নিজ সুবিধার উত্তরাধিকারী হিসেবে সবথেকে বেশি সংখ্যক বংশধর রেখে যেতে পেরেছিল।[২]

নিম্নশ্রেণীর কিছু কিছু কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের পুরুষদের সামনের ডানদিকের শুঙ্গটার আকৃতি বাঁদিকের শুঙ্গটার থেকে অনেকটাই অন্যরকম হয়। এদের এই সামনের বাঁদিকের শুঙ্গেরগ্রন্থিগুলো ক্রমশ সরু হয়ে যায় এবং এই ব্যাপারে স্ত্রী-প্রাণীদের শুঙ্গের সঙ্গে এদের এই শুঙ্গগুলোর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকে। পুরুষ-প্রাণীদের পরিবর্তিত শুঙ্গগুলো হয় মধ্যভাগে স্ফীত হয় কিংবা কৌণিকভাবে বাঁকা হয় অথবা খুব সুন্দর এবং কখনও-কখনও আশ্চর্যরকম জটিল একটি আঁকড়ে-ধরার অঙ্গে পরিণত হয় (৪নং ছবি)। স্যর জে. লুবক আমাকে জানিয়েছেন যে স্ত্রী-প্রাণীদের আঁকড়ে ধরার জন্য এই

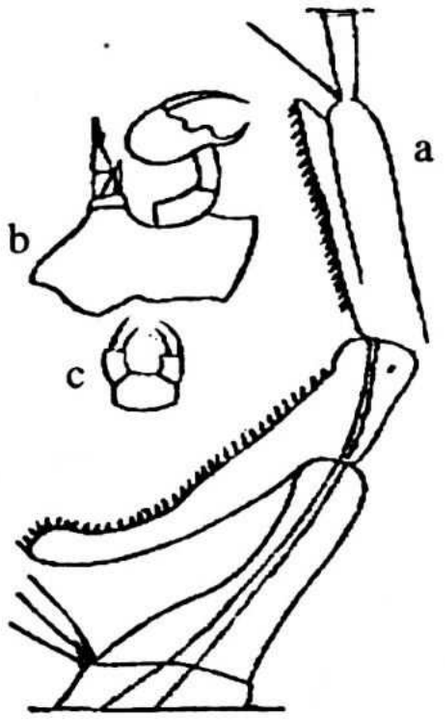

১নং ছবি—ল্যাবিডোসেরা ডারউইনি (লুবক-এর গ্রন্থ থেকে)।

a. পুরুষ-প্রাণীর সামনের ডানদিকের শুঙ্গের অংশবিশেষ যা একটা আঁকড়ে ধরার অঙ্গের রূপ নেয়। b. পুরুষ-প্রাণীর বুকের কাছ থেকে উদ্গত পায়ের পিছনের জোড়া। c. ঐ, স্ত্রী-প্রাণীর।

২। 'ফ্যাক্টস অ্যান্ড আর্গুমেন্টস ফর ডারউইন,' ইংরেজি অনুবাদ, পৃঃ ২০। ঘ্রাণসংক্রান্ত প্যাঁচালো অংশ বিষয়ে পূর্ববর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য। পন্টোনোরিয়া অ্যাফিনিস নামক নরওয়ের এক ধরনের কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের ব্যাপারে অনেকটা এই ধরনের একটা ঘটনার কথা সার্স উল্লেখ করেছেন ('নেচার', ১৮৭০, পৃঃ ৪৫৫-তে উদ্ধৃত)।

অঙ্গটাকে কাজে লাগায় তারা এবং ঠিক এই প্রয়োজনের জন্যই তাদের শরীরের ওই দিকের দুটো পিছনের পায়ের মধ্যে একটা পা (b) সাঁড়াশির মতো রূপ নেয়। এদের আর-একটা বর্গের শুধুমাত্র পুরুষ-প্রাণীদের শরীরেই নীচের বা পিছনের শুঙ্গগুলো 'অদ্ভুতরকম সর্পিল ধরনের' হয়ে থাকে।

উচ্চশ্রেণীর কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের সামনের পা-গুলো দাঁড়ায় রূপান্তরিত হয় এবং স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের এই দাঁড়াগুলো আকারে বড় হয়। মিঃ সি. স্পেন্স বেট জানিয়েছেন—স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের দাঁড়াগুলো এতই বড় হয় যে মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত পুরুষ-কাঁকড়াদের (Cancer pagurus) বাজারদার স্ত্রী-কাঁকড়াদের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি হয়ে থাকে। এদের অনেক প্রজাতির মধ্যে শরীরের দু'দিকের দাঁড়াগুলো সমান মাপের হয় না। মিঃ বেট আমাকে জানিয়েছেন যে সব ক্ষেত্রে না হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডানদিকের দাঁড়াগুলোই বেশি বড় মাপের হয়ে থাকে। দাঁড়ার মাপের এই অসমতাটাও স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে অনেক বেশি হতে দেখা যায়। আবার পুরুষ-প্রাণীদের দু'টো দাঁড়ার মধ্যেও আকারের তারতম্য থাকে (২, ৩, ৪নং ছবি) এবং ছোট দাঁড়াটির সঙ্গে স্ত্রী-প্রাণীদের দাঁড়ার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে দাঁড়ার মাপে বেশি তারতম্য থাকার দরুন তাদের কী সুবিধা হয় এবং যে-সব

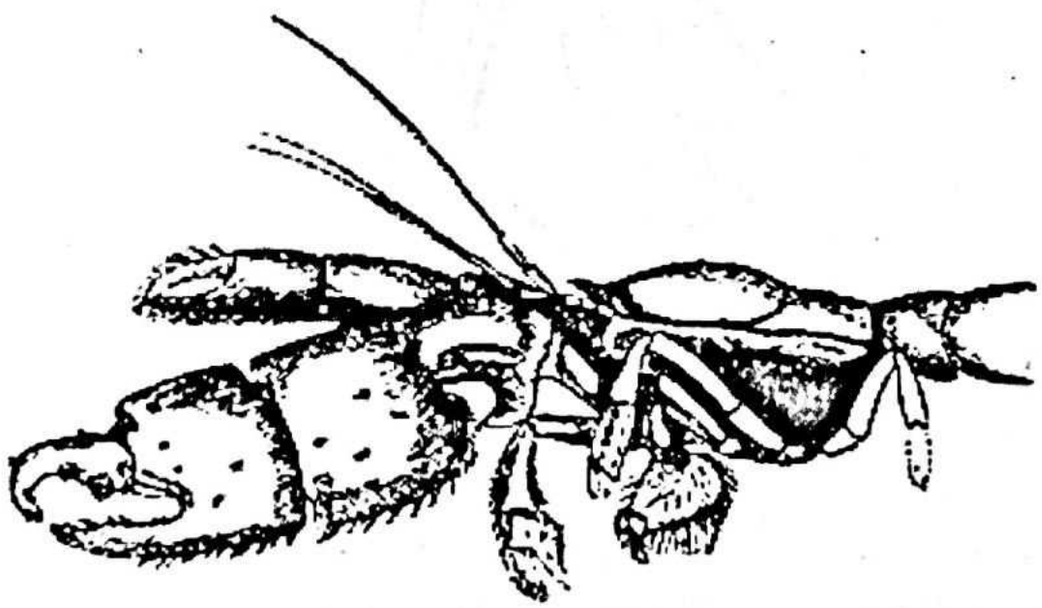

২নং ছবি—ক্যালিয়ানাসা-র শরীরের সামনের অংশ (মিল্‌নে-এডওয়ার্ডস-এর গ্রন্থ থেকে)। পুরুষ-প্রাণীর ডানদিকের ও বাঁদিকের দাঁড়ার অসমতা ও পৃথক গঠনকাঠামোটা দেখানো হয়েছে এখানে।*

[*সংশোধনী : চিত্রশিল্পী এখানে ছবিটা ভুলবশত উলটো করে এঁকেছেন এবং বাঁদিকের দাঁড়াটাকে বড় করে দেখিয়েছেন।]

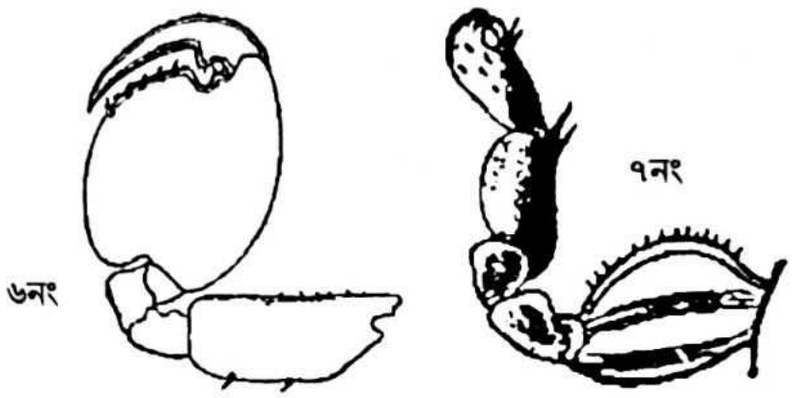

৩নং ছবি—অর্কেসটিয়া টিউকারেটিংগা-দের পুরুষ প্রাণীর দ্বিতীয় পা (ফ্রিৎজ্ মুলার-এর গ্রন্থ থেকে)।
৭নং ছবি—ওই, স্ত্রী-প্রাণীর।

ক্ষেত্রে দাঁড়ার মাপে কোনও তারতম্য থাকে না সেইসব ক্ষেত্রেও কেন স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের দাঁড়াগুলো আকারে বড় হয়, তার উত্তর আমাদের জানা নেই। মিঃ বেট আমাকে জানিয়েছেন—এদের এই দাঁড়াগুলো অনেক সময় এমন দৈর্ঘ্যের ও এমন মাপের হয় যে তা দিয়ে মুখের কাছে খাদ্যবস্তু তুলে আনার কাজটা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। মিষ্টি জলে বসবাসকারী কয়েক ধরনের চিংড়ি মাছের (Palaemno) পুরুষ-প্রাণীদের ডান পা-টা তাদের গোটা শরীরটার থেকেই আকারে দীর্ঘতর হয়। দাঁড়া সমেত একটা পা আকারে খুব বড় হলে সেটা হয়তো পুরুষ-প্রাণীদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াইয়ের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু স্ত্রী-প্রাণীদের ক্ষেত্রে শরীরের দু'দিকের দাঁড়াগুলোর মাপ কেন অসম হয় তার কারণটাকে এই যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। মিল্‌নে-এডওয়ার্ডস কর্তৃক উদ্ধৃত একটি বিবৃতি থেকে জানা যায় যে গেলাসিমাস-দের স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীরা একই গর্তে বসবাস করে, অর্থাৎ তারা জোড় বাঁধে। গর্তের মুখটা পুরুষ-গেলাসিমাসরা তাদের একটা বিশাল মাপের দাঁড়া দিয়ে বন্ধ করে দেয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দাঁড়াটা অপ্রত্যক্ষভাবে হলেও তাদের আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে কাজ করে। তবে খুব সম্ভবত দাঁড়ার মূল কাজ হল স্ত্রী-প্রাণীদের আয়ত্তে আনা ও আঁকড়ে ধরা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর প্রমাণও পাওয়া গেছে, যেমন গ্যামারাস-দের ক্ষেত্রে। সন্ন্যাসী-কাঁকড়া বা সৈনিক-কাঁকড়াদের (Pagurus) মধ্যে একটা বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ করা যায়। এদের স্ত্রী-প্রাণীরা যে-খোলাটার মধ্যে বাস করে সেই খোলাটাকে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে বহন করে চলে পুরুষ-প্রাণীরা। তবে মিঃ বেটস আমাকে জানিয়েছেন যে বেলাভূমির সাধারণ কাঁকড়াদের (Carcinus moenas) যৌনমিলনটা অন্যভাবে ঘটে। এই মিলনটা ঘটে এদের স্ত্রী-প্রাণীরা তাদের শক্ত খোলাটা পরিত্যাগ করার ঠিক পরেই। সেই সময় এদের স্ত্রী-প্রাণীদের শরীরটা এত নরম থাকে যে পুরুষদের শক্তিশালী দাঁড়ার চাপে তারা রীতিমতো আহত হতে পারে। বাস্তবে কিন্তু তা হয় না, কারণ এরা নিজেদের

খোলাটা পরিত্যাগ করার আগে পুরুষরা এদের আয়ত্তে আনে ও বহন করে নিয়ে যায়, এবং তার ফলেই স্ত্রী-প্রাণীদের কোনওরকম আঘাত না দিয়েই আঁকড়ে ধরতে পারে তারা।

ফ্রিৎজ্ মুলার বলেছেন যে অন্য যাবতীয় উভচর প্রাণীদের থেকে মেলিটা-দের কয়েকটি প্রজাতির প্রাণীদের একটা বিশেষ পার্থক্য থাকে। এদের স্ত্রী-প্রাণীদের 'শেষ জোড়ার ঠিক আগের জোড়া পায়ের নীচের দিকের পাতলা স্তরটা (Coxal lamellae) অনেকটা বঁড়শির মতো হয়ে বেরিয়ে থাকে এবং পুরুষ-প্রাণীরা তাদের প্রথম পা-জোড়া

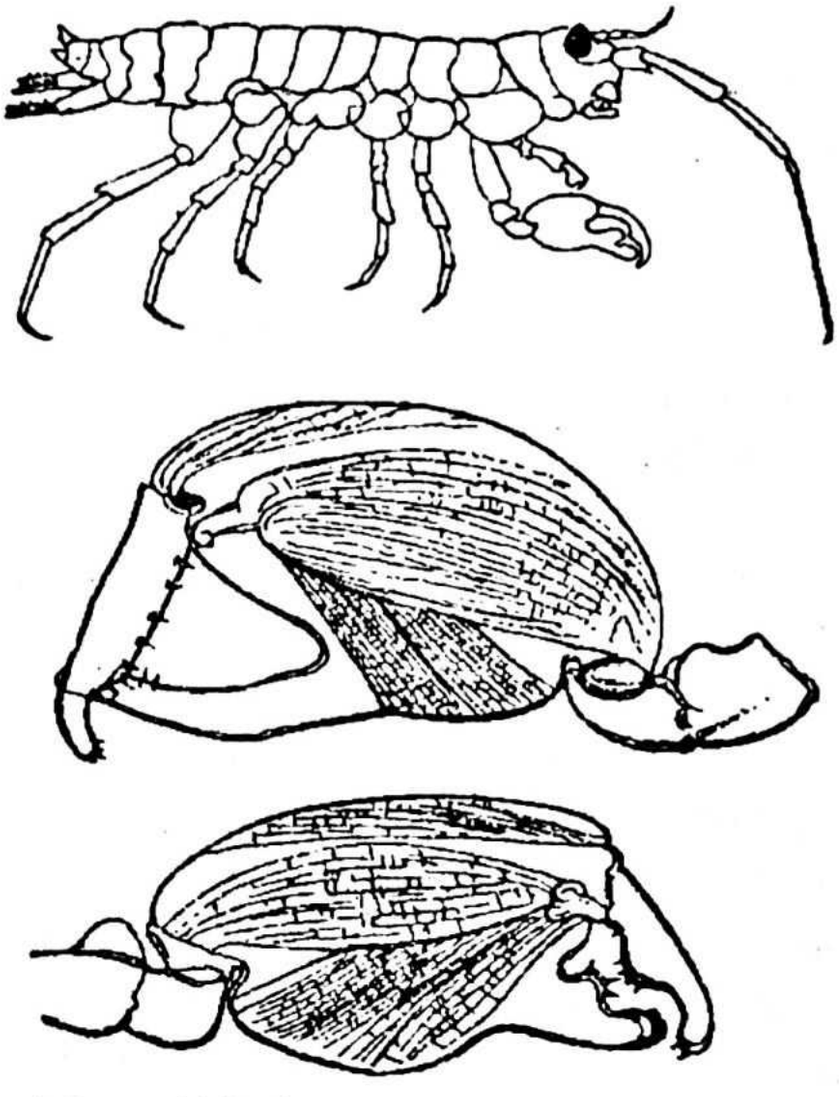

৪নং ছবি—অর্কেসটিয়া ডারউইনি (ফ্রিৎজ্ মুলার-এর গ্রন্থ থেকে)।
এখানে দু'ধরনের পুরুষদের দাঁড়ার গঠনকাঠামোর পার্থক্যটা দেখানো হয়েছে।

দিয়ে ওই জায়গাটা আঁকড়ে ধরে।' এই বঁড়শির মতো ব্যাপারটা খুব সম্ভবত সেইসব স্ত্রী-প্রাণীদের থেকেই প্রথম গড়ে উঠেছিল যাদের জননপ্রক্রিয়ার সময় সবথেকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরতে পেরেছিল পুরুষ-প্রাণীরা এবং তার ফলে ওইসব স্ত্রী-প্রাণীরাই সর্বাধিক সংখ্যক সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিল। আর-এক ধরনের

ব্রাজিলীয় উভচর প্রাণীদের (Orchestia Darwinnii, ৮নং ছবি) মধ্যেও ঠিক টানাই-দের মতোই এক ধরনের দ্বিরূপতা লক্ষ করা যায়। এদের পুরুষরা দু' ধরনের হয়, একজনদের সঙ্গে অপরজনদের পার্থক্যটা থাকে দাঁড়ার গঠনে। দু'জনদের দাঁড়াই স্ত্রী-প্রাণীদের আঁকড়ে ধরতে সক্ষম (কারণ এই দু' ধরনের দাঁড়াই এখন এই কাজটার জন্য ব্যবহৃত হয়), তবে খুব সম্ভবত কিছু কিছু পুরুষ-প্রাণীর পরিবর্তনটা যেভাবে ঘটেছিল অন্যদের পরিবর্তনটা ঠিক সেভাবে ঘটেনি, আর তার ফলেই পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে এই দু'টি পৃথক রূপ সৃষ্টি হয়েছিল। এই দু' ধরনের পুরুষ-প্রাণীরা তাদের আলাদা ধরনের দাঁড়ার দরুন কিছু কিছু বিশেষ সুবিধা অর্জন করেছিল—তবে গুরুত্বের বিচারে এই সুবিধাগুলো প্রায় একই ধরনের ছিল।

কঠিন খোলাযুক্ত পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের দখল করার জন্য নিজেদের মধ্যে লড়াই করে কিনা তা আমাদের জানা নেই, তবে খুব সম্ভবত এ ধরনের লড়াই তাদের মধ্যে ঘটে থাকে। কারণ যে-সব প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রী-প্রাণীদের থেকে পুরুষ-প্রাণীরা আকারে বড় হয়, সেইসব ক্ষেত্রে এই বড় আকারটা অধিকাংশ সময়েই তারা লাভ করে তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে, অর্থাৎ বহু প্রজন্ম ধরে তাদের পূর্বপুরুষরা অন্য পুরুষ-প্রাণীদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত থাকার ফল হিসেবেই এই বড় আকারটা ধীরে ধীরে অর্জন করেছে তারা। বেশিরভাগ বর্গের মধ্যেই, বিশেষত সর্বোচ্চ বর্গ বা ব্র্যাকিউরা-দের মধ্যে পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের চেয়ে আকারে বড় হয়। তবে পরজীবী বর্গের প্রাণীরা, যাদের স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীদের অভ্যাস-আচরণ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়, তাদের ক্ষেত্রে এবং অধিকাংশ এনটোমসট্রাকা-দের (Entomostraca—কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের একটি শ্রেণী) ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের অনেকের ক্ষেত্রেই দাঁড়াগুলো শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অস্ত্র হিসেবে বেশ ভালোভাবেই অভিযোজিত হয়ে উঠেছে। মিঃ বেট-এর এক পুত্র একবার একটি ডেভিল-ক্র্যাব বা শয়তান-কাঁকড়াকে (Portunus puber) একটি কারসিনাস মিনাস-এর (Carcinus moenas) সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে দেখেছিল। লড়াই শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষোক্ত কাঁকড়াটি পরাজিত হয়ে উল্টে পড়ে এবং তার প্রতিটি অঙ্গ শরীর থেকে ছিঁড়ে আলাদা হয়ে যায়। ফ্রিৎজ্ মুলার একবার ব্রাজিলীয় গেলাসিমাস প্রজাতির (যাদের শরীরে বিশাল বিশাল দাঁড়া থাকে) কয়েকটি পুরুষ-প্রাণীকে একটা কাচের পাত্রে রেখে তাদের পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাতে দেখা গিয়েছিল ওই পুরুষ-প্রাণীরা পরস্পরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ছিঁড়তে শুরু করছে এবং একে অপরকে হত্যা করছে। মিঃ বেট একবার কারসিনাস মিনাস প্রজাতির একটি বড় আকারের পুরুষ-প্রাণীকে একটা জলভরা পাত্রের মধ্যে রেখে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ওই পাত্রটিতে আগে

থেকেই ওই প্রজাতির একটি স্ত্রী-প্রাণী এবং তার সঙ্গী হিসেবে একটি ছোট আকারের পুরুষ-প্রাণী ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট মাপের পুরুষটি হঠে যায় এবং বড় মাপের পুরুষটি স্ত্রী-প্রাণীটিকে দখল করে নেয়। মিঃ বেট বলেছেন, 'তাদের মধ্যে যদি কোনও লড়াই হয়ে থাকে তাহলে সে-লড়াইটা ছিল একেবারেই রক্তপাতহীন, কারণ তাদের কারুর গায়েই কোনও আঘাতের চিহ্ন চোখে পড়েনি আমার।' এই প্রাণিবিজ্ঞানীটিই একবার গ্যামারাস ম্যারিনাস (Gammarus marinus—আমাদের সমুদ্রোপকূলে যাদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়) প্রজাতির একটি পুরুষ আর একটি স্ত্রী-প্রাণীর ওপরে একটা পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এই প্রজাতিরই বেশ কিছু প্রাণীর সঙ্গে ওই দু'টি পুরুষ আর স্ত্রী-প্রাণীও প্রথমে একই পাত্রে ছিল এবং তারা ছিল পরস্পরের সঙ্গী। মিঃ বেট পুরুষ-প্রাণীটিকে ওই পাত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে এদের দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। বিচ্ছিন্ন হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই স্ত্রী-প্রাণীটি ওই পাত্রের অন্য প্রাণীদের সঙ্গে যোগ দেয়। কিছুক্ষণ পরে মিঃ বেট পুরুষ-প্রাণীটিকে আবার ওই পাত্রে ছেড়ে দেন। প্রথমটায় পুরুষ-প্রাণীটি ইতস্তত কিছুটা সাঁতার কাটে, তারপর সোঁ করে ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং কোনওরকম লড়াই-টড়াই ছাড়াই নিজের স্ত্রীকে নিয়ে অন্যদিকে সরে যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে প্রাণিজগতের নিম্ন স্তরে থাকা অ্যাম্ফিপডা-দের মধ্যে স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীরা একে অপরকে চিনতে পারে এবং তারা পরস্পরের প্রতি আসক্তও হয়।

কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতা যতটা থাকা সম্ভব বলে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, বাস্তবে তাদের মানসিক ক্ষমতা সম্ভবত তার চেয়ে বেশিই থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উপকূল অঞ্চলে যে-সব কাঁকড়াদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়, তাদের ধরার চেষ্টা করলে যে-কেউই বুঝতে পারবেন কতখানি সতর্ক আর হুঁশিয়ার থাকে তারা। প্রবালদ্বীপে এক ধরনের বড় মাপের কাঁকড়া (Birgus latro) পাওয়া যায় যারা একটা গভীর গর্তের নীচে নারকেল গাছের ফেঁসো দিয়ে পুরু একটা গদি তৈরি করে। গাছ থেকে খসে পড়া নারকেলের খোলার ছোবড়াগুলো একটু-একটু করে ছিঁড়ে ফেলে ভেতরের শাঁসটা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এরা। এই ছেঁড়ার কাজটা এরা শুরু করে নারকেলের নীচের দিকে চোখের মতো দেখতে যে-তিনটে গর্ত থাকে সেইখান থেকে। তারপর ওই গর্তগুলোর একটায় সামনের ভারী দাঁড়া দিয়ে ঠুকে ঠুকে সেখানটা ভেঙে ফেলে, ভেঙে ফেলে উল্টোদিকে ঘুরে গিয়ে পেছনের সরু দাঁড়াগুলো দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ভেতরের শাঁসটা বার করে নেয়। তবে খুব সম্ভবত এই ধরনের কাজ করার ক্ষমতাটা সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবেই অর্জন করে থাকে এরা আর তার ফলে অল্পবয়সী প্রাণীরা ও বেশি বয়সী প্রাণীরা একইরকম দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে এই কাজগুলো। তবে নিম্নলিখিত ঘটনাটা অবশ্য

এই বক্তব্যের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়। মিঃ গার্ডনার নামক জনৈক নির্ভরযোগ্য প্রাণিবিজ্ঞানী একবার উপকূল অঞ্চলের একটি কাঁকড়াকে (Gelasimus) পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। কাঁকড়াটা তখন নিজের বসবাসের গর্তটা তৈরি করছিল। সেই গর্তটার দিকে মিঃ গার্ডনার কয়েকটা শামুকের খোলা ছুড়ে দেন। একটা খোলা গড়িয়ে গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়ে, বাকি তিনটি গর্তের মুখের কয়েক ইঞ্চি দূরে রয়ে যায়। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই গর্তের মধ্যে পড়া খোলাটাকে কাঁকড়াটা টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসে এবং প্রায় এক ফুট দূরে রেখে আসে সেটাকে। এইসময় গর্তের কাছে পড়ে থাকা বাকি খোলা তিনটি দেখতে পায় সে, দেখার পর বোধহয় ভেবে নেয় যে ওগুলোও গর্তের মধ্যে গড়িয়ে পড়তে পারে, অতঃপর এই তিনটি খোলাকেও টেনে নিয়ে গিয়ে প্রথম খোলাটার কাছে রেখে আসে সে। মানুষ যেভাবে যুক্তির সাহায্যে কোনও কাজ করে, তার সঙ্গে একটা কাঁকড়ার দ্বারা সম্পাদিত এই কাজটার পার্থক্য নির্ণয় করা সত্যিই দুরূহ।

উচ্চতর শ্রেণীর প্রাণীদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে গাত্রবর্ণের পার্থক্যটা প্রায়শই লক্ষ করা যায়। কিন্তু আমাদের ইংল্যান্ডের কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে গাত্রবর্ণের ব্যাপারে কোনও সুস্পষ্ট পার্থক্য মিঃ বেট-এর নজরে পড়েনি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এদের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের গায়ের ছোপে বা আভায় সামান্য পার্থক্য দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু মিঃ বেট-এর মতে জীবনযাপনের আচরণগত কিছু পার্থক্যের দরুনই সেটা ঘটে থাকে—যেমন পুরুষ-প্রাণীদের বেশি ঘোরাঘুরি করতে হয় বলে তাদের চামড়ায় রোদ বা আলোর প্রভাবটাও একটু বেশিই পড়ে। মরিশাসে বসবাসকারী বেশ কিছু প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষের প্রাণীদের মধ্যেকার পার্থক্যটা গায়ের রঙ দিয়ে নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছিলেন ডঃ পাওয়ার, কিন্তু শুধুমাত্র একটা প্রজাতির ক্ষেত্রে ছাড়া বাকি কোনও প্রজাতির ক্ষেত্রেই স্ত্রী-পুরুষের গায়ের রঙে কোনও পার্থক্য খুঁজে পাননি তিনি। এই প্রজাতিটি ছিল স্কুইলা-দের একটি প্রজাতি, খুব সম্ভবত এস. স্টাইলিফেরা, যাদের পুরুষ-প্রাণীরা 'চমৎকার নীলচে-সবুজ রঙের' হয় এবং কয়েকটি উপাঙ্গ চেরির মতো লাল রঙের হয়, অন্যদিকে স্ত্রী-প্রাণীদের গায়ের রঙ হয় বাদামি ও ধূসর বর্ণের, 'আর তাদের বিভিন্ন উপাঙ্গের লাল রঙটা পুরুষ-প্রাণীদের চেয়ে কিছুটা ফিকে হয়ে থাকে।' এক্ষেত্রে গাত্রবর্ণের এই পার্থক্যটা যৌন নির্বাচনের ফলেই ঘটেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। একটা ত্রিপার্শ্ব কাচের (prism) সাহায্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা একটা পাত্রের মধ্যে কিছু ড্যাফ্‌নিয়া-কে রেখে মিঃ বার্ট যে-পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন, তা থেকে বোঝা গিয়েছিল যে একেবারে নিম্নতম শ্রেণীর কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীরাও বিভিন্ন রঙের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সূক্ষ্ম স্যাফাইরিনা-দের (এনট্রোমসট্রাকা বর্গের একটি সামুদ্রিক প্রজাতি) ক্ষেত্রে

পুরুষদের অতি ক্ষুদ্র কিছু আবরণী বা কোষতুল্য অংশ থাকে যা থেকে চমৎকার রঙ ঠিকরে পড়ে এবং প্রায়ই এই রঙগুলোর পরিবর্তনও ঘটে। স্ত্রী-প্রাণীদের শরীরে এ-রকম কোনও আবরণী বা কোষতুল্য অংশ থাকে না এবং এই বর্গের একটি প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের শরীরেই এ-রকম আবরণী বা কোষতুল্য অংশ অনুপস্থিত থাকে। তবে এ থেকে এমন সিদ্ধান্ত করে বসাটা নিতান্তই হঠকারিতা হবে যে পুরুষ-প্রাণীদের শরীরের এই বিচিত্র উপাদানগুলো স্ত্রী-প্রাণীদের তাদের দিকে আকৃষ্ট করতে সাহায্য করে। ফ্রিৎজ্ মুলার আমাকে জানিয়েছেন যে গেলাসিমাস-দের একটি ব্রাজিলীয় প্রজাতির স্ত্রী-প্রাণীদের গোটা শরীরটাই ধূসর-বাদামি রঙের হয়। এদের পুরুষ-প্রাণীদের মাথা-বুকের পিছনদিকটা হয় একেবারে সাদা রঙের আর সামনের দিকটা গাঢ় সবুজ এবং তাতে গাঢ় বাদামি রঙের আভা থাকে। এই রঙগুলো কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর পালটে যায়—সাদাটা হয়ে ওঠে ফ্যাকাশে-ধূসর, এমনকী কখনও কখনও কালোও, আর সবুজ রঙের 'ঔজ্জ্বল্যটা অনেকখানিই কমে যায়।' এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার বিশেষ লক্ষণীয়—পরিণত হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত পুরুষ-প্রাণীরা তাদের গায়ের ওই উজ্জ্বল রঙটা অর্জন করতে পারে না। স্ত্রী-প্রাণীদের চেয়ে সংখ্যায় পুরুষ-প্রাণী অনেক বেশি থাকে এবং স্ত্রী-প্রাণীদের চেয়ে তাদের দাঁড়াও আকারে বড় হয়। এই বর্গের কয়েকটি প্রজাতির মধ্যে, কিংবা সম্ভবত সব প্রজাতির মধ্যেই, স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীরা জোড় বাঁধে এবং একই গর্তে বসবাস করে। তাছাড়া আমরা আগেই দেখেছি যে এরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী। এই সমস্ত তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ করে আমাদের মনে হয় যে স্ত্রী-প্রাণীদের আকৃষ্ট করা বা উত্তেজিত করার জন্যই হয়তো এই প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীরা তাদের শরীরের উজ্জ্বল চাকচিক্যগুলো অর্জন করেছিল।

আমরা এইমাত্রই বলেছি যে পরিণত এবং প্রায় প্রজননক্ষম হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত পুরুষ-গেলাসিমাস-রা তাদের গায়ের উজ্জ্বল রঙটা অর্জন করতে পারে না। এদের সমগ্র শ্রেণীটার মধ্যেই স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীদের গঠনকাঠামোর বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটাকে একটা সাধারণ নিয়ম হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। পরে আমরা দেখব যে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিশাল উপ-বিভাগটির সর্বক্ষেত্রেও এই একই সাধারণ নিয়ম ক্রিয়াশীল থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই নিয়মটা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেইসব বৈশিষ্ট্যগুলোর ক্ষেত্রেই যে-বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জিত হয় যৌন নির্বাচন মারফত। এই নিয়মের কয়েকটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করেছেন ফ্রিৎজ্ মুলার। যেমন, পুরুষ বেলে-ফড়িংরা (Orchestia) প্রায় পুরোপুরি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত তাদের বড় বড় রমণিকাগুলো (Claspers) অর্জন করতে পারে না এবং এদের এই রমণিকাগুলোর গঠনকাঠামো স্ত্রী-প্রাণীদের রমণিকার চেয়ে

অনেকটাই অন্যরকম হয়। অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদের রমণিকাগুলো কিন্তু ঠিক স্ত্রী-প্রাণীদের রমণিকার মতোই হয়ে থাকে।

ঊর্ণনাভ (Arachnida) শ্রেণী (মাকড়সা জাতীয়)। এই শ্রেণীর স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে সাধারণত গাত্রবর্ণের তেমন কোনও পার্থক্য থাকে না, তবে স্ত্রী-প্রাণীদের চেয়ে পুরুষ-প্রাণীদের গায়ের রঙ প্রায়শই একটু বেশি গাঢ় হয়ে থাকে (মিঃ ব্ল্যাকওয়াল-এর চমৎকার রচনাটিতে যার নজির পাওয়া যায়)। তবে এদের কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে অবশ্য স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের গাত্রবর্ণের মধ্যে বেশ সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকতে দেখা যায়। যেমন, স্প্যারাসাস স্ম্যার‍্যাগ্‌ডালাস প্রজাতির স্ত্রী-প্রাণীদের গায়ের রঙ ফিকে সবুজ হয়, অন্যদিকে এদের পুরুষ-প্রাণীদের পেটের কাছটা হালকা হলুদ রঙের হয় এবং তার ওপরে গাঢ় লাল রঙের তিনটি লম্বালম্বি ডোরা থাকে। থোমিসাস-দের কয়েকটি প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের গায়ের রঙ প্রায় একইরকম হয়, আবার অন্য কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে এদের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের গায়ের রঙে বিপুল পার্থক্য থাকে। অন্য আরও অনেক বর্গের প্রাণীদের মধ্যেও এই একই ঘটনা লক্ষ করা যায়। কোনও-একটি প্রজাতি যে-বর্গের অন্তর্গত, সেই বর্গের সাধারণ গাত্রবর্ণ থেকে ওই বিশেষ প্রজাতিটির কোন্ লিঙ্গের প্রাণীদের গাত্রবর্ণের পার্থক্যটা বেশি, স্ত্রী-প্রাণীদের না পুরুষ-প্রাণীদের, তা নিশ্চিতভাবে বলা প্রায়শই খুব দুরূহ হয়ে ওঠে। তবে মিঃ ব্ল্যাকওয়াল-এর মতে এই পার্থক্যটা সাধারণত পুরুষদের ক্ষেত্রেই বেশি মাত্রায় দেখা যায়। কানেস্ত্রিনি বলেছেন যে কয়েকটি বর্গের পুরুষ-প্রাণীদের খুব সহজেই চিনে নেওয়া যায়, কিন্তু স্ত্রী-প্রাণীদের চিনতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। মিঃ ব্ল্যাকওয়াল আমাকে জানিয়েছেন যে অল্পবয়সে এদের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের দেখতে অনেকটা একইরকম হয় এবং প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনের সময় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই গাত্রবর্ণের প্রচুর পরিবর্তন ঘটে। আবার অন্যান্য অনেক প্রজাতির মধ্যে গাত্রবর্ণের পরিবর্তনটা শুধুমাত্র পুরুষ-প্রাণীদের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। উপরোক্ত উজ্জ্বল রঙবিশিষ্ট পুরুষ-স্প্যারাসাসদের দেখতে অল্পবয়সে ঠিক স্ত্রী-প্রাণীদের মতোই হয় এবং পূর্ণবয়স্ক হয়ে ওঠার কাছাকাছি সময় নাগাদ তারা তাদের বিচিত্র গাত্রবর্ণটা অর্জন করে থাকে। মাকড়সাদের অনুভূতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয় এবং যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তাও থাকে তাদের। যেমন সকলেরই জানা আছে যে নিজেদের ডিমগুলোর প্রতি স্ত্রী-মাকড়সাদের গভীর ভালবাসা থাকে। খুব নরম একটা জালের মধ্যে রেখে এই ডিমগুলোকে বহন করে তারা। পুরুষ-মাকড়সারা অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে খুঁজে বেড়ায় স্ত্রী-মাকড়সাদের। কানেস্ত্রিনি ও অন্য আরও অনেকে দেখেছেন স্ত্রী-মাকড়সাদের দখল করার জন্য নিজেদের মধ্যে সংগ্রামেও লিপ্ত হয় পুরুষ-মাকড়সারা। এই শ্রেণীর প্রায় কুড়িটি প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের

মিলন প্রত্যক্ষ করেছেন কানেস্ত্রিনি। তিনি খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে প্রণয় নিবেদনকারী কিছু কিছু পুরুষ-প্রাণীকে প্রত্যাখ্যান করে স্ত্রী-প্রাণীরা, হাঁ করে তাদের ভয় দেখায়, তারপর দীর্ঘ দ্বিধাদ্বন্দ্বের শেষে নিজের পছন্দসই পুরুষটিকে গ্রহণ করে। এইসব তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ করে আমরা বোধহয় এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এদের কয়েকটি প্রজাতির স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের গাত্রবর্ণের সুস্পষ্ট পার্থক্যটা দেখা দিয়েছে যৌন নির্বাচনের ফল হিসেবেই। তবে এ ব্যাপারে যেটা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়, অর্থাৎ স্ত্রী-প্রাণীদের সামনে পুরুষ-প্রাণীদের চাকচিক্য প্রদর্শন, সেটা কিন্তু এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। কয়েকটি প্রজাতির, যেমন থেরিডিয়ন লিনিটাম প্রজাতির, পুরুষ-প্রাণীদের গাত্রবর্ণের অত্যধিক পরিবর্তনশীলতার ব্যাপারটা থেকে মনে হয় যে এইসব প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীদের যৌন বৈশিষ্ট্যগুলো এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি স্থায়ী চরিত্রের হয়ে উঠতে পারেনি। অন্য কিছু দৃষ্টান্ত থেকে এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন কানেস্ত্রিনিও। তিনি দেখেছিলেন কিছু কিছু প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে দু'টি রূপ থাকে এবং দু'টি রূপের প্রাণীদের আকার ও চোয়ালের দৈর্ঘ্যের মধ্যে পার্থক্য থাকে। এই তথ্যটা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় পূর্বোল্লিখিত দ্বিরূপবিশিষ্ট কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের কথা।

এদের পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের থেকে আকারে সাধারণত অনেকটা ছোটই হয়, কখনও-কখনও অস্বাভাবিকরকম ছোট হতেও দেখা যায়,[৩] এবং স্ত্রী-প্রাণীদের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তাদের অত্যন্ত সতর্কও থাকতে হয়, কারণ স্ত্রী-প্রাণীদের লাজুকতাটা প্রায়শই অত্যন্ত বিপজ্জনক ধরনের হয়ে থাকে। ডি গ্রিয়ার একবার এদের একটি পুরুষ-প্রাণীকে দেখেছিলেন যেটি 'প্রাথমিক আদর জাতীয় কাজে ব্যস্ত থাকার সময়েই তার প্রণয়িনীর বন্দীতে পরিণত হয়, স্ত্রী-প্রাণীটি তাকে একটা জালে আটকে ফেলে এবং তারপর খেয়ে ফেলে। দৃশ্যটা দেখে আতঙ্কে আর ঘৃণায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি আমি।' নেফিলা বর্গের পুরুষ-প্রাণীদের আকার অত্যন্ত ছোট হওয়ার ব্যাপারটাকে রেভারেন্ড ও. পি. কেম্ব্রিজ বর্ণনা করেছেন এইভাবে, 'আকারে ক্ষুদ্রাকার পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের হিংস্রতার হাত থেকে কীভাবে আত্মরক্ষা করে, তার একটা চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন মঁসিয়ে ভিঁসোঁ। স্ত্রী-প্রাণীদের শরীরের আর বিশাল বিশাল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চারপাশ দিয়ে পিছলে-পিছলে বেরিয়ে যায় এরা, লুকোচুরি

৩। এপেইরা নাইগ্রা প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীদের ছোট আকারের একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন অগ. ভিঁসোঁ ('Aranecides des Iles de la Reunion,' pl. vi. figs ১ ও ২)। এই প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীরা কঠিন আবরণযুক্ত হয় এবং স্ত্রী-প্রাণীদের গায়ের রঙ কালো হয় আর তাদের পায়ে লাল ডোরা থাকে। দু'টি লিঙ্গের প্রাণীদের আকারগত তারতম্যের আরও অনেক চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে ('কোয়ার্টারলি জার্নাল অফ সায়েন্স,' জুলাই ১৮৬৮, পৃঃ ৪২৯), তবে এ ব্যাপারে মূল লেখাপত্রগুলো পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

খেলে। এ ধরনের প্রচেষ্টায় আত্মরক্ষার সম্ভাবনাটা যে ক্ষুদ্রতম পুরুষদেরই বেশি থাকবে এবং বড় আকারের পুরুষরা যে দ্রুতই ধরা পড়ে যাবে, তা বুঝে নিতে কোনও অসুবিধে হয় না। এইভাবে ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠতে থাকে ক্ষুদ্রাকার পুরুষ-প্রাণীদের একটা গোষ্ঠী এবং এই প্রক্রিয়াটা চলতে থাকে ততদিন ধরে যতদিন না তারা তাদের প্রজননক্রিয়ার পক্ষে মানানসই সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম আকারে গিয়ে পৌঁছোয়। খুব সম্ভবত আজ আমরা এদেরকে সেই ক্ষুদ্রতম আকারেই দেখে থাকি। এই আকারটা এতই ছোট যে স্ত্রী-প্রাণীদের ওপরে এদেরকে দেখলে কোনও পরজীবী প্রাণী বলেই মনে হয়, এবং হয় এরা স্ত্রী-প্রাণীদের নজর এড়িয়ে থাকে অথবা এতই চটপটে ও এতই ক্ষুদ্র হয় যে স্ত্রী-প্রাণীদের পক্ষে এদের ধরা রীতিমতো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।'

ওয়েস্টরিং একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তিনি দেখেছেন থেরিডিয়ন-দের কয়েকটি প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীরা এক ধরনের উচ্চনাদবিশিষ্ট কর্কশ শব্দ করতে পারে, কিন্তু এদের স্ত্রী-প্রাণীরা মূক হয়। পুরুষ-প্রাণীদের শরীরে এই শব্দসৃষ্টিকারী অঙ্গটা হল পেটের নীচের দিকের করাতের মতো খাঁজ-কাটা একটা উঁচু অংশ যার সঙ্গে বুকের পিছনদিকের শক্ত অংশটার ঘষা লাগে। স্ত্রী-প্রাণীদের শরীরে এই অঙ্গটার কোনও চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না। সুবিখ্যাত উর্ণনাভবিদ ওয়ালকেনায়ের-সহ বেশ কিছু লেখক বলেছেন যে মাকড়সা জাতীয় প্রাণীরা সঙ্গীতের দ্বারা আকৃষ্ট হয়।[৪] পরবর্তী পরিচ্ছেদে অর্থোপ্‌টেরা ও হোমোপ্‌টেরা-দের মধ্যেকার সাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করব আমরা। এই সাদৃশ্য থেকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি—এবং ওয়েস্টরিং-ও তাই-ই মনে করেন—যে ওই উচ্চনাদবিশিষ্ট কর্কশ শব্দটা আসলে স্ত্রী-প্রাণীদের ডাকা বা উত্তেজিত করার কাজেই ব্যবহৃত হয়। প্রাণিজগতের নিম্নতম স্তর থেকে ক্রমশ ওপরদিকে ওঠার পথে একে-একে যত প্রাণীর দেখা পাই আমরা, তাদের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে শব্দ করার এরাই প্রথম নজির, অন্তত আমার জানা প্রথম নজির তো বটেই।[৫]

মিরিয়াপড়া (Myrjapoda) শ্রেণী। এই শ্রেণীটির মধ্যে যে-দু'টো বর্গ আছে, অর্থাৎ সহস্রপদ (millipede) ও শতপদ (centipede), তাদের কারুর মধ্যেই উল্লেখ করার মতো কোনও সুস্পষ্ট লিঙ্গগত পার্থক্য খুঁজে পাইনি আমি। তবে গ্লোমেরিস লিম্বাটা এবং সম্ভবত অন্য কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রাণীদের

৪। এই গ্রন্থটির ওলন্দাজ অনুবাদে (খণ্ড ১, পৃ ৪৪৪) ডঃ এইচ. ফান জুটেভিন এ-রকম বেশ কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন।

৫। তবে সম্প্রতি হিল্‌গেনড়র্ফ উচ্চ স্তর শ্রেণীর কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের মধ্যে এই ধরনের একটি অঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন যা শব্দসৃষ্টির উপযোগী হয়ে উঠেছে বলেই মনে হয়। দ্রষ্টব্য, 'জুলজিক্যাল রেকর্ড,' ১৮৬৯, পৃঃ ৬০৩।

গায়ের রঙ স্ত্রী-প্রাণীদের থেকে সামান্য আলাদা হয়ে থাকে। তবে এই গ্লোমেরিস হচ্ছে একটি অত্যন্ত পরিবর্তনশীল প্রজাতি। ডিপ্লোপডা বর্গের পুরুষ-প্রাণীদের শরীরের সামনের বা পিছনের অংশের পা-গুলো পরিবর্তিত হয়ে আঁকড়ে ধরার উপযোগী বঁড়শির চেহারা নিয়েছে যার সাহায্যে তারা স্ত্রী-প্রাণীদের আঁকড়ে ধরতে পারে। ইউলাস-দের কয়েকটি প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীদের পায়ের গুল্‌ফে এক ধরনের ঝিল্লিময় শোষক-নল থাকে যার সাহায্যে তারা স্ত্রী-প্রাণীদের আঁকড়ে ধরতে সক্ষম হয়। কীটপতঙ্গদের নিয়ে আলোচনা করার সময় একটা রীতিমতো অস্বাভাবিক ঘটনার কথা জানতে পারব আমরা। ঘটনাটা হল—লিথোবিয়াস-দের মধ্যে স্ত্রী-প্রাণীদের পায়েই আঁকড়ে ধরার উপযোগী উপাঙ্গ থাকে এবং তার সাহায্যে তারাই আঁকড়ে ধরে পুরুষ-প্রাণীদের।

ডিসেন্ট অফ ম্যান

দ্বিতীয় খণ্ড ❑ প্রথম ভাগ

❑ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ❑

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

কীটপতঙ্গদের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কীটপতঙ্গদের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ

স্ত্রী-প্রাণীদের আয়ত্তে আনার জন্য পুরুষ-প্রাণীদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ—স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেকার পার্থক্য, যেগুলোর অর্থ এখনও দুর্বোধ্য—স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীদের আকারগত পার্থক্য—থাইসেনিউরা—ডিপ্‌টেরা—হেমিপ্‌টেরা—হোমোপ্‌টেরা, এদের কেবলমাত্র পুরুষ-প্রাণীদেরই সাঙ্গীতিক ক্ষমতা থাকে—অর্থোপ্‌টেরা, পুরুষ-প্রাণীদের সাঙ্গীতিক অঙ্গ, সেগুলির গঠনকাঠামোর বিভিন্নতা ; যুদ্ধপ্রিয়তা, গাত্রবর্ণ—নিউরোপ্‌টেরা, স্ত্রী-পুরুষের গাত্রবর্ণের পার্থক্য—হাইমেনোপ্‌টেরা, যুদ্ধপ্রিয়তা ও গাত্রবর্ণ—কোলিওপ্‌টেরা, গাত্রবর্ণ ; এদের বড় বড় শুঙ্গ থাকে, আপাতভাবে যেগুলিকে অঙ্গসজ্জা বলেই মনে হয় ; লড়াই ; উচ্চনাদবিশিষ্ট কর্কশ শব্দসৃষ্টির অঙ্গ, যেগুলি সাধারণত স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের শরীরেই, দেখা যায়।

কীটপতঙ্গদের জগৎটা রীতিমতো বিশাল। এই বিশাল জগতের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের স্থানান্তর গমনের অঙ্গে কখনও-কখনও কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়, এদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যেও প্রায়শই নানান পার্থক্য থাকে, যেমন এদের অনেক প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীদের মাথায় চমৎকার পালকওয়ালা শুঙ্গ থাকে কিন্তু স্ত্রী-প্রাণীদের তা থাকে না। ইফেমেরা বর্গের সদস্য ক্লোইঅন-দের পুরুষ-প্রাণীদের বড় বড় চোখ থাকে, কিন্তু স্ত্রী-প্রাণীদের আদৌ কোনও চোখ থাকে না। কয়েক ধরনের পতঙ্গদের, যেমন মিউটিলিডি-দের স্ত্রী-প্রাণীদের শরীরে আলোকগ্রাহী অঙ্গ (Ocelli) থাকে না এবং তাদের কোনও ডানাও থাকে না। তবে এখানে আমরা মূলত আলোচনা করতে চাইছি সেইসব অঙ্গ নিয়ে যেগুলোর সাহায্যে একটি পুরুষ-প্রাণী অন্য একটি পুরুষ-প্রাণীকে যুদ্ধে কিংবা প্রেমনিবেদনের উৎকর্ষতায় পরাজিত করে, পরাজিত করে তার শক্তি, যুদ্ধপ্রিয়তা, অঙ্গসজ্জা বা সাঙ্গীতিক গুণাবলীর সাহায্যে। তাই, যে-সব অসংখ্য উপায়ের সাহায্যে পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের আয়ত্তে আনে, সেগুলোর কথা সংক্ষেপে একটু বলে নিলে ভালো হয়। পুরুষ-প্রাণীদের পেটের ওপর দিকের জটিল অঙ্গের কথা আমরা আগেই বলেছি, যেগুলোকে প্রাথমিক অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করাটাই বোধহয় যুক্তিসঙ্গত।[১] কিন্তু এগুলো ছাড়াও, মিঃ বি. ডি. ওয়াল্‌শ্‌ যেমন বলেছেন, 'স্ত্রী প্রাণীদের শক্ত করে আঁকড়ে ধরার মতো একটা আপাততুচ্ছ ব্যাপারে পুরুষ-প্রাণীদের সক্ষম করে তোলার জন্য প্রকৃতি যে তাদের

১। প্রায়-সদৃশ বিভিন্ন প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীদের এই অঙ্গগুলোর মধ্যে প্রায়শই নানান পার্থক্য থাকে, সেইসঙ্গেই বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যও থাকে এই অঙ্গগুলোর। তবে মিঃ আর. ম্যাক্‌লাখ্‌লান আমাকে যেমনটা বলেছেন, তার সঙ্গে একমত হয়ে আমিও মনে করি কর্মগত গুণাবলীর দৃষ্টিকোণ

কত বিভিন্ন ধরনের অঙ্গ জুগিয়ে দিয়েছে, তা ভাবলে রীতিমতো আশ্চর্যই হতে হয়।' চোয়ালও অনেক সময় এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, করিডালিস কর্নাটাস-দের (নিউরোপ্‌টেরা বর্গের এক ধরনের পতঙ্গ, অনেকটা গয়াল-পোকা জাতীয়) পুরুষ-প্রাণীদের বিরাট আকারের বাঁকানো চোয়াল থাকে যা স্ত্রী-প্রাণীদের চোয়ালের থেকে বহুগুণ বড়। এদের এই চোয়ালে কোনও দাঁত থাকে না বরং মসৃণ হয়, ফলে এর সাহায্যে স্ত্রী-প্রাণীদের কোনও আঘাত না দিয়েই আঁকড়ে ধরতে পারে এরা। উত্তর আমেরিকার এক ধরনের পুরুষ গুবরে-পোকাদের (Lucanus elaphus) চোয়ালও স্ত্রী-পোকাদের চেয়ে অনেক বড় হয় এবং স্ত্রী-প্রাণীদের আঁকড়ে ধরার জন্য এই চোয়াল কাজে লাগায় তারা—তবে খুব সম্ভবত চোয়ালটা তাদের লড়াইয়ের সময়েও একইভাবে কাজে লাগে। এক ধরনের বেলে-বোলতাদের (Ammophila) স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের চোয়াল প্রায় একইরকম হলেও সেগুলোর প্রয়োগ হয় সম্পূর্ণ আলাদা উদ্দেশ্যে। অধ্যাপক ওয়েস্টউড বলেছেন, এদের পুরুষ-প্রাণীরা 'মিলনের জন্য অতিরিক্তরকম ব্যগ্র হয়ে থাকে, নিজেদের কাস্তের মতো চোয়াল দিয়ে সঙ্গিনীর ঘাড়ের কাছটা আঁকড়ে ধরে তারা।'[২] অন্যদিকে, এদের স্ত্রী-প্রাণীরা তাদের চোয়ালটা কাজে লাগায় বালিতে গর্ত খোঁড়ার জন্য এবং বাসা বানানোর জন্য।

অনেক পুরুষ গুবরে-পোকাদের সামনের পায়ের গুল্‌ফ্‌টা ছড়ানো ধরনের হয় অথবা তাতে লোমের চওড়া পুঁটুলি থাকে। জলচর গুবরে-পোকাদের অনেক বর্গের পুরুষদের একটা গোল ও চ্যাপ্টা মতন শোষক (sucker) থাকে যার সাহায্যে তারা

থেকে বিচার করে দেখলে একটা কথা মেনে নিতেই হবে যে এই অঙ্গগুলোর গুরুত্বকে একটু বেশিরকমই বাড়িয়ে দেখা হয়েছে। অনেকেই বলেছেন যে সুস্পষ্ট পার্থক্যযুক্ত কিংবা সদ্য-জায়মান (incipient) বিভিন্ন প্রজাতির আন্তঃমিশ্রণ প্রতিহত করার ব্যাপারে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা নিয়ে থাকে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের এইসব অঙ্গের ছোটখাটো পার্থক্যগুলো এবং তার ফলে ওইসব প্রাণীদের বিকাশেও এই পার্থক্যগুলো রীতিমতো সাহায্য করে থাকে। কিন্তু ঘটনা যে তা নয়, সেটা বোঝা যায় বিভিন্ন পৃথক পৃথক প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে মিলন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের নানান নথিপত্র থেকে (দ্রষ্টব্য, ব্রন, 'Geschichte der Natur.' B. ii, ১৮৪৩, পৃঃ ১৬৪ ; এবং, ওয়েস্টউড, 'Transact. Ent. Soc.', খণ্ড ৩, ১৮৪২, পৃঃ ১৯৫)। মিঃ ম্যাক্‌লাখ্‌লান আমাকে জানিয়েছেন (দ্রষ্টব্য, 'Stett. Ent. Zeitung,' ১৮৬৭, পৃঃ ১৫৫) যে ডঃ অগ. মেয়ার যখন ফ্রাইগ্যানিডি-দের বেশ কিছু প্রজাতির প্রাণীদের একজায়গায় আবদ্ধ করেছিলেন—যাদের পরস্পরের মধ্যে এই ধরনের সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে—তখন তাদের বিভিন্ন প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে 'মিলন ঘটেছিল' এবং তাদের একটি জোড়া উর্বর ডিম্বাণু সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়েছিল।

২। 'মডার্ন ক্ল্যাসিফিকেশন অফ ইনসেক্টস', খণ্ড ২, পৃঃ ২০৫, ২০৬। মিঃ ওয়াল্‌শ্‌, যিনি চোয়ালের এই দু'ধরনের ব্যবহারের দিকে আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছিলেন, তিনি জানিয়েছেন যে এ ঘটনা তিনি বহুবার প্রত্যক্ষ করেছেন।

স্ত্রী-প্রাণীদের পিচ্ছিল শরীরে নিজেদের আটকে রাখতে সক্ষম হয়। একটা অস্বাভাবিক ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। কয়েক ধরনের জলচর গুবরে-পোকাদের (Dytiscus) স্ত্রী-প্রাণীদের সামনের ডানাগুলোয় গভীর খাঁজ-কাটা থাকে এবং অ্যাসিলিয়াস সালকাটাস (Acilius sulcatus) বর্গের স্ত্রী-প্রাণীদের সামনের ডানাগুলো লোমে ঢাকা থাকে, যার ফলে তাদের আঁকড়ে ধরতে পুরুষদের সুবিধে হয়। আবার অন্য কয়েক ধরনের জলচর গুবরে-পোকাদের (Hydroporus)

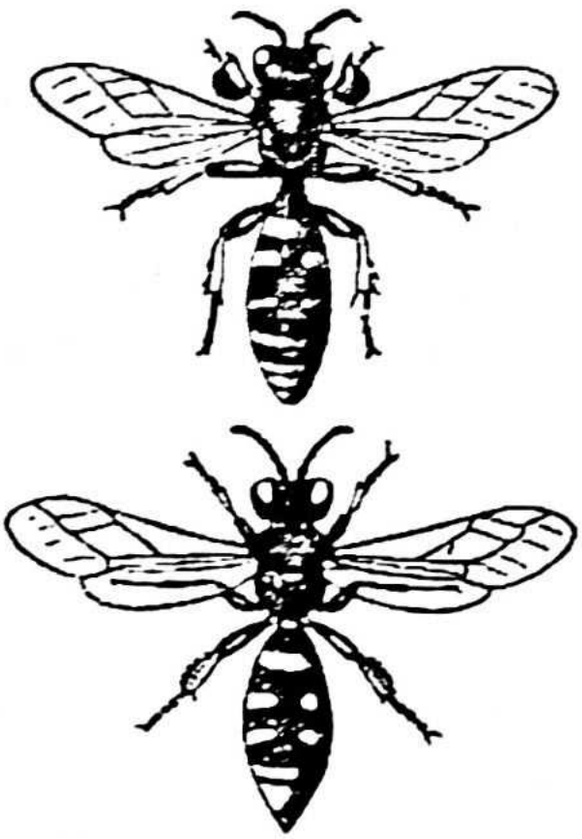

৫নং ছবি—ক্র্যাব্রো ক্রাইব্রেরিয়াস।
ওপরের ছবিটি পুরুষ-পতঙ্গের, নীচের ছবি স্ত্রী-পতঙ্গের।

স্ত্রী-প্রাণীদের সামনের ডানায় ছিদ্র থাকে এবং সেটাও ওই একই কাজে লাগে।[৩] ক্র্যাব্রো ক্রাইব্রেরিয়াস-দের (Crabro cribrarius—৫নং ছবি) পুরুষ-প্রাণীদের পায়ের জঙ্ঘাস্থিটা একটা চওড়া শক্ত পাতের মতন হয়ে ছড়িয়ে থাকে, তার গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝিল্লিময় ছিদ্র থাকে এবং তার ফলে এই অঙ্গটাকে ঠিক চালনি-র মতো দেখতে

৩। এখানে আমরা দ্বিরূপতার একটা বিচিত্র ও অব্যাখ্যাত ঘটনার সম্মুখীন হই, কারণ ডাইস্টিকাস-দের চারটি ইউরোপীয় প্রজাতির কিছু কিছু স্ত্রী-প্রাণীদের এবং হাইড্রোপোরাস-দের কয়েকটি প্রজাতির স্ত্রী-প্রাণীদের সামনের ডানাগুলো একেবারে মসৃণ হতেই দেখা যায়। লোমে ঢাকা বা ছিদ্রযুক্ত সামনের ডানা এবং একেবারে মসৃণ সামনের ডানা—এ দু'য়ের মধ্যবর্তী কোনও স্তরের খোঁজও এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

লাগে। পেন্‌থে (Penthe—গুবরে-পোকাদের একটি বর্গ) বর্গের পুরুষ-প্রাণীদের শুঙ্গের কয়েকটি মধ্যবর্তী সন্ধি একটু ছড়ানো ধরনের হয় এবং নীচের দিকে লোমের পুঁটুলি থাকে—ব্যাপারটা ঠিক ক্যারাবাইডি-দের পায়ের গুল্‌ফের মতোই 'এবং প্রয়োজনীয়তাটাও একই।' পুরুষ গয়াল-পোকাদের 'ল্যাজের শেষপ্রান্তের উপাঙ্গটার অসংখ্য পরিবর্তন ঘটেছে, এক-একজনের ক্ষেত্রে এই উপাঙ্গটা এক-একরকম রূপ নিয়েছে, এবং প্রতিটি রূপই খুব বিচিত্র ধরনের। স্ত্রী-প্রাণীদের ঘাড়ের কাছটা যাতে তারা ভালোভাবে আঁকড়ে ধরতে পারে, তার জন্যেই দেখা দিয়েছে এই বৈচিত্র্যগুলো।'

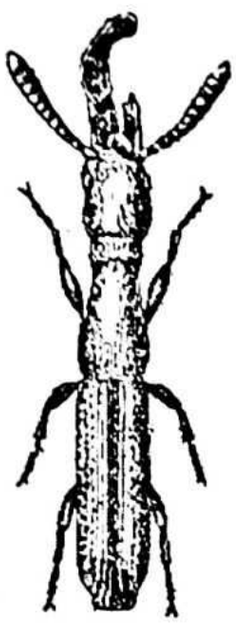

৬নং ছবি—
ট্যাফ্রোডেরেস ডিসটর্টাস (অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে)। ওপরের ছবিটি পুরুষ-পতঙ্গের, নীচের ছবি স্ত্রী-পতঙ্গের।

শেষত, পুরুষ-পতঙ্গের পায়ে অদ্ভুত ধরনের কাঁটা, শক্ত গাঁট কিংবা নখজাতীয় জিনিস থাকে। কখনও-কখনও এদের পুরো পা-টাই আনত কিংবা মোটা ধরনের হয়ে থাকে, তবে এটাকে কিছুতেই যৌন বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা চলে না। আবার অনেক সময় এদের একজোড়া পা কিংবা তিনজোড়া পা-ই বেশ দীর্ঘ হয়, কখনও-কখনও অত্যধিক দীর্ঘ হতেও দেখা যায়।

সমস্ত বর্গের বহু প্রজাতিরই স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে নানারকমের যৌন পার্থক্য লক্ষ করা যায় কিন্তু সেগুলোর অর্থ বুঝে ওঠা যায় না। এ ব্যাপারে এক ধরনের গুবরে-পোকাদের (৬নং চিত্র) কথা উল্লেখ করা যায়। এদের পুরুষ-প্রাণীদের বাঁদিকের চোয়ালটা অনেকখানি প্রসারিত হয়ে থাকে, ফলে এদের মুখটাও অনেকখানি বেঁকে যায়। ক্যারাবিডাস বর্গের অন্তর্ভুক্ত ইউরিগ্‌ন্যাথাস নামক এক ধরনের গুবরে-পোকাদের কথা উল্লেখ করেছেন মিঃ উলাস্টন। এদের পুরুষ-প্রাণীদের থেকে স্ত্রী-প্রাণীদের মাথাটা অনেক বেশি চওড়া ও বড় হয় (তবে সব স্ত্রী-প্রাণীর মাথা সমান চওড়া ও সমান বড় হয় না)। এ-রকম অসংখ্য ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। লেপিডোপ্‌টেরা-দের মধ্যে এ-রকম দৃষ্টান্ত প্রচুর চোখে পড়ে। এই বর্গের অন্তর্গত কয়েক ধরনের পুরুষ-প্রজাপতিদের মধ্যে একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ করা যায়। এদের সামনের পা-গুলো কমবেশি ক্ষয়াটে ধরনের হয় এবং জঙ্ঘাস্থি ও গুল্‌ফ্‌গুলো অনেকটা লুপ্তপ্রায় গ্রন্থির আকার নেয়। এদের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের ডানার মধ্যেও নানান পার্থক্য থাকে। পার্থক্য থাকে তাদের ডানার

ঝিল্লিতে[৪] এবং কখনও-কখনও দেহরেখাতেও, যেমনটা দেখা যায় অ্যারিকোরিস এপিটাস প্রজাতির ক্ষেত্রে। এই শেষোক্ত দৃষ্টান্তটি মিঃ এ. বাটলার আমাকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দেখিয়েছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার কয়েক ধরনের পুরুষ-প্রজাপতিদের ডানার কিনারায় লোমের গুচ্ছ থাকে এবং পিছনের জোড়ার চাকতিতে আবের মতো শক্ত অংশ দেখা যায়। মিঃ ওয়নফোর দেখিয়েছেন যে ব্রিটেনের কয়েক ধরনের প্রজাপতিদের শুধুমাত্র পুরুষ-প্রাণীদেরই শরীরের কোনও-কোনও অংশ বিচিত্র ধরনের আঁশে ঢাকা হয়।

স্ত্রী-জোনাকিদের শরীরের উজ্জ্বল আলোর ব্যাপারে আজ পর্যন্ত বহু আলোচনা হয়েছে। পুরুষ-জোনাকিদের এবং শূককীটদের, এমনকী ডিমেরও আলো থাকে, তবে এদের প্রত্যেকের আলোর দীপ্তি নিতান্তই ক্ষীণ হয়। কয়েকজন লেখকের মতে এই আলোটা শত্রুদের ভয় দেখিয়ে দূরে সরানোর উদ্দেশ্যেই কাজে লাগে, আবার অন্য কয়েকজন বলেছেন ওই আলোটা পুরুষ-জোনাকিদের সাহায্য করে স্ত্রী-জোনাকিদের কাছে পৌঁছতে। অবশেষে মিঃ বেল্ট এই প্রশ্নের একটা মোটামুটি নিশ্চিত সমাধান হাজির করতে পেরেছেন। ল্যাম্পিরিডি বর্গের বেশ কিছু ধরনের পতঙ্গদের নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে তিনি দেখেছিলেন যে পতঙ্গভূক স্তন্যপায়ীরা ও পাখিরা এদেরকে খেতে একেবারেই পছন্দ করে না। তাঁর এই মতটা মিঃ বেটস-এর মতের সঙ্গে পুরোপুরি সাযুজ্যপূর্ণ। মিঃ বেটস বলেছেন যে অনেক ধরনের পতঙ্গরা এই ল্যাম্পিরিডিদের হুবহু অনুকরণ করার চেষ্টা করে। উদ্দেশ্যটা হল—এর ফলে খাদকরা তাদেরকে ল্যাম্পিরিডি বর্গের পতঙ্গ বলে মনে করে খেতে আসবে না, ফলে তারা বেঁচে যাবে। মিঃ বেটস আরও বলেছেন যে আলোকপ্রভ প্রজাতির পতঙ্গদের দেখামাত্রই তাদের খাদকরা বুঝতে পারে খাদ্য হিসেবে তারা নিতান্তই অরুচিকর, এবং এই ব্যাপারটা আলোকপ্রভ প্রজাতির পতঙ্গদের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এই একই ব্যাখ্যা ইলেটার-দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে যাদের উভয় লিঙ্গের প্রাণীরাই উজ্জ্বল আলোকপ্রভ হয়ে থাকে। স্ত্রী-জোনাকিদের ডানাগুলো কেন বিকশিত হয়ে ওঠেনি তা আমাদের জানা নেই, তবে তাদের বর্তমান চেহারাটার সঙ্গে শূককীটের চেহারার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকে। আমরা জানি বহু জীবজন্তুই শূককীট খেতে ভালবাসে। এ থেকেই বুঝে নেওয়া যায় পুরুষ-জোনাকিদের থেকে স্ত্রী-জোনাকিরা কেন অনেক বেশি আলোকপ্রভ ও দৃষ্টি-আকর্ষক হয়ে থাকে আর একইভাবে শূককীটেরাও কেন আলোকপ্রভ হয়।

৪। ই. ডাবল্ডে, 'অ্যানাল্‌স্ অ্যান্ড ম্যাগ. অফ ন্যাচরাল হিস্ট্রি', খণ্ড ১, ১৮৪৮, পৃঃ ৩৭৯। এর সঙ্গে আমি যোগ করতে পারি যে ডাইমেনোপ্‌টেরা বর্গের কিছু-কিছু পতঙ্গদের (দ্রষ্টব্য, শাকার্ড, 'ফসোরিয়াল হাইমেনোপ', ১৮৩৭, পৃঃ ৩৯-৪৩) স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের ডানায় ঝিল্লিগত পার্থক্য থাকে।

স্ত্রী-পুরুষের আকারগত পার্থক্য। সব ধরনের পতঙ্গদের মধ্যেই পুরুষ-পতঙ্গরা আকারে সাধারণত স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে ক্ষুদ্রতর হয়ে থাকে, এমনকী শূককীট দশাতেও এই পার্থক্যটা লক্ষ করা যায়। রেশম-কীটদের (Bombyx mori) স্ত্রী ও পুরুষ-গুটির মধ্যেকার পার্থক্যটা এতই বেশি যে ফ্রান্সে তাদের এক বিশেষ ধরনের ওজন-পদ্ধতির সাহায্যে পৃথক করা হয়ে থাকে। প্রাণিজগতের নিম্নতর শ্রেণীগুলির ক্ষেত্রে স্ত্রী-প্রাণীদের বৃহত্তর আকারটা সাধারণত নির্ভর করে তাদের প্রচুর সংখ্যক ডিম্বাণু সৃষ্টির ওপরেই। কীটপতঙ্গদের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটা অন্তত কিছুদূর পর্যন্ত সত্য বলেই মনে হয়। তবে ডঃ ওয়ালেস এ ব্যাপারে অনেক বেশি সম্ভাব্য একটা ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। বম্বিক্স সিনথিয়া ও ইয়ামামাই শুঁয়োপোকাদের এবং বিশেষত কয়েক ধরনের বামনাকৃতি শুঁয়োপোকাদের (যাদের বড় করে তোলা হয়েছিল অনভ্যস্ত খাদের ওপর নির্ভরশীল অন্য একটি বংশধারা থেকে) বিকাশপ্রক্রিয়া সযত্নে পর্যবেক্ষণ করে তিনি বলেছেন, 'প্রতিটি পোকা যত বেশি সুন্দর হয়, তাদের রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও তত বেশি হয়ে থাকে। এই কারণেই তাদের স্ত্রী-প্রাণীরা, যারা আকারে বড় ও ওজনে ভারী হয়ে থাকে, তাদের অসংখ্য ডিম বহন করতে হয় বলে তাদের সংখ্যা পুরুষদের থেকে কম হয়, কারণ পুরুষরা আকারে ক্ষুদ্রতর হয় এবং পরিণত হয়ে ওঠার সময়টাও অনেক কম লাগে তাদের।' যেহেতু অধিকাংশ পতঙ্গই স্বল্পকালজীবী হয় এবং যেহেতু তাদের নানান বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, সেহেতু তাদের স্ত্রী-প্রাণীরা যত দ্রুত গর্ভবতী হতে পারে ততই তাদের পক্ষে মঙ্গল। এই উদ্দেশ্যটা সফল হতে পারে একমাত্র তখনই, যখন প্রচুর সংখ্যক পুরুষ-পতঙ্গ আগেই পরিণত হয়ে উঠে স্ত্রী-পতঙ্গদের পরিণত হয়ে ওঠার জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতে পারে। মিঃ এ. আর. ওয়ালেস সঙ্গতভাবেই বলেছেন যে এই ঘটনাটাও সম্ভব হতে পারে একমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফতই। কারণ আকারে ক্ষুদ্রতর পুরুষ-পতঙ্গরাই সবচেয়ে আগে পরিণত হয়ে উঠবে আর তার ফলে তারা প্রচুর সংখ্যক সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম হবে এবং এই সন্তানরা তাদের জন্মদাতাদের ক্ষুদ্রতর আকারের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠবে, অন্যদিকে আকারে বড় পুরুষ-পতঙ্গদের পরিণত হয়ে উঠতে বিলম্ব হবে এবং তার ফলে তাদের সন্তানসংখ্যাও আপনা থেকেই কম হয়ে যাবে।

তবে স্ত্রী-পতঙ্গদের তুলনায় পুরুষ-পতঙ্গদের ক্ষুদ্রতর হওয়ার এই নিয়মের কিছু কিছু ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। এইসব ব্যতিক্রমের কারণ অনুভব করাও এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। স্ত্রী-পতঙ্গদের দখল করার জন্য যাদের সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয় তাদের পক্ষে শরীরের আকার বড় হওয়া এবং শক্তি বেশি থাকাটা একটা বাড়তি সুবিধা তো বটেই। স্ট্যাগ-বিটল্-দের (Lucanas) পুরুষ-পতঙ্গরা আকারে

স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে বড় হয়ে থাকে। তবে অন্য কয়েক ধরনের বিট্‌ল্‌ বা গুবরে-পোকারা নিজেদের মধ্যে সংগ্রামে লিপ্ত হয় না অথচ তাদের মধ্যেও পুরুষ-পতঙ্গরা আকারে স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে বড় হয়ে থাকে। এই ঘটনার অর্থ কী, আমাদের জানা নেই। তবে এদের কারও কারও মধ্যে, যেমন বিশালাকার ডাইনাসটেস এবং মেগাসোমা-দের মধ্যে, আমরা অন্তত এটুকু লক্ষ করি যে স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে আগে পরিণত হয়ে ওঠার জন্য পুরুষ-পতঙ্গদের আকারে ক্ষুদ্রতর হওয়ার কোনও প্রয়োজন হয় না, কারণ এই পতঙ্গরা মোটেই স্বল্পকালজীবী হয় না আর তার ফলে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের জন্য এরা পর্যাপ্ত সময় পেয়ে থাকে। একইভাবে পুরুষ গয়াল-পোকারা (Libellulidae) অনেক সময় স্ত্রী-পোকাদের চেয়ে আকারে যথেষ্ট বড় হয়ে থাকে, কিন্তু কখনোই তাদের থেকে আকারে ছোট হয় না। মিঃ ম্যাক্‌লাখ্‌লান-এর মতে, এক সপ্তাহ বা এক পক্ষকাল অতিক্রান্ত না-হওয়া পর্যন্ত এবং নিজেদের যথোপযুক্ত পুরুষালি গাত্রবর্ণ অর্জন না-করা পর্যন্ত তারা সাধারণত স্ত্রী-পতঙ্গদের সঙ্গে মিলিত হয় না। তবে সবথেকে বিচিত্র ঘটনাটা লক্ষ কবা যায় হুলবিশিষ্ট হাইমেনোপ্‌টেরা-দের মধ্যে, যা থেকে বোঝা যায় উভয় লিঙ্গের সদস্যদের আকারের পার্থক্যের মতো অতি তুচ্ছ একটা বৈশিষ্ট্যও কত জটিল এবং সহজেই-নজর-এড়িয়ে-যাওয়া সম্পর্কগুলোর ওপর নির্ভর করে দেখা দিতে পারে। মিঃ এফ. স্মিথ আমাকে জানিয়েছেন যে এই বিশাল বর্গের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সব পতঙ্গদের মধ্যেই ওই সাধারণ নিয়মটা ক্রিয়াশীল, অর্থাৎ পুরুষ-পতঙ্গরা আকারে স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে ক্ষুদ্রতর হয় এবং স্ত্রী-পতঙ্গদের থেকে প্রায় এক সপ্তাহ আগেই তারা পরিণত হয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু মৌমাছিদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। এদের এপিস মেলিফিকা, অ্যান্‌থিডিয়াম ম্যানিকাটাম আর অ্যান্‌থোফোরা অ্যাসেরভোরাম-দের মধ্যে এবং ফসোর-দের মেথোকা ইখনিউমোনিডেস শ্রেণীর মধ্যে পুরুষ-পতঙ্গরা স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে আকারে বড় হয়। এই ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যায় যে উড়ন্ত অবস্থায় মিলন এইসব প্রজাতির ক্ষেত্রে একান্তই প্রয়োজনীয় এবং শূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় স্ত্রী-পতঙ্গদের বহন করার জন্য যথেষ্ট শক্তি ও বড় আকারটা পুরুষ-পতঙ্গদের পক্ষে নিতান্তই অপরিহার্য। শরীরের আকার ও পরিণত হয়ে ওঠার সময়কালের মধ্যে সাধারণত যে-সম্পর্কটা ক্রিয়াশীল থাকে, এক্ষেত্রে তার বিপরীত চিত্রটাই চোখে পড়ে আমাদের। কারণ এদের মধ্যে পুরুষ-পতঙ্গরা আকারে বৃহত্তর হলেও ক্ষুদ্রতর স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে আগেই পরিণত হয়ে বেরিয়ে আসে তারা।

এবার আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর পতঙ্গদের নিয়ে আলোচনা করব এবং তা করতে গিয়ে আমরা বেছে নেব আমাদের আলোচনার পক্ষে অধিক গুরুত্বসম্পন্ন

তথ্যগুলিকেই। লেপিডোপ্‌টেরা-দের (প্রজাপতি ও মথ) নিয়ে একটি পৃথক পরিচ্ছেদে আলোচনা করব আমরা।

থাইস্যানিউরা শ্রেণী। নিম্ন স্তরের এই পতঙ্গদের ডানা থাকে না, গায়ের রঙ ফ্যাকাশে হয়, আকারে অত্যন্ত ছোট এবং মাথা ও শরীর অত্যন্ত কুৎসিত ধরনের হয়ে থাকে। এদের স্ত্রী আর পুরুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না, কিন্তু এদের দেখলে বোঝা যায় প্রাণিজগতের একেবারে নিম্ন স্তরেও পুরুষরা কত সযত্নে স্ত্রী-প্রাণীদের কাছে প্রেমনিবেদন করে থাকে। স্যর জে. লুবক বলেছেন, 'এইসব ক্ষুদ্রাকার প্রাণীরা (Smynthurus luteus) কীভাবে নিজেদের মধ্যে প্রেমের খেলা খেলে, তা দেখা এক মজার অভিজ্ঞতা। এদের পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের চেয়ে আকারে অনেকটাই ছোট হয় এবং তারা স্ত্রী-প্রাণীদের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। তারপর স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীরা মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়, ভেড়ারা যেভাবে খেলা করে সেইভাবে একবার এগোয় আবার পিছোয় এবং একে অপরকে ঢুঁ মারে। অতঃপর স্ত্রী-প্রাণীটি পালানোর ভান করে, পুরুষ-প্রাণীটি রাগের একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে তাকে তাড়া করে এবং তার সামনে চলে গিয়ে আবার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। স্ত্রী-প্রাণীটি তখন খুব লাজুকভাবে পিছু ফেরে, কিন্তু তার তুলনায় দ্রুততর ও অধিকতর সক্রিয় পুরুষ-প্রাণীটিও তৎক্ষণাৎ ধেয়ে আসে তার দিকে এবং নিজের শুঙ্গ দিয়ে চাবুক মারার মতো করে আঘাত করে তাকে। অতঃপর কিছুক্ষণ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে তারা, শুঙ্গ দিয়ে খেলা করে এবং চারপাশের সবকিছু ভুলে একে অপরকে নিয়ে বিভোর হয়ে থাকে।'

ডিপ্‌টেরা (মাছি ইত্যাদি) শ্রেণী। এদের স্ত্রী-পুরুষের গায়ের রঙে কোনও পার্থক্য থাকে না বললেই চলে। এদের পর্যবেক্ষণ করে মিঃ এফ. ওয়াকার দেখেছিলেন যে এই শ্রেণীর বাইবিও বর্গের স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যেই গায়ের রঙের সবথেকে বেশি পার্থক্য থাকে—পুরুষদের গায়ের রঙ হয় কাল্‌চে অথবা ঘন কালো এবং স্ত্রী-পতঙ্গরা ফ্যাকাশে গোছের খয়েরি-কমলা রঙের হয়ে থাকে। মিঃ ওয়ালেস কর্তৃক নিউ গিনিতে আবিষ্কৃত ইল্যাফোমাইয়া বর্গের পতঙ্গরা বিশেষভাবে উল্লেখিত হওয়ার দাবি রাখে, কারণ এদের পুরুষ-পতঙ্গদের শুঙ্গ থাকে কিন্তু স্ত্রী-পতঙ্গদের আদৌ কোনও শৃঙ্গ থাকে না। এই শুঙ্গগুলো উদ্গত হয় চোখের নীচে থেকে এবং পুরুষ-হরিণের শৃঙ্গের সঙ্গে এদের এই শুঙ্গের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়—হরিণদের শৃঙ্গের মতোই এদের শুঙ্গেও শাখা থাকে। এদের একটা প্রজাতির ক্ষেত্রে এই শুঙ্গগুলো দৈর্ঘ্যে তাদের গোটা শরীরটার সমান হয়ে থাকে। আপাতভাবে মনে হতে পারে যে লড়াই করার জন্যই হয়তো এই শুঙ্গগুলো অর্জন করেছে এরা। কিন্তু এদের একটা প্রজাতির ক্ষেত্রে

এই শুঙ্গগুলো অত্যন্ত চমৎকার লাল্‌চে রঙের হয়, ধারগুলো হয় কালো রঙের আর মাঝখানে একটা ফ্যাকাশে রঙের ডোরা থাকে, তাছাড়া সামগ্রিকভাবে এই বর্গের পতঙ্গদের দেখতে খুব সুন্দর হয়—এই তথ্যগুলো মাথায় রাখলে ওই শুঙ্গগুলোকে লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা না করে অঙ্গসজ্জা হিসেবে বিবেচনা করাটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। ডিপ্‌টেরা শ্রেণীর কিছু কিছু পুরুষ-পতঙ্গ যে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, তা আমরা জানি। টিপুলে-দের মধ্যে এই ব্যাপারটা বহুবার লক্ষ করেছেন অধ্যাপক ওয়েস্টউড। ডিপ্‌টেরা শ্রেণীর অন্য কিছু বর্গের পুরুষরা স্ত্রী-পতঙ্গদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে সুর বা সঙ্গীতের সাহায্যে—অন্তত আপাতভাবে তাই-ই মনে হয়। এরিস্টালিস প্রজাতির দু'টি পুরুষ-পতঙ্গকে একটি স্ত্রী-পতঙ্গের কাছে প্রেমনিবেদন করতে দেখেছিলেন এইচ. মুলার। তারা দু'জনে স্ত্রী-পতঙ্গটির কাছে ঘেঁষে এসে তার চারপাশে উড়ে-উড়ে বেড়াচ্ছিল এবং উড়তে উড়তেই একটা তীক্ষ্ণ গুন্‌গুন্ শব্দ করে চলেছিল। ডাঁশ এবং মশারাও (Culicidae) এইরকম গুঞ্জন বা গুন্‌গুন্ শব্দের সাহায্যেই পরস্পরকে আকৃষ্ট করে বলে মনে হয়। অধ্যাপক মেয়ার সম্প্রতি সুনিশ্চিতভাবে জানিয়েছেন যে এদের পুরুষ-পতঙ্গদের হুল বা শুঙ্গের রোমগুলো একটা সুর-বাঁধার যন্ত্রের (tuning-fork) দ্বারা সৃষ্ট সুরের সঙ্গে মিল রেখে সমান তালে স্পন্দিত হয় (যন্ত্রটি থেকে নির্গত শব্দের সীমার মধ্যে তারা থাকলে তবেই এই স্পন্দনটা লক্ষ করা যায়)। বড় রোমগুলো সমান তালে স্পন্দিত হয় খাদের সুরের সঙ্গে আর ছোট রোমগুলো স্পন্দিত হয় চড়া সুরের সঙ্গে। ল্যান্ডোয়া-ও বলেছেন যে বিশেষ বিশেষ সুর সৃষ্টি করে তিনি প্রায়শই ডাঁশদের পুরো এক-একটা দলকে নিজের কাছে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছেন। এইসঙ্গেই যোগ করা যায় যে ডিপ্‌টেরা শ্রেণীর পতঙ্গদের স্নায়ুতন্ত্র অত্যন্ত উন্নত ধরনের হয় বলে এদের মানসিক ক্ষমতাও সম্ভবত অন্যান্য অধিকাংশ পতঙ্গদের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।[৫]

হেমিপ্‌টেরা (মেঠো-ছারপোকা জাতীয়) শ্রেণী। ব্রিটেনে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রজাতিগুলিকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন মিঃ জে. ডব্লিউ. ডগলাস এবং এদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেকার পার্থক্যের কথা আমাকে জানিয়েছেন তিনি। এদের কোনও-কোনও প্রজাতির পুরুষের ডানা থাকে কিন্তু স্ত্রী-প্রাণীদের কোনও ডানা থাকে না। শরীর, সামনের ডানা, শুঙ্গ ও গুল্‌ফ্—এই সবকিছুর ক্ষেত্রেই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য থাকে। তবে এই পার্থক্যগুলোর তাৎপর্য আমাদের জানা নেই বলে এ

৫। দ্রষ্টব্য, মিঃ বি. টি. লোনে-র কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থ 'অন দ্য অ্যানাটমি অফ দ্য ব্লোফ্লাই, মাস্কা ভমিটোরিয়া', পৃঃ ১৪। এই গ্রন্থেই (পৃঃ ৩৩) তিনি বলেছেন যে 'বন্দী মাছিরা এক ধরনের বিলাসপূর্ণ অদ্ভুত সুর ছড়াতে থাকে এবং তা শুনে অন্য মাছিরা সেখান থেকে উধাও হয়ে যায়।'

নিয়ে আলোচনার চেষ্টা থেকে আপাতত নিরস্ত থাকছি আমরা। এদের স্ত্রী-প্রাণীরা সাধারণত পুরুষদের চেয়ে আকারে বড় ও বেশি হৃষ্টপুষ্ট হয়। ব্রিটেনের প্রজাতিগুলির ক্ষেত্রে, এবং মিঃ ডগলাসের জ্ঞাত তথ্য অনুসারে, বহিরাগত প্রজাতিগুলির ক্ষেত্রেও, স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের গায়ের রঙে সাধারণত তেমন কোনও পার্থক্য থাকে না। তবে ব্রিটেনের ছ'টি প্রজাতির ক্ষেত্রে এদের স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের গায়ের রঙ অনেক বেশি কালো হয় এবং অন্য চারটি প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী-প্রাণীদের গায়ের রঙ পুরুষদের তুলনায় বেশি কালো হয়। কয়েকটি প্রজাতির উভয় লিঙ্গের সদস্যদেরই গায়ের রঙ খুব উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এদের শরীর থেকে একটা তীব্র গা-ঘিন্‌ঘিনে গন্ধ ছড়ায়। এ থেকে মনে হয় যে এদের গায়ের ওই উজ্জ্বল রঙটা আসলে একটা সঙ্কেত হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ পতঙ্গভূক প্রাণীদের ওই রঙটা জানিয়ে দেয় যে খাদ্য হিসেবে এই পতঙ্গরা মোটেই রুচিকর হবে না। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে গায়ের রঙটা সরাসরিভাবেই এদের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে থাকে। যেমন অধ্যাপক হফমান আমাকে জানিয়েছেন যে এদের লাল্‌চে ও সবুজ রঙের ক্ষুদ্রাকৃতি প্রজাতির পতঙ্গদের তিনি লেবুগাছের ডালে (যে-সব গাছে এই পতঙ্গদের হামেশাই দেখা যায়) ফুটে থাকা কুঁড়িগুলোর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন, কিছুতেই তাদেরকে আলাদা করে চিনে উঠতে পারেন না।

রেডুভিডি-দের কয়েকটি প্রজাতির পতঙ্গরা একরকম তীক্ষ্ণ ও কর্কশ শব্দ করে থাকে। এদের মধ্যে পাইরেটস স্ট্রাইডিউলাস-দের ব্যাপারে বলা হয় এদের বুকের সবথেকে সামনের অংশের গহ্বরটি (prothoracic cavity) ঘাড়ের মধ্যে চলাচল করে বলেই এই শব্দটা সৃষ্টি হয়ে থাকে। ওয়েস্টারিং-এর মতে, রেডুভিয়াস পার্সোন্যাটাস-রাও এ-রকম তীক্ষ্ণ ও কর্কশ শব্দ করে থাকে। তবে এটাকে যৌন বৈশিষ্ট্য বলে মনে করার কোনও কারণ আমি খুঁজে পাইনি—একমাত্র যে-সব পতঙ্গরা সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে না, তাদের ক্ষেত্রে এটাকে একটা যৌন বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাদের ক্ষেত্রে এই শব্দটা সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে ডাকার যৌন-সঙ্কেত হওয়াটাই স্বাভাবিক, অন্যথায় তাদের শরীরে এ-ধরনের শব্দ-সৃষ্টিকারী অঙ্গ থাকার কোনও অর্থই থাকে না।

হোমোপ্‌টেরা (Homoptera) শ্রেণী। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কোনও অরণ্যে ঘোরার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা নিশ্চয়ই কখনও-না-কখনও পুরুষ ঘুর্ঘুরে-পোকাদের (Cicadae) ডাক শুনে বিস্মিত হয়েছেন। এদের স্ত্রী-পতঙ্গরা কিন্তু মূক হয়, কোনও শব্দ করতে পারে না। এই ঘটনাটা লক্ষ করেই গ্রিক কবি জেনারখাস লিখেছিলেন, 'পৃথিবীতে ওই ঘুর্ঘুরেরাই সুখী, কারণ তাদের স্ত্রীদের কণ্ঠে কোনও শব্দ ফোটে না।" ব্রাজিলের তীরভূমি থেকে সিকি মাইল দূরে যখন নোঙর ফেলেছিল 'বিগল্' জাহাজ, তখন জাহাজে বসেই তীর থেকে ভেসে আসা ওই ঘুর্ঘুরে-পোকাদের ডাক শোনা

যেত। ক্যাপ্টেন হ্যান্‌কক্ বলতেন এক মাইল দূর থেকেও নাকি ওই ডাক শুনতে পাওয়া যায়। এই পতঙ্গদের এই ডাক বা গান শোনার জন্য প্রাচীনকালে গ্রিকরা এদের খাঁচায় আটকে রাখত, এখন আটকে রাখে চীনারা। এ থেকে বোঝা যায় এদের ডাক শুনতে অন্তত কিছু মানুষের বেশ ভালই লাগে। ঘুর্ঘুরে-পোকারা সাধারণত দিনের বেলাতেই ডাকে বা গান গায়, অন্যদিকে ফালগোরিডি-রা নৈশগায়ক হিসেবেই বেশি পরিচিত। ল্যাণ্ডোয়া-র মতে, এই শব্দটা উদ্ভূত হয় ওষ্ঠের কম্পন থেকে এবং এই কম্পনটা সৃষ্টি হয় শ্বাসনালী থেকে নির্গত বাতাসের তরঙ্গের দ্বারা। কিন্তু এই মতটা নিয়ে সম্প্রতি কিছু বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ডঃ পাওয়েল প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে এই শব্দটা উদ্ভূত হয় একটা ঝিল্লির কম্পন থেকে এবং এই কম্পনটা সৃষ্টি হয় একটি বিশেষ পেশীর সাহায্যে। জীবন্ত পতঙ্গরা যখন এইরকম শব্দ সৃষ্টি করে তখন লক্ষ করলে ওই ঝিল্লিটার কম্পন দেখতে পাওয়া যায়। মৃত পতঙ্গদের ওই পেশীটা একটু শুকনো আর শক্ত হয়ে যাওয়ার পর একটা পিনের মাথা দিয়ে সেটাতে টান দিলে তাদের শরীর থেকেও ওই একই শব্দ নির্গত হয়। এদের স্ত্রী-পতঙ্গদের শরীরেও শব্দসৃষ্টিকারী সমস্ত জটিল অঙ্গগুলোই বিদ্যমান থাকে, তবে সেগুলো পুরুষদের মতন অতটা উন্নত অবস্থায় থাকে না এবং সেগুলো কখনোই শব্দসৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃতও হয় না।

এদের এই শব্দ বা সঙ্গীত সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করেছেন ডঃ হার্টম্যান। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ঘুর্ঘুরে-পোকাদের নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'শব্দগুলো এখন (৬ ও ৭ জুন, ১৮৫১) সব দিক থেকেই শোনা যাচ্ছে। আমার ধারণা এগুলো আসলে পুরুষ-পতঙ্গদের যৌন-মিলনের ডাক। আমার মাথা-সমান উঁচু চেস্টনাট গাছের ঘন একটা ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। আমার চারপাশে শয়ে শয়ে পুরুষ-পতঙ্গ ডেকে চলেছে একটানা। খানিক পরেই দেখলাম স্ত্রী-পতঙ্গরা দলে দলে এসে জড়ো হচ্ছে পুরুষ-পতঙ্গগুলোর চারপাশে।' তিনি আরও বলেছেন, 'এ মরশুমে (অগাস্ট, ১৮৬৮) আমার বাগানের একটা ছোট নাশপাতি গাছে সিকাডা প্রুইনোসা-দের প্রায় পঞ্চাশটা শূককীট হয়েছিল। প্রায়শই আমি লক্ষ করতাম যে পুরুষ-পতঙ্গরা ওই তীক্ষ্ণ শব্দটা সৃষ্টি করছে আর স্ত্রী-পতঙ্গরা উল্লসিত ভঙ্গিতে তাদের কাছে গিয়ে হাজির হচ্ছে।' ফ্রিৎজ্ মুলার দক্ষিণ ব্রাজিল থেকে আমাকে লিখে জানিয়েছেন যে ওখানে তিনি প্রায়শই কোনও প্রজাতির দু'-তিনটি পুরুষ-পতঙ্গকে নিজেদের মধ্যে সাঙ্গীতিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে দেখেছেন। পরস্পরের থেকে বেশ খানিকটা দূরে দূরে থেকে রীতিমতো উচ্চকণ্ঠে ডাকাডাকি শুরু করে এঁরা। একজনের গান বা ডাক শেষ হওয়ামাত্রই আর-একজন ডাকতে শুরু করে, সে চুপ করামাত্রই শুরু করে দেয় অন্য আর-একজন। পুরুষ-পতঙ্গদের

নিজেদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে। এ থেকে মনে হয় যে ওই শব্দ শুনেই স্ত্রী-পতঙ্গরা তাদের খুঁজে বার করে তো বটেই, সেইসঙ্গেই স্ত্রী-পাখিদের মতো তারাও সবথেকে আকর্ষণীয় পুরুষ-কণ্ঠের দ্বারা উত্তেজিত বা প্রলুব্ধ হয়।

হোমোপ্টেরাদের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যে অঙ্গসজ্জাগত কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের কথা আমার গোচরে আসেনি। মিঃ ডগলাস আমাকে জানিয়েছেন যে ব্রিটেনে এদের তিনটি প্রজাতির মধ্যে পুরুষ-পতঙ্গরা কালো রঙের হয় অথবা তাদের গায়ে কালো ডোরা থাকে, আর স্ত্রী-পতঙ্গরা খানিকটা ফ্যাকাশে রঙের হয়ে থাকে।

অর্থোপ্টেরা (ঝিঁঝিঁপোকা ও ফড়িং) শ্রেণী। এই শ্রেণীর তিনটি বর্গের পুরুষ-পতঙ্গদের সঙ্গীত বা শব্দ সৃষ্টি করার শক্তিটা রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি বর্গ হল অ্যাকেটিডি বা ঝিঁঝিঁপোকা, লোকাস্টিডি বা পঙ্গপাল এবং অ্যাক্রিডিডি বা ফড়িং। পঙ্গপালরা যে-শব্দ সৃষ্টি করে তা এতই উচ্চ হয় যে রাতের বেলায় অন্তত এক মাইল দূর থেকেও তা শোনা যায়। এদের কয়েকটি প্রজাতির দ্বারা সৃষ্ট শব্দ মোটেই কর্কশ নয়, এমনকী মানুষের কানেও তা শ্রুতিমধুর শোনায় আর তা শোনার জন্যই আমাজন অঞ্চলের ইন্ডিয়ানরা এদের বেতের খাঁচায় আটকে রাখে। এদের যাঁরা পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেছেন যে মূক স্ত্রী-পতঙ্গদের ডাকা অথবা উত্তেজিত করে তোলার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয় এই শব্দসৃষ্টির ক্ষমতাটা। রাশিয়ার পরিযায়ী পঙ্গপালদের মধ্যে স্ত্রী-পতঙ্গদের দ্বারা মনোমতো পুরুষ-পতঙ্গ নির্বাচন করার একটা কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যের কথা উল্লেখ করেছেন কোর্তে।[৬] এই প্রজাতির (Pachytylus migratorius) পুরুষ-পতঙ্গরা যখন স্ত্রী-পতঙ্গদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন অন্য কোনও পুরুষ-পতঙ্গকে সেদিকে এগোতে দেখলে রাগে অথবা ঈর্ষায় প্রচণ্ড জোরে শব্দ করতে শুরু করে তারা। সাধারণত ঝিঁঝিঁপোকারা রাত্রে কোনও কারণে চমকিত বা আতঙ্কিত হলে অন্যান্য ঝিঁঝিঁপোকাদের সতর্ক করার জন্য ডাকতে শুরু করে। উত্তর আমেরিকার কেলি-ডিড-রা (Platyphyllum concavum, এক ধরনের পঙ্গপাল) কোনও-একটা গাছের ওপরদিকের ডালে চড়ে বসে এবং 'সন্ধেবেলায় উঁচুগলায় ডাকাডাকি করতে শুরু করে আর তার প্রত্যুত্তরে আশপাশের গাছ থেকে ভেসে আসতে থাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের গলার স্বর। সবার ডাকাডাকি মিলে এলাকাটা ভরে উঠে 'কেলি-ডিড-শি-ডিড' রবে। সারারাত ধরে চলতে থাকে এই ডাকাডাকির পালা।'

৬। তথ্যটি আমি পেয়েছি কোপেন্-এর লেখা থেকে। দ্রষ্টব্য, কোপেন, 'Ueber die Heuschrecken in Sudrussland', পৃঃ ৩২। অনেক চেষ্টা করেও কোর্তে-র নিজের লেখাটি সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি আমি।

ইউরোপীয় মেঠো-ঝিঁঝিঁপোকাদের (অ্যাকেটিডি বর্গের অন্তর্ভুক্ত) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মিঃ বেটস বলেছেন, 'পুরুষ-পতঙ্গরা সন্ধেবেলায় নিজেদের গর্তের প্রবেশপথের সামনে বসে উঁচুগলায় ডাকতে শুরু করে। কোনও স্ত্রী-পতঙ্গ তার দিকে এগিয়ে না-আসা পর্যন্ত একটানা ডেকে চলে তারা। কোনও স্ত্রী-পতঙ্গ এগিয়ে আসার পরেও তারা ডাকে ঠিকই, তবে ওই উঁচু স্বরটা তখন অনেক মৃদু, অনেক নিচু হয়ে যায়। অতঃপর ওই সফল সঙ্গীতজ্ঞটি নিজের শুঙ্গ দিয়ে আদর করতে শুরু করে তার বিজিতা সঙ্গিনীকে।'[৭] ডঃ স্কাডার একবার একটি পরীক্ষা করেছিলেন। একটা শজারুর কাঁটাকে একটা উখার গায়ে ঘষে ঘষে এক ধরনের শব্দ সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। সেই শব্দ শুনে উত্তেজিত হয়ে এই বর্গের একটি পতঙ্গ পাল্টা শব্দ সৃষ্টি করে তার জবাব দিতে শুরু করেছিল। ফন সিবল্ড পরীক্ষা করে দেখেছেন এদের উভয় লিঙ্গেরই সদস্যদের শ্রবণযন্ত্রটা খুব শক্তিশালী হয়। এই শ্রবণযন্ত্রটা তাদের সামনের পায়ে থাকে।

উল্লেখিত তিনটি বর্গের পতঙ্গদের শব্দ সৃষ্টি করার প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। অ্যাকেটিডি বর্গের পুরুষ-পতঙ্গদের উভয় পক্ষাবরণীতে একই অঙ্গ থাকে। ল্যান্ডোয়া বলেছেন, মেঠো-ঝিঁঝিঁপোকাদের (Gryllus Campestris, ১১নং চিত্র) এই অঙ্গটি গঠিত হয় পক্ষাবরণীর একটি নার্ভার-এর (nervure) নীচের দিকে অবস্থিত ১৩২ থেকে ১৩৮টি তীক্ষ্ণ ও তির্যক দাঁতের (st) সাহায্যে। ওই দন্তবিশিষ্ট নার্ভারটি বিপরীত দিকের ডানার ওপরদিকের একটি অভিক্ষিপ্ত, মসৃণ ও শক্ত নার্ভার-এর (r) ওপর দিয়ে দ্রুত ঘষে যায়। প্রথমে একটি ডানা অন্য ডানাটির ওপরে ঘর্ষিত হয়, তারপর দ্বিতীয় ডানাটি ঘর্ষিত হয় প্রথম ডানাটির ওপরে। দু'টি ডানা একইসঙ্গে একটু উঁচু হয়ে ওঠে, তার ফলে অনুরণন অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কয়েকটি প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের পক্ষাবরণীর নীচের দিকে লেজের মতো একটা চাকতি থাকে। গ্রাইলাস-দের অন্য একটি প্রজাতির, যারা গ্রাইলাস ডোমেস্টিকাস নামে পরিচিত, তাদের নার্ভার-এর নীচের দিকে দাঁতের একটা ছবি পাঠকদের সামনে পেশ করছি আমি (১২ নং চিত্র)। এই দাঁতগুলির গঠন সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডঃ গ্রুবার বলেছেন—এদের ডানা এবং শরীর যে-সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশ ও রোমের দ্বারা আবৃত থাকে সেই আঁশ ও রোমগুলি থেকেই নির্বাচনের সাহায্যে গড়ে উঠেছে এই দাঁতগুলি। কোলিওপ্টেরা-দের ব্যাপারে এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি আমিও। তবে এইসঙ্গেই ডঃ গ্রুবার আরও বলেছেন যে একটি ডানার সঙ্গে অন্য ডানাটির ঘর্ষণের ফলে যে-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, তা-ও এই দাঁতগুলি গড়ে ওঠার আংশিক কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

৭। 'দ্য ন্যাচারালিস্ট অন দ্য আমাজন্‌স্', খণ্ড ১, পৃঃ ২৫২। উল্লেখিত তিনটি বর্গের পতঙ্গদের সঙ্গীত বা শব্দসৃষ্টির অঙ্গগুলির ক্রমবিন্যাস প্রসঙ্গে চমৎকার আলোচনা করেছেন মিঃ বেটস।

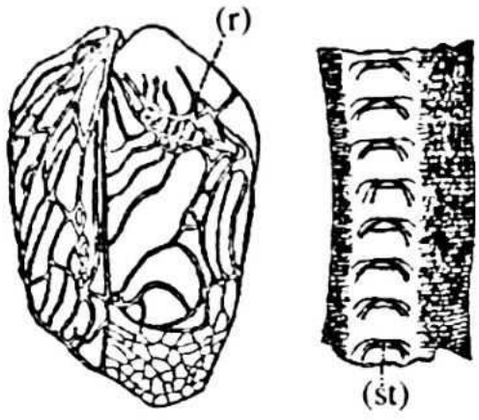

৭নং ছবি—গ্রাইলাস ক্যাম্পেসট্রি (ল্যান্ডোয়া-র গ্রন্থ থেকে নেওয়া)।
ডানদিকের ছবি—ডানার নার্ভার-এর নীচের দিক, অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে। ছবিতে দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে (st) । বাঁদিকের ছবি—পক্ষাবরণীর ওপরের দিক, যাতে রয়েছে অভিক্ষিপ্ত ও মসৃণ নার্ভার, (r) যার ওপর দিয়ে দাঁতগুলি (st) ঘর্ষিত হয়।

লোকাস্টিডি-দের ক্ষেত্রে পরস্পরের বিপরীত দিকে অবস্থিত পক্ষাবরণীগুলির গঠনকাঠামো পরস্পরের থেকে পৃথক ধরনের হয় (৯নং চিত্র) এবং পূর্বোক্ত বর্গের পতঙ্গদের মতো এদের ক্ষেত্রে প্রথম ডানাটি দ্বিতীয় ডানাটির ওপরে ঘর্ষিত হওয়ার

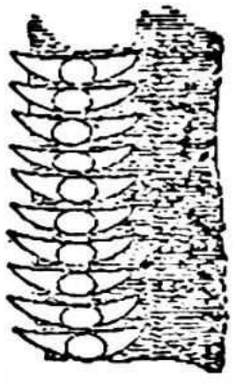

৮নং ছবি—গ্রাইলাস ডোমেস্টিকাস-এর নার্ভারের দাঁত (ল্যান্ডোয়া-র গ্রন্থ থেকে নেওয়া)।

পর দ্বিতীয় ডানাটি প্রথম ডানাটির ওপর ঘর্ষিত হতে পারে না। বাঁদিকের ডানাটি, যেটি ছড় হিসেবে কাজ করে, সেটি এসে পড়ে ডানদিকের ডানাটির ওপরে, যেটি বেহালা হিসেবে কাজ করে। বাঁদিকের ডানাটির নীচের দিকের একটি নার্ভারে (a) করাতের মতো তীক্ষ্ণ খাঁজ-কাটা থাকে এবং সেটি তার বিপরীত দিকের অর্থাৎ ডানদিকের ডানার ওপর দিকের অভিক্ষিপ্ত নার্ভারের ওপর ঘর্ষিত হয়। ব্রিটেনের ফাসগোনিউরা ভিরিডিসিমা প্রজাতির পতঙ্গদের পর্যবেক্ষণ করে আমি দেখেছি এদের খাঁজ-কাটা নার্ভারটি ঘর্ষিত হয় বিপরীত ডানার একেবারে পিছনদিকের গোলাকার কোণটির সঙ্গে এবং এই বিপরীত ডানার প্রান্তটি বেশ পুরু, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও বাদামি রঙের হয়ে থাকে। এদের ডানদিকের ডানায় (বাঁদিকের ডানায় এটি থাকে না) রুপোলি ধাতুর (talc) মতো স্বচ্ছ একটা ছোট চাকতি থাকে, চাকতিটির চারদিক

ঘিরে অনেকগুলি নার্ভার থাকে এবং এটিকে চিহ্নিত করা হয় স্পেকিউলাস বা আয়না নামে। এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত এফিপ্পিগার ভিটিয়াম প্রজাতির পতঙ্গদের মধ্যে বিচিত্র ধরনের একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এদের পক্ষাবরণীগুলো আকারে

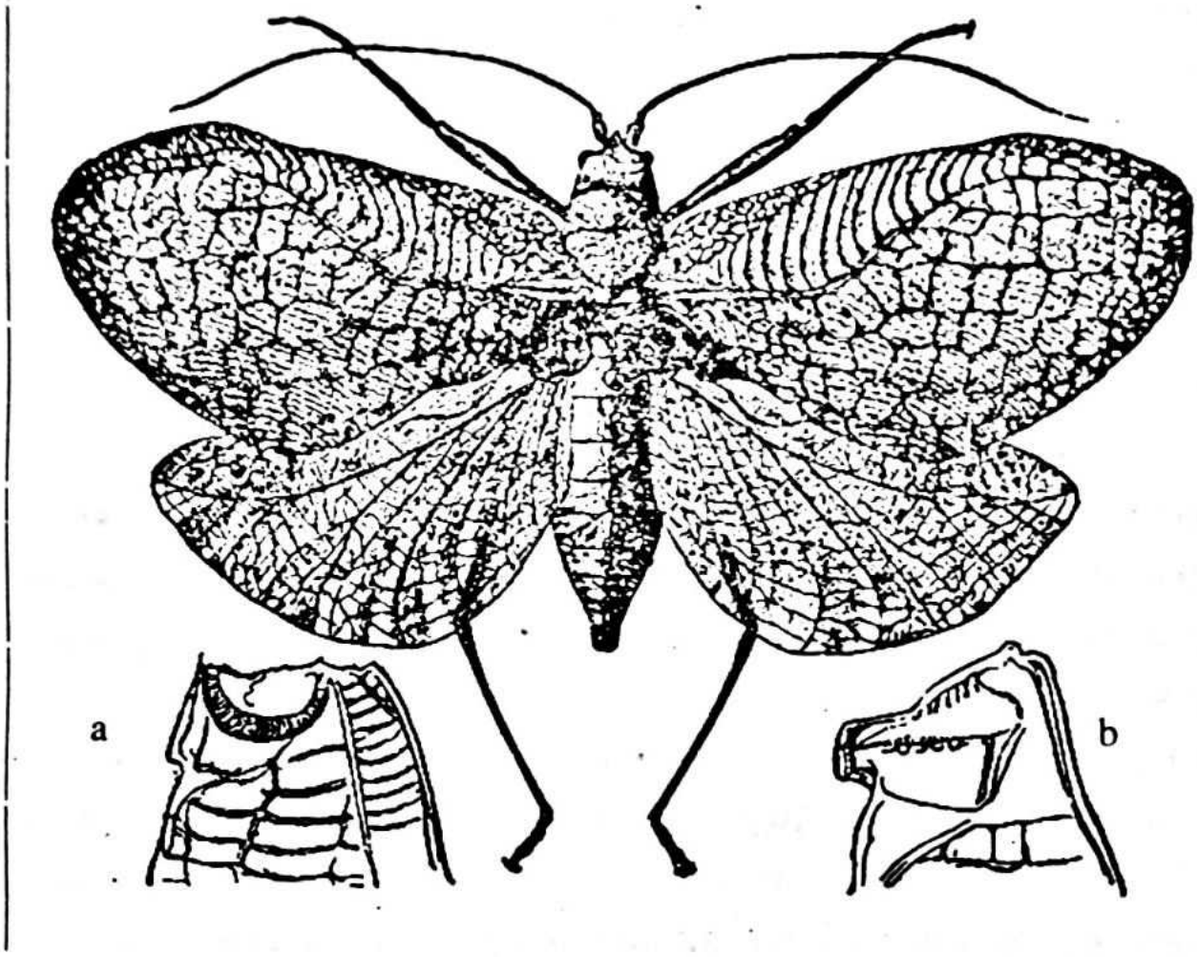

৯নং ছবি—ক্লোরোকিলাস টানানা (Chlorocoelus Tanana : বেটস-এর গ্রন্থ থেকে নেওয়া)। a, b—পরস্পরের বিপরীত দিকের পক্ষাবরণীগুলির বিভিন্ন অংশ।

অত্যন্ত ছোট হয়, কিন্তু 'বুকের একেবারে সামনের অংশের পিছনদিকটি পক্ষাবরণী-গুলির উপরে গম্বুজের মতো উঁচু হয়ে থাকে। এদের ডাক বা শব্দকে আরও জোরদার করে তোলার জন্যই সম্ভবত এই পরিবর্তনটি সাধিত হয়েছে।'

অ্যাকাটিডি, যাদের উভয় পক্ষাবরণীর গঠনকাঠামো একইরকম হয় এবং সেগুলির কাজও এক হয়, তাদের থেকে লোকাস্টিডেটি-দের (আমার মতে এই শ্রেণীর উৎকৃষ্টতম সঙ্গীতজ্ঞ বা শব্দসৃষ্টিকারীরা এই বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত) সঙ্গীত বা শব্দ সৃষ্টির অঙ্গগুলি যে অনেক বেশি পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য বা গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তবে এই লোকাস্টিডি-দের ডেক্‌টিকাস নামক প্রজাতিটির ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিলেন ল্যান্ডোয়া। তিনি দেখেছিলেন এদের ডানদিকের পক্ষাবরণীর নীচের দিকে ছোট ও সঙ্কীর্ণ একসারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত (প্রায় প্রাথমিক

স্তরের) থাকে। এই পক্ষাবরণীটি অন্য পক্ষাবরণীটির নীচের দিকে থাকে এবং কখনোই বেহালার ছড় হিসেবে কাজ করে না। ফাসগোনিউরা ভিরিডিসিমা প্রজাতির পতঙ্গদের ডানদিকের পক্ষাবরণীর নীচের দিকে এই একইরকম প্রাথমিক অঙ্গ লক্ষ করেছি আমি। এইসব তথ্যের ভিত্তিতে আমরা এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে লোকাস্টিডিরা উদ্ভূত হয়েছে এমন একটি আদিরূপ থেকে যাদের উভয় পক্ষাবরণীরই নীচের দিকে খাঁজ-কাটা নার্ভার ছিল (আজকের দিনের অ্যাকেটিডিদের মতো) এবং সেগুলোকে যখন-খুশি বেহালার ছড় হিসেবে ব্যবহার করা যেত। তবে লোকাস্টিডে-দের মধ্যে পক্ষাবরণী দু'টি শ্রম-বিভাজনের নীতি অনুযায়ী ক্রমশ পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও নিখুঁত হয়ে উঠেছে—একটি পক্ষাবরণী কাজ করে ছড় হিসেবে, অন্যটি কাজ করে বেহালা হিসেবে। ডঃ গ্রুবার-ও এই একই কথা বলেছেন এবং সেইসঙ্গেই দেখিয়েছেন যে এদের প্রাথমিক দশার দাঁতগুলি সাধারণত ডানদিকের ডানার নীচের দিকেই থাকে। অ্যাকেটিডিদের সাদামাটা বা বৈশিষ্ট্যহীন অঙ্গগুলো কোন্ কোন্ স্তরের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে তা আমাদের জানা নেই। তবে খুব সম্ভবত প্রথম অবস্থায় এদের দু'টি পক্ষাবরণীর নীচের অংশগুলো একে অপরের ওপরে এসে পড়ত (ঠিক যেমনটা দেখা যায় আজকের দিনের অ্যাকেটিডিদের মধ্যে) এবং নার্ভারগুলোর ঘর্ষণের ফলে একটা কর্কশ শব্দ সৃষ্টি হত—যেমনটা ঘটে থাকে এদের স্ত্রী-পতঙ্গদের পক্ষাবরণীর ক্ষেত্রে।[৮] এইভাবে মাঝেমধ্যে ঘটনাচক্রে যে-কর্কশ শব্দটা সৃষ্টি করত পুরুষ-পতঙ্গরা, যা হয়তো স্ত্রী-পতঙ্গদের উদ্দেশ্যে তাদের মিলনের আহ্বান হিসেবেও কিছুটা ভূমিকা পালন করত, তা যে যৌন নির্বাচন মারফত অনায়াসেই অত্যন্ত জোরদার একটা শব্দে পরিণত হতে পারে (প্রথম থেকেই বিদ্যমান নার্ভারগুলির রুক্ষতায় নানান পরিবর্তনের ফলে)—তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

এই শ্রেণীর অন্তিম বা তৃতীয় বর্গ হচ্ছে অ্যাক্রিডিডি বা ফড়িংরা। এদের ক্ষেত্রে ওই কর্কশ শব্দটা উদ্ভূত হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে, এবং ডঃ স্কাডার-এর মতে, এদের এই শব্দটা আগের দু'টি বর্গের পতঙ্গদের দ্বারা সৃষ্ট শব্দের মতো অত তীক্ষ্ণও হয় না। এদের উর্বাস্থির (femur) ভিতরের দিকে (১০নং চিত্র, r) লম্বালম্বিভাবে একসারি ক্ষুদ্রাকার, সুদৃশ্য, শল্যচিকিৎসকের ছুরিকাতুল্য এবং স্থিতিস্থাপক চরিত্রের দাঁত থাকে। সংখ্যায় এগুলো ৮৫ থেকে ৯৩-টা পর্যন্ত হয়ে থাকে। পক্ষাবরণীর তীক্ষ্ণ ও অভিক্ষিপ্ত নার্ভারগুলোর ওপরে ঘর্ষিত হয় এই দাঁতগুলো আর তার ফলে ওই নার্ভারগুলো স্পন্দিত ও অনুরণিত হয়। হ্যারিস বলেছেন—কোনও পুরুষ-পতঙ্গ যখন শব্দ সৃষ্টি করতে শুরু করে, তখন সে প্রথমে 'পিছনের পায়ের নলিটাকে

৮। মিঃ ওয়াল্শ্-ও আমাকে জানিয়েছেন যে প্ল্যাটিফাইলাম কংকেভাম প্রজাতির স্ত্রী-পতঙ্গরা বন্দী হলে 'একটি পক্ষাবরণীকে অন্য পক্ষাবরণীটির সঙ্গে ঘষে একরকম ক্ষীণ ও কর্কশ শব্দ সৃষ্টি করে।'

(shank) উরুর নীচে মুড়ে রাখে, সেখানে একটা খাঁজের মধ্যে আশ্রয় পায় নলিটা (নলিটাকে নিখুঁতভাবে গ্রহণ করতে পারার ছাঁচেই গড়ে উঠেছে এই খাঁজটা), অতঃপর পা-টাকে দ্রুত ওঠাতে-নামাতে শুরু করে সে। দু'টো বেহালাকে কখনোই একসঙ্গে বাজায় না সে, বাজায় পালা করে—প্রথমে একটাকে, তারপর অন্যটাকে।' অনেক প্রজাতির পতঙ্গদের পেটের নীচের দিকে একটা বড় গর্তের মতন ফাঁকা জায়গা থাকে যা অনুরণনের কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে বলেই মনে

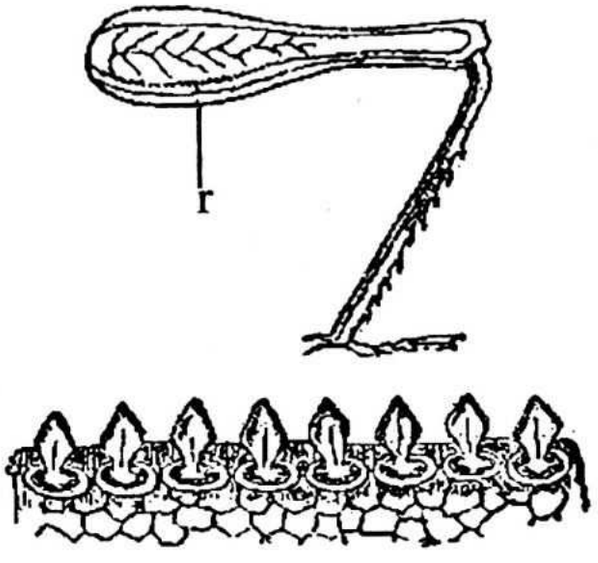

১০নং ছবি—স্টেনোবোথ্রাস প্র্যাটোরাম-এর পিছনের পা ; r—শব্দসৃষ্টিকারী অংশ।
নীচের ছবি : ওই অংশটি গঠনকারী দাঁতের সারি—অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে (ল্যান্ডোয়া-র গ্রন্থ থেকে নেওয়া)

হয়। এই বর্গেরই একটি দক্ষিণ আফ্রিকান প্রজাতির নাম নিউমোরা (Pneumora, ১১নং চিত্র)। এদের ক্ষেত্রে একটা নতুন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করি আমরা। এদের পুরুষ-পতঙ্গদের পেটের উভয় দিক থেকেই একটা করে খাঁজ-কাটা অংশ তির্যকভাবে সামনের দিকে বেরিয়ে থাকে এবং পিছনদিকের উর্বাস্থিগুলি এই অংশটিতেই ঘর্ষিত হয়। এদের পুরুষ-পতঙ্গদের ডানা থাকে (স্ত্রী-পতঙ্গদের কোনও ডানা থাকে না) বলে ব্যাপারটা আরও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, কারণ অন্য পতঙ্গদের ক্ষেত্রে যেমন উরুর সঙ্গে পক্ষাবরণীর ঘর্ষণ হয়, এদের ক্ষেত্রে তা হয় না। তবে এদের পিছনের পা-গুলো অত্যন্ত ছোট হওয়ার দরুনই এমনটা ঘটে থাকে—তা-ও হতে পারে। এদের উরুর ভিতরের দিকটা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ আমি পাইনি। তবে অন্যান্য পতঙ্গদের নজির দিয়ে বিচার করলে ধরে নেওয়া যায় যে এদের উরুর ভিতরের দিকেও সূক্ষ্ম খাঁজ-কাটা থাকে। অর্থোপ্টেরা বর্গের অন্য যে-কোনও পতঙ্গের তুলনায় নিউমোরা প্রজাতির পতঙ্গদের মধ্যে শব্দ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনেক বেশি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এদের পুরুষ-পতঙ্গদের গোটা শরীরটাই শব্দ বা

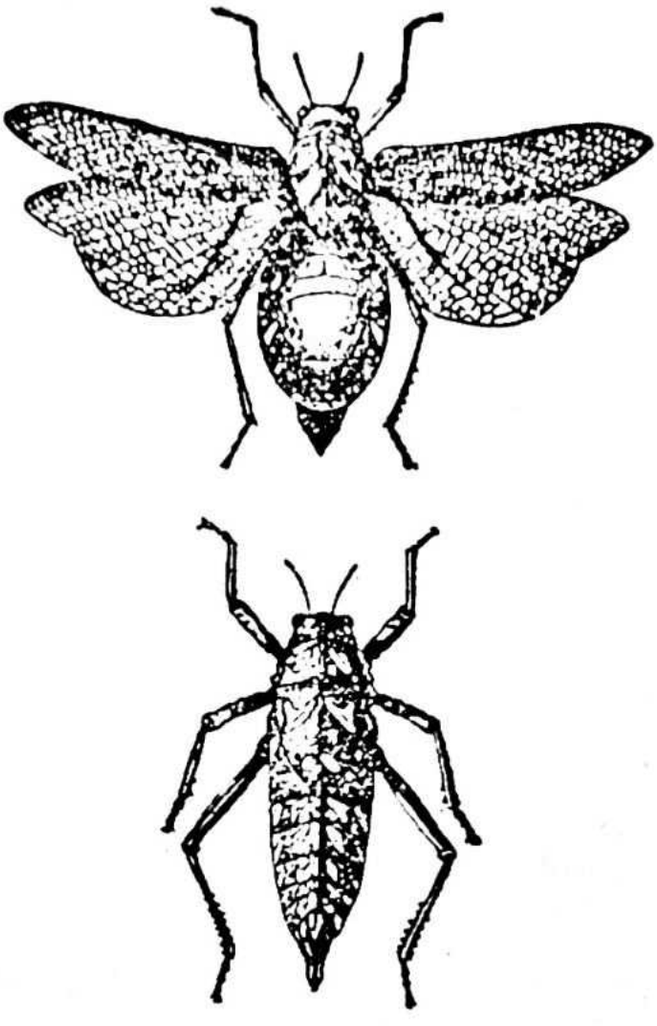

১১নং ছবি—নিউমোরা (ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত নমুনা থেকে গৃহীত)। ওপরের ছবিটি পুরুষ-পতঙ্গের, নীচের ছবিটি স্ত্রী-পতঙ্গের।

সঙ্গীত সৃষ্টির একটা যন্ত্রের রূপ নিয়েছে যেখানে বাতাস ঢুকলে কোনও শূন্য থলির মতোই তা ফুলে ওঠে এবং তার ফলে অনুরণনটাও জোরদার হয়ে ওঠে। মিঃ ট্রিমেন আমাকে জানিয়েছেন যে উত্তমাশা অন্তরীপে এইসব পতঙ্গরা রাত্রিবেলায় ভারী সুন্দর শব্দ সৃষ্টি করে থাকে।

উপরোক্ত তিনটি বর্গেরই স্ত্রী-পতঙ্গদের শরীরে শব্দ বা সঙ্গীত সৃষ্টির উপযোগী কোনও অঙ্গ সাধারণত থাকে না। তবে এই নিয়মের দু'-একটি ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। যেমন ডঃ গ্রুবার বলেছেন এফিপ্পিগার ভিটিয়াম প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের শরীরেই শব্দসৃষ্টির উপযোগী অঙ্গ থাকে, তবে স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গদের এই অঙ্গটির মধ্যে কিছুটা পার্থক্যও লক্ষ করা যায়। এ থেকে এমনটা ধরে নেওয়া যায় না ওই অঙ্গটি পুরুষ-পতঙ্গদের কাছ থেকেই সঞ্চারিত হয়েছে স্ত্রী-পতঙ্গদের মধ্যে (অন্য অনেক প্রাণীদের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে যেমনটা ঘটে থাকে)। ওই অঙ্গটা নিশ্চয়ই উভয় লিঙ্গের পতঙ্গদের মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবেই বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে সঙ্গমের মরশুমে এদের পুরুষ ও

স্ত্রী-পতঙ্গরা এই শব্দের সাহায্যে পরস্পরকে কাছে ডাকে। লোকাস্টিডি বর্গের অন্য অধিকাংশ পতঙ্গদের মধ্যে (তবে ল্যান্ডোয়া-র মতানুসারে ডেক্‌টিকাসদের মধ্যে নয়) দেখা যায় পুরুষদের শব্দসৃষ্টির অঙ্গের প্রাথমিক রূপটুকু স্ত্রী-পতঙ্গদের শরীরে বিদ্যমান থাকে। এক্ষেত্রে খুব সম্ভবত পুরুষ-পতঙ্গদের থেকেই ওই অঙ্গটা স্ত্রী-পতঙ্গদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। অ্যাকেটিডি বর্গের স্ত্রী-পতঙ্গদের পক্ষাবরণীর ওপর দিকে এবং অ্যাক্রিডিডি বর্গের স্ত্রী-পতঙ্গদের উর্বাস্থিতে এই ধরনের প্রাথমিক অঙ্গের অস্তিত্ব লক্ষ করেছেন ল্যান্ডোয়া। হোমোপ্‌টেরা শ্রেণীর স্ত্রী-প্রাণীদের শরীরেও শব্দ বা সঙ্গীত সৃষ্টির উপযোগী অঙ্গ থাকে, তবে তা থাকে একেবারে নিষ্ক্রিয় অবস্থায়, কোনও কাজে লাগে না। প্রাণিজগতের অন্যান্য শাখাগুলির মধ্যেও এমন বহু দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে পুরুষ-প্রাণীদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভিন্ন অঙ্গ স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যেও প্রাথমিক অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের কথা উল্লেখ করেছেন ল্যান্ডোয়া। তিনি বলেছেন যে অ্যাক্রিডিডি বর্গের স্ত্রী-পতঙ্গদের উর্বাস্থিতে শব্দসৃষ্টিকারী দাঁতগুলো সারা জীবন সেই অবস্থাতেই রয়ে যায় যে-অবস্থায় সেগুলো শূককীট অবস্থায় প্রথম দেখা দেয় উভয় লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যে। অন্যদিকে, পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যে ওই দাঁতগুলো বিকশিত হয়েই চলে এবং শেষবার নির্মোচনের পর যখন তারা সম্পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রজননক্ষম হয়ে ওঠে তখন ওই দাঁতগুলোও একেবারে নিখুঁত চেহারা নিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উল্লেখিত তথ্যসমূহ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অর্থোপ্‌টেরা শ্রেণীর পুরুষ-পতঙ্গরা বিভিন্ন উপায়ে শব্দসৃষ্টি করে থাকে এবং হোমোপ্‌টেরা শ্রেণীর পুরুষ-পতঙ্গদের শব্দসৃষ্টির উপায়ের থেকে তা সম্পূর্ণ পৃথক।[৯] প্রাণিজগতের সর্বত্রই আমরা লক্ষ করি যে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক বিভিন্ন উপায়ের সাহায্যে এই একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে থাকে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এইসব প্রাণীদের সমগ্র গঠনকাঠামোটায় বহুবিধ পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং সম্ভবত সেটাই এই বিভিন্নতার মূল কারণ। শরীরের এক-একটা অংশে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এক-একটা পরিবর্তন শব্দসৃষ্টির পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে উঠেছে। অর্থোপ্‌টেরা শ্রেণীর তিনটি বর্গ ও হোমোপ্‌টেরা শ্রেণীর পতঙ্গদের শব্দসৃষ্টির উপায়ের বিভিন্নতা থেকে আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি স্ত্রী-পতঙ্গদের ডাকা বা তাদের প্রলুব্ধ করার জন্য পুরুষ-পতঙ্গদের পক্ষে এই অঙ্গগুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থোপ্‌টেরাদের মধ্যে এই অঙ্গগুলোর ব্যাপারে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে তা আজ আর আমাদের বিস্মিত করে না, কারণ ডঃ স্কাডার-এর আবিষ্কার আমাদের

৯। সম্প্রতি অর্থোপ্‌টেরা শ্রেণীর কয়েকটি প্রজাতির মধ্যে এমন কিছু প্রাথমিক অঙ্গের সন্ধান পেয়েছেন ল্যান্ডোয়া যেগুলো হোমোপ্‌টেরা শ্রেণীর পতঙ্গদের শব্দসৃষ্টির অঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত। ঘটনাটা রীতিমতো বিস্ময়কর।

জানিয়ে দিয়েছে যে এইসব পরিবর্তন একদিনে ঘটেনি, ঘটেছে দীর্ঘ সময় ধরে। নিউ ব্রান্‌স্‌উইক-এর ডেভোনিয়ান (Devonian, ভূতাত্ত্বিক যুগ যা মোটামুটিভাবে ৩৯৫ থেকে ৩৪৫ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল) স্তরসমষ্টি থেকে সম্প্রতি একটি পতঙ্গের জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন ডঃ স্কাডার। দেখা গেছে পতঙ্গটির শরীরে 'পুরুষ-লোকাস্টিডিদের সেই সুপরিচিত বাদ্যযন্ত্র বা শব্দসৃষ্টির অঙ্গটি বিদ্যমান।' পতঙ্গটি যে বহুলাংশে নিউরোপ্‌টেরা শ্রেণীর পতঙ্গদের সদৃশ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেইসঙ্গেই নিউরোপ্‌টেরা ও অর্থোপ্‌টেরা শ্রেণীর পতঙ্গদের একসূত্রে গ্রথিতও করে দিয়েছে পতঙ্গটি (অতি প্রাচীন যুগের বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে যে-ব্যাপারটা প্রায়শই চোখে পড়ে)।

অর্থোপ্‌টেরা শ্রেণীর পতঙ্গদের ব্যাপারে আর অল্প কয়েকটা কথাই বলার আছে। এদের কয়েকটি প্রজাতির পতঙ্গরা অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় হয়। দুটি পুরুষ মেঠো-ঝিঁঝিঁ-পোকা (Gryllus campestris) এক জায়গায় আটকা পড়লে তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দেয় এবং কোনও-একজন মারা না-যাওয়া অবধি সে-লড়াই বন্ধ হয় না। মান্টিস প্রজাতির পতঙ্গরা তাদের সামনের দিকের তরবারির মতো প্রত্যঙ্গের সাহায্যে মারামারি করে, যেভাবে তরবারির সাহায্যে যুদ্ধ করে অশ্বারোহী সৈনিকরা। চীনারা এইসব পতঙ্গদের বাঁশের তৈরি ছোট ছোট খাঁচায় আটকে রাখে এবং লড়ুয়ে-মোরগদের মতো এদের মধ্যেও বাছাই করে মিলন ঘটায়। গাত্রবর্ণের ব্যাপারে বলা যায়—কয়েক ধরনের পঙ্গপালদের শরীরে চমৎকার অঙ্গসজ্জা থাকে। এদের পিছনের ডানাগুলো লাল, নীল ও কালো রঙে চিত্রিত হয়। কিন্তু যেহেতু এই গোটা শ্রেণীটার কোনও প্রজাতির ক্ষেত্রেই স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গদের গাত্রবর্ণের মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য থাকে না, সেহেতু এদের গায়ের ওই উজ্জ্বল রঙটাকে যৌন নির্বাচনের ফল হিসেবে ধরে নেওয়ারও কোনও কারণ থাকে না। উজ্জ্বল গাত্রবর্ণটা হয়তো এইসব পতঙ্গদের জীবনে একটা সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে, কারণ ওই গাত্রবর্ণ অন্যদের জানিয়ে দেয় যে খাদ্য হিসেবে এরা মোটেই রুচিকর হবে না। নানা জাতের পাখি ও টিকটিকিদের সামনে এক জাতের উজ্জ্বল রঙের ইন্ডিয়ান পঙ্গপালকে খাদ্য হিসেবে এগিয়ে দিয়ে দেখা গেছে ওইসব পাখি বা টিকটিকিরা কখনোই তাদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেনি। তবে এই শ্রেণীর কয়েকটি প্রজাতির স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা গেছে। এক জাতের আমেরিকান ঝিঁঝিঁপোকাদের পুরুষদের[১০] গায়ের রঙ একেবারে হাতির দাঁতের মতন

১০। ইক্যান্‌থাস নিভালিস। হ্যারিস, 'ইনসেক্টস অফ নিউ ইংল্যান্ড', পৃঃ ১২৪। ভিক্টর ক্যারুস আমাকে জানিয়েছেন যে ইউরোপের ইক্যান্‌থাস পেলুসিডাস প্রজাতির স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যেও একইরকম পার্থক্য থাকে।

সাদা হয়, কিন্তু এদের স্ত্রী-পতঙ্গদের গায়ের রঙ সাদাটে থেকে শুরু করে সবুজাভ-হলুদ অথবা ঈষৎ কাল্‌চে হয়ে থাকে। মিঃ ওয়াল্‌শ্‌ আমাকে জানিয়েছেন যে স্পেকট্রাম ফিমোরেটাম (Spectrum femoratum—ফাসামিডি বর্গের এক ধরনের পতঙ্গ) প্রজাতির পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের গায়ের রঙ উজ্জ্বল বাদামি-হলুদ হয় আর 'পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী-পতঙ্গদের গায়ের রঙ হয় খানিকটা ফ্যাকাশে, আবছা, ধূসর-বাদামি ধরনের। উভয় লিঙ্গেরই অল্পবয়সী পতঙ্গদের গায়ের রঙ হয় সবুজ।' শেষত উল্লেখ করা যায় এক ধরনের ঝিঁঝিঁপোকাদের কথা। এদের পুরুষ-পতঙ্গদের 'একটা দীর্ঘ ঝিল্লিময় উপাঙ্গ থাকে যেটা তাদের মুখের ওপর ঘোমটার মতো পড়ে থাকে।' তবে এই উপাঙ্গটা এদের কোন্‌ কাজে লাগে, তা আমাদের জানা নেই।

নিউরোপ্‌টেরা (Neuroptera) শ্রেণী। এদের ব্যাপারে এখানে বিশেষ কিছু বলার দরকার নেই, শুধু গায়ের রঙের বিষয়টা ছাড়া। এদের এফিমেরিডি বর্গের পতঙ্গদের স্ত্রী-পুরুষের গাত্রবর্ণের আভায় সামান্য পার্থক্য থাকে, কিন্তু তার দরুন যে পুরুষ-পতঙ্গরা স্ত্রী-পতঙ্গদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এমন কথা বলা চলে না। লাইবেলুলিডি বা গয়াল-পোকাদের শরীর উজ্জ্বল সবুজ, নীল, হলুদ এবং সিঁদুররঙা আভায় সজ্জিত হয়। এদের স্ত্রী-পুরুষের গায়ের রঙে কিছু পার্থক্যও প্রায়শই চোখে পড়ে। অধ্যাপক ওয়েস্টউড বলেছেন, অ্যাগ্রিয়নিডি বর্গের কয়েকটি প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের 'গাত্রবর্ণ ঘন নীল এবং ডানাগুলি কালো রঙের হয়, অন্যদিকে এদের স্ত্রী-পতঙ্গদের গাত্রবর্ণ হয় হালকা সবুজ এবং তাদের ডানায় কোনও রঙ থাকে না।' আবার অ্যাগ্রিয়ন র‍্যাম্‌বুরি প্রজাতির পতঙ্গদের ক্ষেত্রে রঙের এই ব্যাপারটা ঠিক উলটো হয়। উত্তর আমেরিকার হেটেরিনা বর্গের পতঙ্গদের ক্ষেত্রে একমাত্র পুরুষ-পতঙ্গদেরই দু'ডানার নীচের দিকে একটা করে গাঢ় লাল বিন্দু থাকে। অ্যানাক্স জুনিয়াস প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের পেটের নীচের দিকটা ঘন সাগর-নীল রঙের হয় আর স্ত্রী-পতঙ্গদের ক্ষেত্রে এই রঙটা হয় ঘাসের মতো সবুজ। অন্যদিকে, এদের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত গম্ফাস বর্গের এবং অন্য আরও কয়েকটি বর্গের স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙে তেমন কোনও পার্থক্য থাকে না। গোটা প্রাণিজগতের সর্বত্রই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য অথবা সামান্য পার্থক্য কিংবা একেবারেই কোনও পার্থক্য না-থাকার ঘটনা আকছারই চোখে পড়ে। লাইবেলুলিডিদের অনেক প্রজাতির স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙে বিস্তর পার্থক্য থাকলেও এদের স্ত্রী-পতঙ্গদের দেখতে বেশি সুন্দর নাকি পুরুষ-পতঙ্গদের, তা বলা প্রায়শই বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একটু আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে অ্যাগ্রিয়নদের একটি প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গদের

স্বাভাবিক গাত্রবর্ণটা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়। এইসব পতঙ্গদের কারও ক্ষেত্রেই গায়ের রঙটা তাদের রক্ষাকবচ হিসাবে অর্জিত হয়েছে বলে মনে হয় না। এই বর্গের পতঙ্গদের খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন মিঃ ম্যাক্‌লাখ্‌লান। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে পাখি অথবা অন্যান্য শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অন্য যে-কোনও পতঙ্গের চেয়ে গয়াল-পোকাদের (যাদের পতঙ্গ-জগতের বাদশা বলা যায়) অনেক কম থাকে এবং তাঁর মতে এদের গায়ের উজ্জ্বল রঙটা যৌন আকর্ষণ হিসেবেই কাজ করে। কিছু কিছু গয়াল-পোকা বিশেষ বিশেষ রঙের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। মিঃ প্যাটারসন দেখেছিলেন অ্যাগ্রিয়নিডিরা, যাদের পুরুষদের গায়ের রঙ নীল হয়, তারা দল বেঁধে জমায়েত হত একটা মাছধরা জাহাজের নীলরঙা ভেলার ওপরে, আবার ওইখানেই অন্য দু'টি প্রজাতির পতঙ্গরা উজ্জ্বল সাদা রঙের দ্বারা আকৃষ্ট হত।

স্কেলভার-ই প্রথম লক্ষ করেন যে দুটি উপ-বর্গের কয়েকটি প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গরা যখন পুত্তলি (Pupa) অবস্থা থেকে প্রথম বেরিয়ে আসে তখন তাদের গায়ের রঙ ঠিক স্ত্রী-প্রাণীদের মতোই থাকে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাদের গায়ের রঙটা দুধে-নীল বর্ণের হয়ে ওঠে—ইথারে ও অ্যালকোহলে দ্রবণীয় এক ধরনের তেল তাদের শরীর থেকে ঝরে যায় বলেই এই ঘটনাটা ঘটে। মিঃ ম্যাক্‌লাখ্‌লান-এর মতে, লাইবেলুলা ডিপ্রেসা প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙের এই পরিবর্তনটা ঘটে তাদের রূপান্তরের অন্তত পনেরো দিন পরে, যখন স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গরা মিলনের জন্য তৈরি হয়ে ওঠে।

ব্রাউয়ার-এর মতে, নিউরোথেমিস-দের কয়েকটি প্রজাতির মধ্যে এক ধরনের দ্বিরূপতা লক্ষ করা যায়। এদের কিছু কিছু স্ত্রী-পতঙ্গের শরীরে সাধারণ ডানা থাকে, আবার অন্য কিছু স্ত্রী-পতঙ্গের ডানাগুলো 'ওই প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের ডানার মতো প্রচুর শিরাবিশিষ্ট হয়'। এই ঘটনাটিকে ব্রাউয়ার 'ব্যাখ্যা করেছেন ডারউইনীয় নীতির সাহায্যে। তাঁর মতে এইভাবে পাশাপাশি প্রচুর শিরা উঠে থাকাটা এদের পুরুষদের একটা অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্য যা সাধারণ নিয়ম অনুসারে সমস্ত স্ত্রী-পতঙ্গদের মধ্যে সঞ্চারিত না হয়ে আকস্মিকভাবে তাদের কয়েকজনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে।' অ্যাগ্রিয়নদের কয়েকটি প্রজাতির মধ্যে দ্বিরূপতার আর-একটি দৃষ্টান্তের কথা আমাকে জানিয়েছেন মিঃ ম্যাক্‌লাখ্‌লান। এদের কিছু কিছু পতঙ্গের গাত্রবর্ণ কমলা রঙের হয় এবং এই পতঙ্গরা সর্বদাই স্ত্রী-পতঙ্গ হয়ে থাকে। খুব সম্ভবত এটা পূর্বানুবৃত্তির (reversion) একটা উদাহরণ, কারণ প্রকৃত লাইবেলুলে-দের উভয় লিঙ্গের পতঙ্গদের গাত্রবর্ণ যখন আলাদা হয়, তখন স্ত্রী-পতঙ্গদের গায়ের রঙ কমলা বা হলুদ হয়ে থাকে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে অ্যাগ্রিয়নরা এমন কোনও আদিরূপ থেকে উদ্ভূত হয়েছে যাদের সঙ্গে যৌন বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে প্রকৃত লাইবেলুলে-দের সাদৃশ্য ছিল,

তাহলে এইভাবে পরিবর্তিত হওয়ার প্রবণতাটা শুধুমাত্র স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যেই বিদ্যমান থাকার মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার মতো আর কিছু থাকে না।

বেশির ভাগ গয়াল-পোকাই যে আকারে বড়, শক্তিশালী ও হিংস্র প্রকৃতির হয়, তা ঠিক। কিন্তু একমাত্র অ্যাগ্রিয়নদের কয়েকটি ক্ষুদ্রতর প্রজাতি ছাড়া এদের আর কোনও প্রজাতির পুরুষদের নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে দেখেননি মিঃ ম্যাক্‌লাখ্‌লান। এই শ্রেণীর আর-একটি বর্গ হল টারমাইট বা উইপোকা। এরা যখন দল বেঁধে কোথাও বাস করে, তখন প্রায়শই এদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই ছুটে বেড়াতে দেখা যায়—'পুরুষ-পোকারা ছোটে স্ত্রী-পোকাদের পিছনে, কখনও-কখনও দুটি পুরুষ-পোকা ধাওয়া করে একটি স্ত্রী-পোকাকে এবং তাকে জয় করার জন্য ব্যগ্রভাবে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয় ওই পুরুষ-পোকারা।' অ্যাট্রোপোস পালসেটোরিয়াস প্রজাতির পতঙ্গরা চোয়ালের সাহায্যে একরকম শব্দ সৃষ্টি করে এবং ওই প্রজাতির অন্য পতঙ্গরা সেই শব্দের উত্তর দেয়।

হাইমেনোপ্‌টেরা শ্রেণী। সার্সেরিস-দের (Cerceris, বোলতার মতো এক ধরনের পতঙ্গ) আভাস-আচরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সেই অতুলনীয় পর্যবেক্ষক মঁসিয়ে ফেব্‌র বলেছেন, 'কোনও বিশেষ স্ত্রী-পতঙ্গকে দখল করার জন্য পুরুষ-পতঙ্গরা হামেশাই নিজেদের মধ্যে মারামারিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। স্ত্রী-পতঙ্গটি এই যুদ্ধের আপাত-নিস্পৃহ দর্শক হয়ে বসে থাকে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিজয়ী পুরুষটির সঙ্গে উড়তে উড়তে চলে যায় সে।' ওয়েস্টউড বলেছেন, এক ধরনের করাতে-মাছিরা (Tenthredinae) 'চোয়াল বন্ধ করে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে।' মঁসিয়ে ফেব্‌র-এর কাছ থেকে আমরা জেনেছি কোনও বিশেষ স্ত্রী-পতঙ্গকে দখল করার জন্য নিজেদের মধ্যে মারামারিতে লিপ্ত হয় পুরুষ-সার্সেরিসরা। তাঁর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে রাখা দরকার যে এই শ্রেণীর পতঙ্গরা দীর্ঘ অদর্শনের পরও পরস্পরকে চিনে নিতে পারে এবং পরস্পরের প্রতি এদের আকর্ষণও খুব গভীর হয়। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা পিয়ের হুবার-এর কথা উল্লেখ করতে পারি, পর্যবেক্ষক হিসেবে যাঁর নৈপুণ্য প্রশ্নাতীত। কতকগুলি পিঁপড়েকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন হুবার। চার মাস পরে তাদের আবার এক জায়গায় আনেন তিনি। অতদিন পরেও পরস্পরকে চিনতে পারে তারা এবং একে অপরকে হুল দিয়ে আদর করতে থাকে। পরস্পরের অপরিচিত হলে তারা কী করত? নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করে দিত। পিঁপড়েদের দু'টো দলের মধ্যে যখন যুদ্ধ হয়, তখন অনেক সময় একই দলের পিঁপড়েরা ভুল করে একে অপরকে আক্রমণ করে বসে। কিন্তু ভুলটা উপলব্ধি করতে মোটেই দেরি হয় না তাদের, তখন পরস্পরকে সান্ত্বনা দেয় তারা।

এই শ্রেণীর স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যে গাত্রবর্ণের সামান্য কিছু পার্থক্য

থাকে ঠিকই, কিন্তু একমাত্র মৌমাছি বর্গের পতঙ্গরা ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটা কখনোই খুব নজরে পড়ার মতো হয় না। তবে এদের কয়েকটি বর্গের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই গায়ের রঙ এত চমৎকার হয় (যেমন খ্রাইসিস-দের মধ্যে, যাদের গায়ে সিঁদুরে ও সবুজ রঙ থাকে) যে এটাকে যৌন নির্বাচনের ফল হিসেবে ধরে নেওয়াই যায়। মিঃ ওয়াল্শ্-এর মতে ইখ্নিউমোনিডি-দের প্রায় সব প্রজাতির ক্ষেত্রেই পুরুষ-পতঙ্গদের গাত্রবর্ণ স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে হালকা রঙের হয়। অন্যদিকে, টেনথ্রেডিনিডি-দের পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙ স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে গাঢ় হয়ে থাকে। সাইরিসিডি বর্গের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙে প্রায়শই পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন, এদের সাইরেক্স জুভেনকাস প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ে কমলা রঙের ডোরা থাকে কিন্তু স্ত্রী-পতঙ্গদের রঙ হয় গাঢ় রক্তবর্ণ। তবে এদের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যে কাদের চাকচিক্য বেশি, তা বলা মুশকিল। ট্রেমেক্স কলাম্বো প্রজাতির স্ত্রী-পতঙ্গদের গায়ের রঙ পুরুষ-পতঙ্গদের চেয়ে উজ্জ্বলতর হয়। মিঃ এফ. স্মিথ আমাকে জানিয়েছেন যে বেশ কিছু প্রজাতির পুরুষ-পিঁপড়েদের গায়ের রঙ কালো হয় আর স্ত্রী-পিঁপড়েদের গায়ে কঠিন একটা আবরণ থাকে।

ওই পতঙ্গবিজ্ঞানীর (অর্থাৎ মিঃ এফ. স্মিথের) কাছ থেকেই আমি আরও জেনেছি যে মৌমাছিদের বর্গে, বিশেষত যে-সব প্রজাতির মৌমাছিরা সমাজবদ্ধভাবে বাস করে না তাদের ক্ষেত্রে, স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙে প্রায়শই পার্থক্য থাকে। পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙ সাধারণত উজ্জ্বলতর হয় এবং বম্বাস ও অ্যাপাথাস প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙ স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে অনেক বেশি পরিবর্তনশীল হয়। অ্যান্থোফেরা রেটুসা প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙ হয় তামাটে-বাদামি আর স্ত্রী-পতঙ্গদের রঙ পুরোপুরি কালো। জাইলোকোপা বর্গের বেশ কিছু প্রজাতির স্ত্রী-পতঙ্গদেরও গায়ের রঙ কালো হয় এবং এদের পুরুষ-পতঙ্গদের গাত্রবর্ণ হয় উজ্জ্বল হলুদ রঙের। অন্যদিকে, কয়েকটি প্রজাতির, যেমন অ্যান্ড্রিনা ফাল্ভা প্রজাতির স্ত্রী-পতঙ্গদের গায়ের রঙ পুরুষদের চেয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে থাকে। পুরুষ-পতঙ্গদের আত্মরক্ষার অন্য কোনও উপায় থাকে না বলে তাদের আত্মরক্ষার কিছু-একটা উপায় দরকার হয় আর স্ত্রী-পতঙ্গরা তাদের হুলের সাহায্যে নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে পারে বলে তাদের আত্মরক্ষার অন্য কোনও উপায়ের দরকার হয় না—গাত্রবর্ণের পার্থক্যের কারণটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়ে কোনও লাভ নেই। এইচ. মুলার, যিনি মৌমাছিদের অভ্যাস-আচরণকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তিনি বলেছেন যে এদের গায়ের রঙের এই পার্থক্যের প্রধান কারণ হল যৌন নির্বাচন। রঙের ব্যাপারে মৌমাছিদের অনুভূতি যে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মুলার বলেছেন, পুরুষ-মৌমাছিরা ব্যগ্রভাবে স্ত্রী-মৌমাছিদের খুঁজে বেড়ায় এবং তাদের

দখল করার জন্য নিজেদের মধ্যে মারামারিতে লিপ্ত হয়। তাঁর মতে, এইভাবে মারামারি করার দরুন কিছু কিছু প্রজাতির পুরুষ-মৌমাছিদের চোয়াল স্ত্রী-মৌমাছিদের চেয়ে আকারে বড় হয়ে গেছে। কোনও কোনও প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী-মৌমাছিদের চেয়ে পুরুষ-মৌমাছিরা সংখ্যায় অনেক বেশি হয়। এই সংখ্যাধিক্যটা হয় মরশুমের শুরুতেই দেখা দেয়, নয়তো সর্বদা ও সর্বত্রই বিদ্যমান থাকে, অথবা কোনও কোনও অঞ্চলে দেখা দেয়। এইরকম কিছু প্রজাতির কথা বাদ দিলে বাকি সব প্রজাতির মধ্যে কিন্তু আপাতভাবে স্ত্রী-মৌমাছিদেরই সংখ্যাধিক্য থাকে। কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী-মৌমাছিরা অধিকতর সুন্দর পুরুষ-মৌমাছিদের সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়, আবার অন্য কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে পুরুষ-মৌমাছিরাই বেছে নেয় অধিকতর সুন্দর স্ত্রী-মৌমাছিদের। এর ফলস্বরূপ কয়েকটি বর্গের বেশ কিছু প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের দেখতে পরস্পরের থেকে অনেকটাই আলাদা হয় কিন্তু তাদের স্ত্রী-পতঙ্গদের মধ্যে প্রায় কোনও পার্থক্যই থাকে না, আবার অন্য কয়েকটি বর্গের ক্ষেত্রে এর ঠিক বিপরীত ঘটনাটাই চোখে পড়ে। এইচ. মুলার-এর মতে, কোনও-একটি লিঙ্গের পতঙ্গরা যৌন নির্বাচন মারফত যে-গাত্রবর্ণটা অর্জন করেছে সেটা প্রায়শই কিছুটা পরিবর্তিত রূপে অন্য লিঙ্গের পতঙ্গদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গেছে—ঠিক যেভাবে স্ত্রী-পতঙ্গদের পরাগ-সংগ্রাহক অঙ্গটি প্রায়শই সঞ্চারিত হয়ে থাকে পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যে, যদিও এই অঙ্গটি ওই পুরুষ-পতঙ্গদের কোনও কাজেই লাগে না।[১১]

১১। মঁসিয়ে পেরিয়ের তাঁর 'la Selection sexuelle d' apres Darwin' ('Revue Scientifique', ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩, পৃঃ ৮৬৮) প্রবন্ধে বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা না-করেই একটি আপত্তি তুলেছেন। তাঁর মতে, সমাজবদ্ধভাবে বসবাসকারী মৌমাছিদের পুরুষ-পতঙ্গরা অ-নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে জন্মায় বলে নিজেদের নতুন বৈশিষ্ট্যগুলো তারা তাদের পুরুষ-সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারে না। আপত্তিটা রীতিমতো বিস্ময়কর। যে পুরুষ-মৌমাছির মধ্যে উভয় লিঙ্গের মিলনকে সহজতর করে তোলার মতো কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে অথবা যা তাকে স্ত্রী-মৌমাছিদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলে, তার দ্বারা নিষিক্ত কোনও স্ত্রী-মৌমাছি এমন ডিমই প্রসব করবে যা থেকে কেবলমাত্র স্ত্রী-মৌমাছিই জন্মাতে পারে। কিন্তু ওইসব ডিম থেকে জন্মানো স্ত্রী-মৌমাছিরা পরের বছর পুরুষ-মৌমাছিদের জন্ম দেবে। এ-রকম অবস্থায় ওই শেষোক্ত পুরুষ-মৌমাছিরা তাদের পুরুষ-মাতামহদের বৈশিষ্ট্যগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করবে না—এমন কথা বলাটা কি যুক্তিসঙ্গত হবে? কিছুটা সমতুল অন্য সাধারণ প্রাণীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়, দেখা যাক। সাদা রঙের কোনও চতুষ্পদ স্ত্রী-প্রাণী কিংবা সাদা রঙের কোনও স্ত্রী-পাখির সঙ্গে কালো গাত্রবর্ণ-বিশিষ্ট বর্গের কোনও পুরুষ-প্রাণী বা পুরুষ-পাখির যদি মিলন ঘটে এবং তাদের মিলনজাত পুরুষ ও স্ত্রী-সন্তানদের মধ্যেও যদি মিলন ঘটে, তাহলে এই শেষোক্তদের সন্তানদের মধ্যে কি তাদের পুরুষ-মাতামহের কালো গাত্রবর্ণের কোনও উত্তরাধিকারই থাকবে না? প্রজননাক্ষম শ্রমিক-মৌমাছিরা কীভাবে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তা ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট দুরূহ ঠিকই, তবে এই প্রজননাক্ষম জীবেরা কীভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের শক্তির আওতায় এসে পড়ে, তা আমি আমার 'অরিজিন অফ স্পিসিস' গ্রন্থে দেখানোর চেষ্টা করেছি।

মিউটিলা ইউরোপিয়া প্রজাতির পতঙ্গরা এক ধরনের তীক্ষ্ণ ও কর্কশ শব্দ সৃষ্টি করে থাকে। গুরো-র মতে, এদের উভয় লিঙ্গের সদস্যদেরই শব্দ সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকে। তিনি আরও বলেছেন যে, পেটের তৃতীয় এবং তার পূর্ববর্তী অংশগুলোর ঘর্ষণের ফলেই এই শব্দটা সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমি দেখেছি এদের শরীরের এই জায়গাগুলোয় খুব সূক্ষ্ম ও সমকেন্দ্র কিছু খাঁজ থাকে। তবে এদের বুকের অভিক্ষিপ্ত অক্ষকাস্থি (Collar), যার মধ্যে মাথাটি গ্রন্থিবদ্ধ হয়, সেখানেও এ-রকম খাঁজ থাকে। এই অক্ষকাস্থিটির গায়ে ছুঁচের ডগা দিয়ে আঁচড় কাটলে ঠিক ওইরকমই একটা শব্দ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এদের পুরুষ-পতঙ্গদের ডানা থাকে কিন্তু স্ত্রী-পতঙ্গরা ডানাহীন হয়, অথচ উভয়েরই ওইভাবে শব্দ সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকে—ব্যাপারটা রীতিমতো বিস্ময়কর। এটা সুবিদিত যে গুঞ্জনের সাহায্যে মৌমাছিরা নিজেদের বিভিন্ন আবেগ (যেমন, ক্রোধ) প্রকাশ করে থাকে। এইচ. মুলার জানিয়েছেন, স্ত্রী-মৌমাছিদের পিছনে ধাওয়া করার সময় কিছু কিছু প্রজাতির পুরুষ-মৌমাছিরা এক ধরনের সুরেলা শব্দ সৃষ্টি করে থাকে।

কোলিওপ্টেরা (গুবরে-পোকা জাতীয়) শ্রেণী। এই শ্রেণীর কিছু প্রজাতির পতঙ্গদের গায়ের রঙ এমন হয় যার সঙ্গে মিল থাকে সেইসব জায়গার রঙের যে-সব জায়গায় তারা সাধারণত বেশি যাতায়াত করে। এর ফলে শত্রুরা তাদের খুঁজে বার করতে পারে না। আবার অন্য কিছু প্রজাতির পতঙ্গদের, যেমন হীরক-গুবরেদের (diamond-beetles), শরীরে রঙের চমৎকার কারুকাজ থাকে—ডোরা, বিন্দু, ক্রশচিহ্ন এবং অন্যান্য মনোরম নকশায় সজ্জিত থাকে এদের সারা শরীর। একমাত্র কয়েক ধরনের পুষ্পভোজী প্রজাতি ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে গায়ের এই রঙটা তাদের আত্মরক্ষার কোনও প্রত্যক্ষ উপায় হিসেবে কাজ করে বলে মনে হয় না। তবে রঙটা কোনও সতর্কবার্তা হিসেবে কিংবা পরস্পরকে চিনে নেওয়ার উপায় হিসেবে একটা ভূমিকা হয়তো পালন করে থাকে—যেমনটা দেখা যায় জোনাকিদের অনুপ্রভার (phosphorescence) ক্ষেত্রে। গুবরে-পোকাদের উভয় লিঙ্গের সদস্যদের গায়ের রঙ সাধারণত একইরকম হয়, কিন্তু এই রঙটা তারা যৌন নির্বাচন মারফত অর্জন করেছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। তবে সে-রকমটা হয়ে থাকা একেবারে অসম্ভব কিছুও নয়—কোনও-একটি লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যেই হয়তো প্রথমে দেখা দিয়েছিল রঙটা, তারপর তা সঞ্চারিত হয়েছে অন্য লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যে। এদের যে-সব প্রজাতির মধ্যে অন্যান্য সুস্পষ্ট অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যায়, তাদের ক্ষেত্রেও এই ধারণাটা কতকাংশে সত্যি হতে পারে। মিঃ ওয়াটারহাউস, জুনিয়র, আমাকে জানিয়েছেন যে দৃষ্টিশক্তিহীন গুবরে-পোকারা, যারা পরস্পরের সৌন্দর্য অনুভব করার সুযোগ পায় না, তাদের গায়ে অনেকসময়

একটা চক্‌চকে আস্তরণ থাকলেও কখনোই তারা উজ্জ্বল গাত্রবর্ণের অধিকারী হয় না। তবে এরা সাধারণত গুহায় এবং অন্যান্য অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় বসবাস করে বলেই এদের গায়ে উজ্জ্বল রঙ ফুটে ওঠে না—এমনটা হওয়াও একেবারে অসম্ভব নয়।

কয়েক ধরনের লংগির্কন, বিশেষত কয়েক ধরনের প্রায়োনিডি-দের মধ্যে একটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়—এদের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙ আলাদা আলাদা হয়। এইসব পতঙ্গদের অধিকাংশই আকারে বৃহৎ হয় এবং এদের গায়ে খুব উজ্জ্বল রঙ থাকে। মিঃ বেটস-এর সংগ্রহশালায় আমি দেখেছি পাইরোড্‌স[১২] বর্গের পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙ স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে সাধারণত বেশি লাল হলেও এই রঙটা স্ত্রী-পতঙ্গদের তুলনায় কিছুটা অনুজ্জ্বল হয় আর স্ত্রী-পতঙ্গদের গাত্রবর্ণ হয় কমবেশি উজ্জ্বল সোনালি-সবুজ। অন্যদিকে, একটি প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গরা সোনালি-সবুজ রঙের হয় আর স্ত্রী-পতঙ্গদের গায়ে লাল ও বেগ্‌নি-লাল রঙের উজ্জ্বল আভা থাকে। এস্‌মেরাল্‌ডা বর্গের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙে এত বেশি পার্থক্য থাকে যে এদের পৃথক পৃথক প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এদের একটি প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই গায়ের রঙ হয় উজ্জ্বল সবুজ, কিন্তু পুরুষ-পতঙ্গদের বুকের কাছটা লাল রঙের হয়ে থাকে। ওই প্রায়োনিডিদের, যাদের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙে পার্থক্য থাকে, তাদের স্ত্রী-পতঙ্গদের গাত্রবর্ণ পুরুষ-পতঙ্গদের থেকে উজ্জ্বল হয়। যৌন নির্বাচন মারফত অর্জিত গাত্রবর্ণের ব্যাপারে যে-সাধারণ নিয়মটার অস্তিত্ব আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখতে পাই, তার সঙ্গে এদের এই ব্যাপারটা মোটেই সাযুজ্যপূর্ণ নয়।

১২। 'Transact, Ent. Soc.', ১৮৬৯, পৃঃ ৫০-এ মিঃ বেটস এই পাইরোড্‌স্ পাল্‌চেরিমাস-দের কথা বর্ণনা করেছেন যাদের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যে রীতিমতো নজরে পড়ার মতো পার্থক্য থাকে। কোলিওপ্‌টেরা শ্রেণীর অন্য যে-সব প্রজাতির স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যে গাত্রবর্ণের পার্থক্য থাকার কথা আমার গোচরে এসেছে, তা থেকে কয়েকটা দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করা যায়। কার্বি ও স্পেন্স ('ইনট্রোডাকশন টু এনটোমোলজি', খণ্ড ৩, পৃঃ ৩০১) উল্লেখ করেছেন ক্যান্থারিস, মেলো, র‍্যাগিয়াম এবং লেপ্‌চুয়া টেসট্যাসিয়া-দের কথা। এই শেষোক্ত প্রজাতিটির পুরুষ-পতঙ্গদের শরীরে একটা কঠিন আবরণ থাকে এবং বুকটা কালো রঙের হয়, আর স্ত্রী-পতঙ্গদের সারা শরীরটা অনুজ্জ্বল লাল রঙের হয়ে থাকে। শেষোক্ত দু'টি প্রজাতির পতঙ্গরা লংগিকর্ন বর্গের অর্ন্তভুক্ত। মিঃ আর. ট্রিমেন এবং মিঃ ওয়াটারহাউস, জুনিয়র, আমাকে ল্যামেলিকর্ন বর্গের দু'টি প্রজাতির পতঙ্গদের কথা জানিয়েছেন। এই দু'টি প্রজাতি হল পেরিট্রিচিয়া ও ট্রাইখিয়াস। শেষোক্ত প্রজাতিটির পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙ স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে ফ্যাকাশে বা অনুজ্জ্বল হয়ে থাকে। টিলিয়াস ইলংগেটাস প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গরা কালো রঙের হয় আর স্ত্রী-পতঙ্গরা সর্বদাই গাঢ় নীল রঙের হয়ে থাকে এবং তাদের বুকটা লাল রঙের হয়। মিঃ ওয়াল্‌শ্ আমাকে জানিয়েছেন যে অর্সোডাকনা আট্রা প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গরাও কালো রঙের হয় এবং এদের স্ত্রী-পতঙ্গদের (তথাকথিত O. ruficollis) বুকটা পিঙ্গল বর্ণের হয়ে থাকে।

অনেক ধরনের গুবরে-পোকাদের উভয় লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যে একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্যের কথা এবার উল্লেখ করা যায়। এই পার্থক্যটা হল শুঙ্গের। পুরুষ-পতঙ্গদের মাথা ও বুক থেকে উদ্ভূত হয় এই বড় বড় শুঙ্গগুলো, কখনও-কখনও শরীরের নীচের দিক থেকেও উদ্ভূত হতে দেখা যায়। ল্যামেলিকর্ন বর্গের পতঙ্গদের এই শুঙ্গগুলো দেখতে অনেকটা হরিণ, গণ্ডার ইত্যাদি চতুষ্পদ প্রাণীদের শৃঙ্গের মতো। নানান আকৃতির এই শুঙ্গগুলো দেখতেও খুব সুন্দর, মাপেও চমৎকার। এগুলোর বর্ণনা দেওয়ার বদলে এখানে আমি পুরুষ ও স্ত্রী-পতঙ্গ উভয়েরই কিছু উল্লেখযোগ্য শুঙ্গের ছবি পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করছি (১২, ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৬নং চিত্র)। স্ত্রী-পতঙ্গদের মধ্যে শুঙ্গটা সাধারণত প্রাথমিক অঙ্গের আকারে থাকে যেটাকে দেখতে হয় ছোট কোনও গাঁটের মতো। আবার কোনও কোনও স্ত্রী-পতঙ্গের শরীরে এই শুঙ্গটা একেবারেই থাকে না, এমনকী প্রাথমিক অঙ্গের আকারেও নয়। অন্যদিকে, ফ্যানিউস ল্যান্‌সিফার প্রজাতির পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের শরীরেই সুবিকশিত শুঙ্গ দেখা যায়। এই বর্গের অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে এবং কপ্রি-দের মধ্যেও স্ত্রী-পতঙ্গদের শরীরে শুঙ্গ থাকে, তবে সেগুলোর বিকাশ একটু কম হয়। মিঃ বেটস আমাকে জানিয়েছেন যে এই বর্গের বিভিন্ন উপ-বিভাগের পতঙ্গদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নানারকম গুরত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে ঠিকই, কিন্তু সেইসব পার্থক্যের সঙ্গে শুঙ্গগত পার্থক্যের কোনও সম্পর্ক নেই। যেমন, অন্‌থোফ্যাগাস বর্গের বিভিন্ন প্রজাতির দিকে তাকালে দেখা যায় কোনও-কোনও প্রজাতির পতঙ্গদের একটিমাত্র শুঙ্গ থাকে, আবার কোনও-কোনও প্রজাতির পতঙ্গরা দু'টি শুঙ্গের অধিকারী হয়।

প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই শুঙ্গগুলো অত্যন্ত পরিবর্তনশীল ধরনের হয়ে থাকে। সবাইকে ধরলে পুরো একটা ক্রম সাজানো যায়—অত্যন্ত সুবিকশিত শুঙ্গবিশিষ্ট পুরুষ-পতঙ্গদের থেকে শুরু করে একেবারে অনুন্নত ধরনের শুঙ্গবিশিষ্ট পুরুষ-পতঙ্গ যাদেরকে স্ত্রী-পতঙ্গদের থেকে আলাদা করেই চেনাই দুঃসাধ্য। মিঃ ওয়াল্‌শ্‌ দেখেছেন যে ফ্যানিউস কারনিফেক্স প্রজাতির কয়েকটি পুরুষ-পতঙ্গের শুঙ্গ ওই প্রজাতির অন্য পুরুষ-পতঙ্গদের শুঙ্গের চেয়ে প্রায় তিনগুণ লম্বা হয়। অন্‌থোফ্যাগাস র‍্যাংগিফার (১৬নং চিত্র) প্রজাতির প্রায় একশোটি পুরুষ-পতঙ্গকে পরীক্ষা করে মিঃ বেটস ভেবেছিলেন যে অবশেষে তিনি এমন একটি প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন যাদের পুরুষ-পতঙ্গদের শুঙ্গের মধ্যে কোনওরকম ফারাক থাকে না। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় তাঁর ধারণাটি ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

শুঙ্গগুলোর অস্বাভাবিক মাপ এবং ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে একেবারে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শুঙ্গের উপস্থিতি—এই দু'টো ঘটনা থেকে মনে হয় বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল শুঙ্গগুলো। আবার একই প্রজাতির পুরুষদের

মধ্যে শুঙ্গের ব্যাপারে ব্যাপক পার্থক্য থাকে আর তা থেকে মনে হয় যে ওই উদ্দেশ্যটা কোনওভাবেই সুনির্দিষ্ট কোনও উদ্দেশ্য নয়। শুঙ্গগুলোতে কোনওরকম ঘর্ষণের চিহ্ন থাকে না, দেখলে মনে হয় নিতান্ত সাধারণ কিছু কাজেই ব্যবহৃত হয় ওগুলো। কারও কারও মতে, পুরুষ-পতঙ্গদেরকে স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে বেশি ঘুরে বেড়াতে হয় বলে শত্রুদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য শুঙ্গের দরকার হয় তাদের। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই এই শুঙ্গগুলো ভোঁতা ধরনের হয়, ফলে এগুলোকে আত্মরক্ষার উপযুক্ত অস্ত্র হিসেবে মেনে নেওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। আবার অন্য অনেকের মতে, নিজেদের মধ্যে মারামারি করার জন্যই পুরুষদের শরীরে এই শুঙ্গগুলো থাকে। কিন্তু এইসব পুরুষ-পতঙ্গদের কখনোই নিজেদের মধ্যে মারামারিতে লিপ্ত হতে দেখা যায়নি। এদের অসংখ্য প্রজাতিকে সযত্নে পর্যবেক্ষণ করেছেন মিঃ বেটস, কিন্তু নিজেদের মধ্যে মারামারির ফলে এদের শুঙ্গ ছিঁড়ে যাওয়ার বা ভেঙে যাওয়ার কোনও প্রমাণ তিনি খুঁজে পাননি। পুরুষ-পতঙ্গরা যদি স্বভাবগতভাবেই মারকুটে হত, তাহলে খুব সম্ভবত যৌন নির্বাচন মারফত তাদের শরীরগুলো বড় হয়ে উঠত যাতে করে তারা স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে আকারে বৃহত্তর হতে পারে। কিন্তু কোপ্রাইডি বর্গের শতাধিক প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গদের পরীক্ষা করে তাদের মধ্যে আকারগত কোনও পার্থক্যের নজির মিঃ বেটস খুঁজে পাননি। আবার, লেথ্‌রাস (Lethrus—ল্যামেলিকর্ন শ্রেণীর অন্তর্গত এক ধরনের গুবরে-পোকা) প্রজাতির

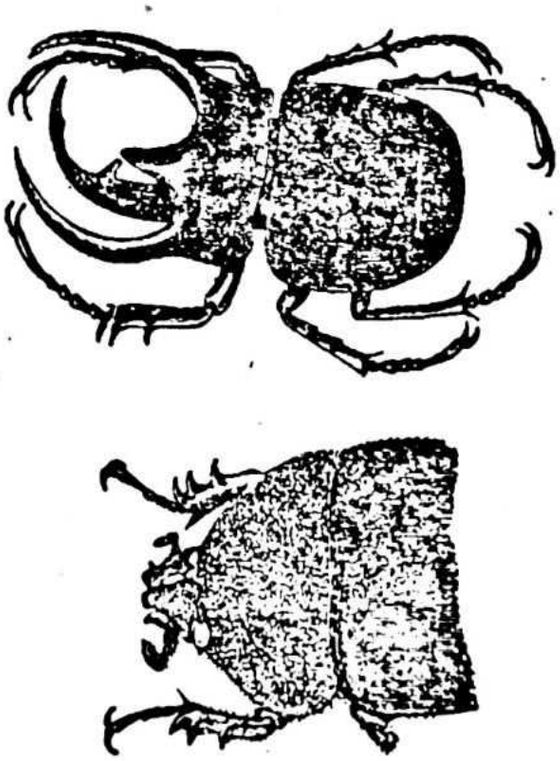

১২নং ছবি—চাল্‌কোসোমা অ্যাটলাস।
ওপরের ছবিটি পুরুষ-পতঙ্গের (ছোট করে দেখানো হয়েছে),
নীচের ছবিটি স্ত্রী-পতঙ্গের (স্বাভাবিক আকারেই দেখানো হয়েছে)।

পুরুষরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করলেও তাদের কোনও শুঙ্গ থাকে না, যদিও স্ত্রী-পতঙ্গদের তুলনায় তাদের চোয়াল অনেক বড় হয়।

এদের শুঙ্গগুলো অত্যন্ত সুবিকশিত হয় অথচ এই বিকাশ সব ক্ষেত্রে একই নিয়ম মেনে ঘটে না, যার প্রমাণ পাওয়া যায় একই প্রজাতির মধ্যে নানা ধরনের শুঙ্গের উপস্থিতি থেকে এবং ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির পতঙ্গদের মধ্যে পৃথক পৃথক ধরনের শুঙ্গের উপস্থিতি থেকে। এই তথ্যকে সামনে রেখে বিচার করলে সবথেকে সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত একটাই হতে পারে—শুঙ্গগুলো তারা অর্জন করেছিল অঙ্গসজ্জা হিসেবেই। প্রথম দর্শনে এই মতটাকে একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হয়, কিন্তু এদের চেয়ে অনেক উচ্চতর শ্রেণীর বিভিন্ন প্রাণী, যেমন মাছ, উভচর, সরীসৃপ ও পাখিদের দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই যে এদের বিভিন্ন ধরনের ঝুঁটি, গাঁট, শুঙ্গ, চূড়া ইত্যাদিও ঠিক ওই উদ্দেশ্যেই অর্জিত হয়েছে।

ওনাইটিস ফার্সিফার (১৭নং চিত্র, পৃঃ ১৪৪) প্রজাতির এবং এই বর্গের আরও কয়েকটি প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের সামনের উর্বাস্থিতে একটা বিচিত্র ধরনের অভিক্ষিপ্ত অংশ থাকে এবং বুকের নীচের দিকে থাকে একটা বিশালাকার কাঁটা অথবা একজোড়া শুঙ্গ। অন্যান্য পতঙ্গদের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী বিচার করলে মনে হয়—স্ত্রী-পতঙ্গদের ভালোভাবে আঁকড়ে ধরার কাজে এগুলো তাদের সাহায্য করে থাকে। পুরুষ-পতঙ্গদের শরীরের ঊর্ধ্বাংশে শুঙ্গের কোনও চিহ্নমাত্রও থাকে না, কিন্তু স্ত্রী-পতঙ্গদের মাথায় একটা প্রাথমিক ধরনের শুঙ্গ (১৮নং চিত্র, a) এবং বুকে একটা প্রাথমিক ধরনের চূড়া (b) থাকে। এই বিশেষ প্রজাতিটির পুরুষ-পতঙ্গদের বুকে এই চূড়ার মতন অভিক্ষিপ্ত অংশটি থাকে না ঠিকই, কিন্তু এদের স্ত্রী-পতঙ্গদের এই অংশটি যে আসলে পুরুষদের পক্ষে উপযুক্ত অভিক্ষিপ্ত অংশেরই একটি প্রাথমিক রূপ মাত্র, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যেমন, বুবাস বাইসন প্রজাতির (ওনাইটিসদের ঠিক পরের প্রজাতি) স্ত্রী-পতঙ্গদের বুকেও একইরকম চূড়া থাকে, কিন্তু তাদের পুরুষ-পতঙ্গদের বুকের ওই জায়গায় থাকে একটা বিরাট অভিক্ষিপ্ত অংশ। একইভাবে, ওনাইটিস ফার্সিফার প্রজাতির এবং এদের সদৃশ আরও দু'-তিনটি প্রজাতির স্ত্রী-পতঙ্গদের মাথার ওই ছোট্ট বিন্দুটাও (a) যে আসলে পুরুষদের মাথার শুঙ্গেরই প্রাথমিক রূপ, সে-কথাও নিঃসন্দেহেই বলা চলে। ল্যামেলিকর্ন বর্গের বহু পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যে, যেমন ফ্যানিউস-দের মধ্যে (১৪নং চিত্র, পৃঃ ১৪৪), এই ধরনের শুঙ্গ সর্বদাই লক্ষ করা যায়।

একসময় মনে করা হত প্রকৃতির পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণ করে তোলার জন্যই প্রাথমিক অঙ্গগুলি সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সে-ধারণাটা একেবারেই প্রযোজ্য নয়, বরং এদের ক্ষেত্রে সাধারণ অবস্থার একটা সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রই খুঁজে পাই

১৩ নং ছবি

১৪নং ছবি

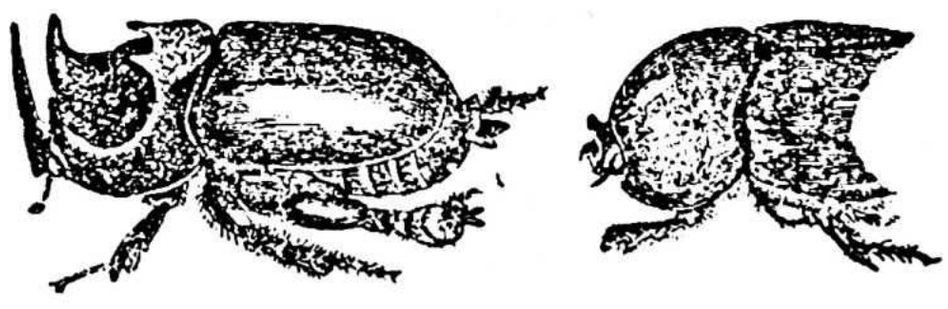

১৫নং ছবি

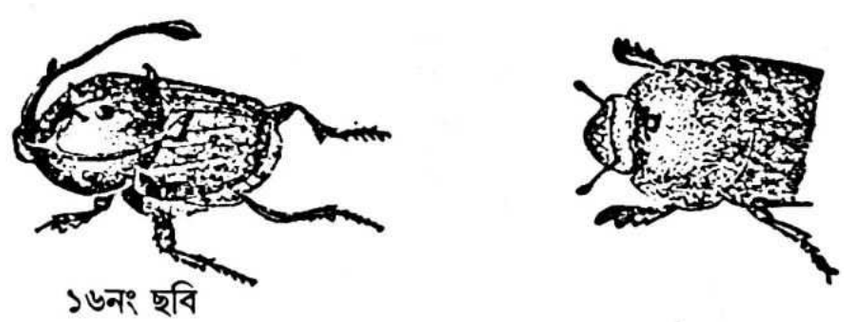

১৬নং ছবি

১৩ নং ছবি—কপ্রিস আইসিডিস।

বাঁদিকের ছবি পুরুষ-পতঙ্গের, ডানদিকের ছবি স্ত্রী-পতঙ্গের।

১৪নং ছবি—ফ্যানিউস ফনাস।

বাঁদিকের ছবি পুরুষ-পতঙ্গের, ডানদিকের ছবি স্ত্রী-পতঙ্গের।

১৫নং ছবি—ডাইপেলিকাস ক্যান্‌টোরি।

বাঁদিকের ছবি পুরুষ-পতঙ্গের, ডানদিকের ছবি স্ত্রী-পতঙ্গের।

১৬নং ছবি—অন্‌থোফ্যাগাস র‍্যাংগিফার (বড় করে দেখানো হয়েছে)।

বাঁদিকের ছবি পুরুষ-পতঙ্গের, ডানদিকের ছবি স্ত্রী-পতঙ্গের।

আমরা। যথেষ্ট যুক্তিসম্মতভাবেই আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে এদের পুরুষ-পতঙ্গদের শরীরে একসময় শুঙ্গের অস্তিত্ব ছিল এবং সেটাই প্রাথমিক অঙ্গের আকারে সঞ্চারিত হয়েছে স্ত্রী-পতঙ্গদের মধ্যে—যেমনটা ঘটতে দেখা গেছে ল্যামেলিকর্ন বর্গের অন্য বহু পতঙ্গদের ক্ষেত্রেও। পরবর্তীকালে পুরুষ-পতঙ্গরা কেন তাদের শুঙ্গ হারিয়ে ফেলল, তা আমাদের জানা নেই। তবে এটাকে এক ধরনের ক্ষতিপূরণের নীতির ফল হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ, শরীরের নীচের অংশে বড় বড় শুঙ্গ ও অভিক্ষিপ্ত অংশের উদ্ভবের দরুনই তারা তাদের মাথার শুঙ্গ হারিয়ে ফেলেছিল। আর এই ব্যাপারটা যেহেতু শুধুমাত্র পুরুষ-পতঙ্গদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, সেহেতু স্ত্রী-পতঙ্গদের শরীরের ঊর্ধ্বাংশে শুঙ্গের প্রাথমিক রূপটুকু বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

এতক্ষণ আমরা শুধু ল্যামেলির্কন বর্গের পতঙ্গদেরই উদাহরণ দিয়েছি, কিন্তু দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর গুবরে-পোকাদের কথাও এখানে বলা দরকার। এই শ্রেণী দু'টি হল কারকিউলায়োনিডি ও স্ট্যাফাইলিনিডি। এই দু'টি শ্রেণীর পুরুষ-পতঙ্গদের শরীরেও শুঙ্গ থাকে। প্রথমোক্তদের শুঙ্গ থাকে শরীরের নীচের অংশে আর শেষোক্তদের থাকে মাথার ওপর দিকে ও বুকে। স্ট্যাফাইলিনিডি শ্রেণীর কিছু কিছু প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের শুঙ্গগুলো অত্যন্ত পরিবর্তনশীল ধরনের হয়ে থাকে—ঠিক যেমনটা আমরা দেখেছি ল্যামেলিকর্ন বর্গের ক্ষেত্রেও। সায়াগোনিয়াম-দের মধ্যে এক ধরনের দ্বিরূপতা লক্ষ করা যায়। এদের পুরুষ-পতঙ্গদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এই দু'ভাগের পতঙ্গদের শরীরের আকার এবং শুঙ্গের বিকাশ পরস্পরের থেকে একেবারেই

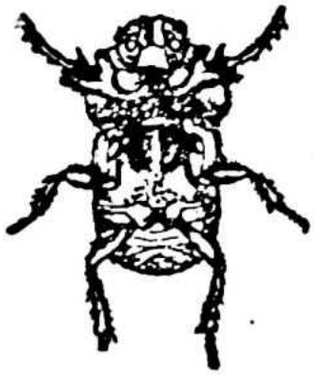

১৭নং ছবি—ওনাইটিস ফার্সিফার, পুরুষ-পতঙ্গ (নীচে থেকে দেখানো হয়েছে)।

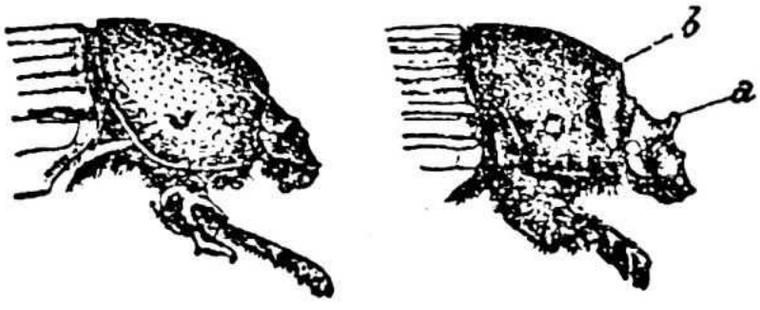

১৮নং ছবি—বাঁদিকের ছবিটি ওনাইটিস ফার্সিফার, পুরুষ-পতঙ্গের (পাশ থেকে দেখানো হয়েছে)। ডানদিকের ছবিটি ওই প্রজাতিরই স্ত্রী-পতঙ্গের।
a—মাথার শুঙ্গের প্রাথমিক রূপ।
b—বুকের শুঙ্গ বা চূড়ার চিহ্ন।

আলাদা ধরনের হয়, অথচ এই দু'ভাগের অন্তর্বর্তী স্তরের কোনও পুরুষ-পতঙ্গ থাকে না। স্ট্যাফাইলিনিডি শ্রেণীর ব্লেডিয়াস বর্গের (১৯নং চিত্র)

১৯নং ছবি—ব্লেডিয়াস টরাস (বড় করে দেখানো হয়েছে)।
বাঁদিকের ছবিটি পুরুষ-পতঙ্গের, ডানদিকের ছবিটি স্ত্রী-পতঙ্গের।

একটি প্রজাতির ব্যাপারে অধ্যাপক ওয়েস্টউড বলেছেন, 'একই অঞ্চলে এদের এমন অনেক পুরুষ-পতঙ্গের দেখা মেলে যাদের বুকের মাঝখানের শুঙ্গটা অত্যন্ত বড় অথচ মাথার শুঙ্গগুলো নিতান্তই প্রাথমিক স্তরের, আবার ওই একই অঞ্চলে এদের এমন অনেক পুরুষ-পতঙ্গদের দেখা মেলে যাদের বুকের শুঙ্গটা যথেষ্টই ছোট কিন্তু মাথার উদ্গত অংশটা (protuberance) বেশ দীর্ঘ।'[১৩] ওনাইটিসদের পুরুষ-পতঙ্গদের ঊর্ধ্বাংশের শুঙ্গ হারানোর ব্যাপারটিকে ক্ষতিপূরণের যে-নীতির সাহায্যে কিছুক্ষণ আগেই আমরা ব্যাখ্যা করেছি, সেই একই নীতি বোধহয় এদের ক্ষেত্রেও তার নিজস্ব নিয়মে কাজ করে গেছে।

যুদ্ধের নীতি। কিছু কিছু পুরুষ-গুবরেপোকা মারামারি করার ব্যাপারে তেমন পটু না-হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী-পতঙ্গদের দখল করার জন্য অন্য পুরুষ-পোকাদের সঙ্গে মারামারিতে লিপ্ত হয়। মিঃ ওয়ালেস একবার দেখেছিলেন লেপ্‌টোরিন্‌খাস অ্যাংগাসট্যাটাস (Leptorhynchus angustatus—লম্বা ঠোঁটবিশিষ্ট এক ধরনের গুবরে-পোকা, শরীরটা অনেকটা রেখার মতো) প্রজাতির দু'টি পুরুষ-পতঙ্গ 'একটি স্ত্রী-পতঙ্গকে দখল করার জন্যে নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে আর স্ত্রী-পতঙ্গটি পাশেই দাঁড়িয়ে আপন মনে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে চলেছে। পুরুষ-পতঙ্গ দু'টি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ঠোঁট দিয়ে পরস্পরকে গোঁত্তা দিচ্ছে, আঁচড়াচ্ছে, আঘাত করছে।' তবে এদের মধ্যে আকারে ক্ষুদ্রতর পুরুষ-পতঙ্গটি অবশ্য 'কিছুক্ষণের মধ্যেই হার মেনে নিয়ে রণে ভঙ্গ দিল।' কয়েকটি ক্ষেত্রে পুরুষ-গুবরেপোকাদের বড় বড় দাঁতওয়ালা চোয়াল থাকে যা স্ত্রী-পতঙ্গদের চোয়ালের চেয়ে অনেক বড় এবং তার সাহায্যেই তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। সাধারণ স্ট্যাগ্‌-বিট্‌ল্‌দের (Lucanus cervus) মধ্যে এই ব্যাপারটা লক্ষ করা যায়। এদের পুরুষ-পতঙ্গরা স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে অন্তত এক সপ্তাহ আগেই পুত্তলি অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে, ফলে প্রায়শই

১৩। 'মডার্ন ক্ল্যাসিফিকেশন অফ ইনসেক্টস', খণ্ড ১, পৃঃ ১৭২ : সায়াগোনিয়াম, পৃঃ ১৭২। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আমি সায়াগোনিয়ামদের একটি পুরুষ-পতঙ্গের নমুনা দেখেছি যেটি অন্তর্বর্তী অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ এদের দ্বিরূপতাটা কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নয়।

বেশ কিছু পুরুষ-পতঙ্গকে একটিই স্ত্রী-পতঙ্গের পিছনে ধাওয়া করতে দেখা যায়। এই সময়টায় এরা নিজেদের মধ্যে কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মিঃ এ. এইচ. ডেভিস একবার দু'টি পুরুষ-পতঙ্গকে একটি স্ত্রী-পতঙ্গের সঙ্গে একই বাক্সে রেখে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন আকারে ক্ষুদ্রতর পুরুষ-পতঙ্গটি হার মেনে সরে না-যাওয়া পর্যন্ত আকারে বৃহত্তর পুরুষ-পতঙ্গটি তাকে ক্রমাগত খোঁচা দিয়ে যাচ্ছিল। জনৈক বন্ধু আমাকে জানিয়েছেন যে অল্প বয়সে তিনি হামেশাই বেশ কিছু পুরুষ-পতঙ্গকে এক জায়গায় জড়ো করে তাদের মারামারি দেখতেন। সেইসময় তিনি লক্ষ করেছিলেন যে স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে পুরুষ-পতঙ্গরা অনেক বেশি সাহসী ও হিংস্র হয়ে থাকে—যা আমরা উচ্চতর শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও লক্ষ করে থাকি। পুরুষ-পতঙ্গদের সামনে তিনি নিজের আঙুল বাড়িয়ে দিলে তারা সেটা চেপে ধরত, কিন্তু স্ত্রী-পতঙ্গদের চোয়াল আরও শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তারা কখনোই তাঁর আঙুল চেপে ধরার চেষ্টা করত না। লুকানিডি বর্গের এবং উপরোল্লিখিত লেপ্‌টোরিন্‌খাস বর্গের বেশ কিছু প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গরা স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে আকারে বড় ও অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে। লেথ্রাস সেফ্যালোটেস (Lethrus cephalotes—ল্যামেলিকর্ন বর্গের অন্তর্গত একটি প্রজাতি) প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গরা একই গর্তে বসবাস করে এবং এদের স্ত্রী-পতঙ্গদের তুলনায় পুরুষ-পতঙ্গদের চোয়াল অনেক বড় হয়। সঙ্গমের মরশুমে অন্য কোনও পুরুষ-পতঙ্গ ওই গর্তে ঢোকার চেষ্টা করলে তাকে এক ভয়ংকর আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়। স্ত্রী-পতঙ্গটিও চুপচাপ বসে থাকে না। সে গর্তের মুখটা বন্ধ করে দিয়ে তার সঙ্গীটিকে পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে উৎসাহ জুগিয়ে চলে। হানাদার পুরুষটি নিহত না-হওয়া পর্যন্ত অথবা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত লড়াই বন্ধ হয় না। ল্যামেলিকর্ন বর্গের আর-একটি প্রজাতি, যাদের নাম হল অ্যাটিউথাস সিকাট্রিকোসাস, তারাও স্ত্রী-পুরুষে জোড় বেঁধে বসবাস করে এবং পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে থাকে। স্ত্রী-পতঙ্গটির মলপিণ্ডের মধ্যে ডিম্বাণুটি সংরক্ষিত থাকে এবং সেই পিণ্ডটি গুটিয়ে তোলার জন্য পুরুষ-পতঙ্গটি তাকে উত্তেজিত করে তোলে। স্ত্রী-পতঙ্গটিকে সরিয়ে নিলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পুরুষটি। আবার পুরুষ-পতঙ্গটিকে সরিয়ে নিলে স্ত্রী-পতঙ্গটি সমস্ত কাজকর্ম ত্যাগ করে, এবং, মিঃ ব্রুলেরি-র মতে, মারা না-যাওয়া পর্যন্ত ওই একই জায়গায় সে বসে থাকে চুপচাপ।

পুরুষ-লুকানিডিদের বড় বড় চোয়াল থাকে এবং এই চোয়ালগুলোর আকার ও গঠনকাঠামো উভয়ই অত্যন্ত পরিবর্তনশীল ধরনের হয়—ঠিক ল্যামেলিকর্ন ও স্ট্যাফাইলিনিডি বর্গের বহু প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের মাথার ও বুকের শৃঙ্গের মতোই। এদের সবথেকে বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত পুরুষ-পতঙ্গদের থেকে শুরু করে সবথেকে কম

সুবিধাপ্রাপ্ত পুরুষ-পতঙ্গ পর্যন্ত সবাইকে পরপর সাজালে নিখুঁত একটা ক্রম রচনা করা যায়। সাধারণ স্ট্যাগ্-বিট্‌ল্‌দের এবং সম্ভবত অন্য আরও কিছু প্রজাতির পতঙ্গদের চোয়ালগুলো যুদ্ধ করার পক্ষে খুব উপযুক্ত অস্ত্র ঠিকই, কিন্তু সেইজন্যই চোয়ালগুলোর আকার অত বড় কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমরা আগেই দেখেছি যে উত্তর আমেরিকার লুকানাস ইলেফাস প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের চোয়ালটা কাজে লাগে স্ত্রী-পতঙ্গদের আঁকড়ে ধরার জন্য। এই চোয়ালগুলো অত্যন্ত নজরকাড়া ধরনের এবং অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিভক্ত হয় এবং বেশি লম্বা হওয়ার জন্য এগুলো চাপ দেওয়ার পক্ষে খুব উপযুক্ত হয় না। এইসব তথ্য থেকে বিচার করে আমার মনে হয়েছে যে এগুলো হয়তো তাদের অঙ্গসজ্জা হিসেবেও কাজ করে থাকে—ঠিক যেমনভাবে বিভিন্ন প্রজাতির পতঙ্গদের মাথার ও বুকের শুঙ্গগুলো তাদের অঙ্গসজ্জা হিসেবে কাজ করে। এই একই বর্গের অন্তর্ভুক্ত আর-একটি চমৎকার পতঙ্গের কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। এরা হল দক্ষিণ চিলির চিয়াসোগ্‌ন্যাথাস গ্র্যান্টি। এদের পুরুষ-পতঙ্গদের বিশাল মাপের চোয়াল থাকে (২০নং চিত্র)। এরা রীতিমতো সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয় হয়। কেউ ভয় দেখালে এরা ঘুরে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোয়ালগুলো

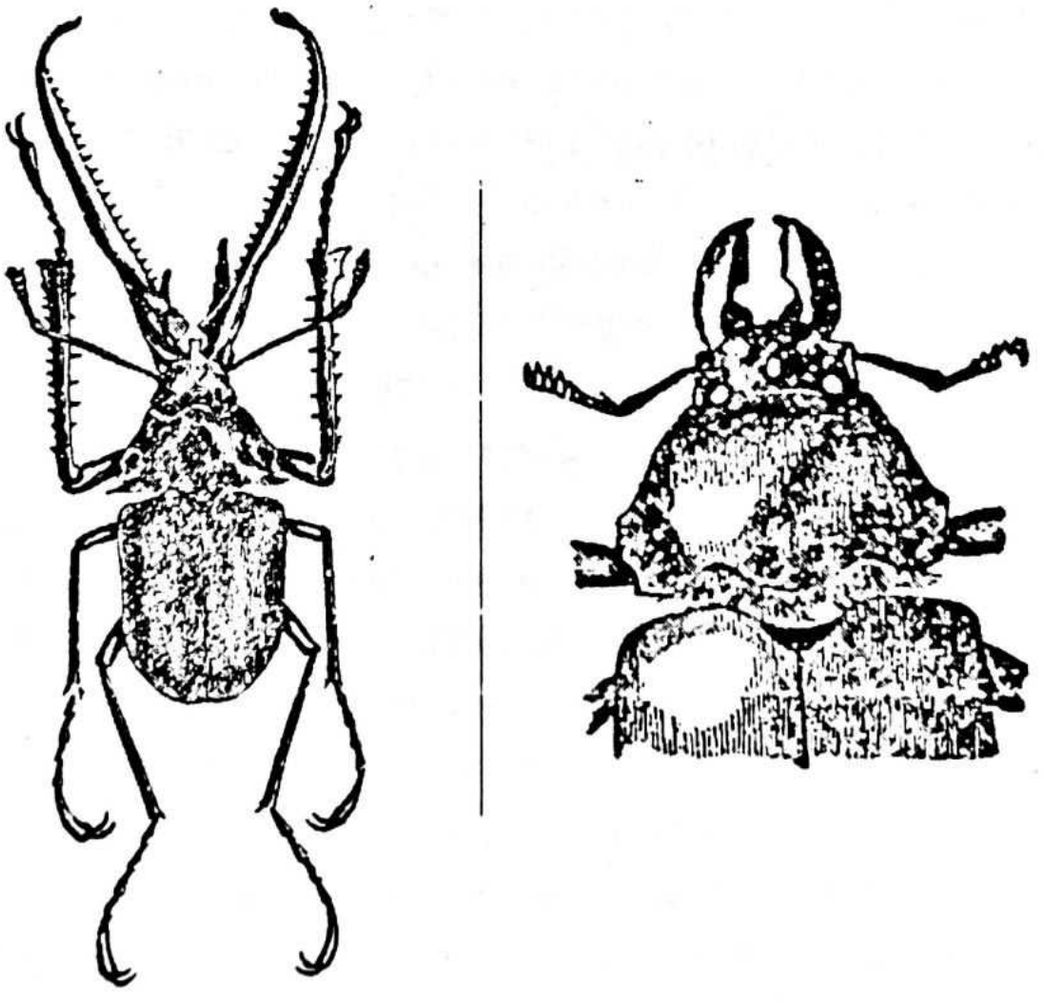

২০নং ছবি—চিয়ানোগ্‌ন্যাথাস গ্র্যান্টি (ছোট করে দেখানো হয়েছে)।
বাঁদিকের ছবিটি পুরুষ-পতঙ্গের, ডানদিকের ছবিটি স্ত্রী-পতঙ্গের।

ফাঁক করে দেয় এবং সেইসঙ্গেই জোরে জোরে শব্দ করতে থাকে। তবে মানুষের আঙুলে চাপ দিয়ে ব্যথা সৃষ্টি করার মতো জোর এদের চোয়ালে থাকে না। এটা আমি নিজেই পরীক্ষা করে দেখেছি।

যৌন নির্বাচন, যার জন্য প্রয়োজন হয় উপলব্ধির পর্যাপ্ত শক্তি ও প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তা গুবরে-পোকাদের অন্য যে-কোনও বর্গের তুলনায় ল্যামেলিকর্নদের মধ্যেই সবথেকে বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। কয়েকটি প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের শরীরে যুদ্ধ করার অস্ত্র থাকে, কিছু প্রজাতির পুরুষ ও স্ত্রী-পতঙ্গরা জোড় বেঁধে বাস করে এবং পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়, অনেক প্রজাতির পতঙ্গরা উত্তেজিত হয়ে উঠলে শব্দ সৃষ্টি করতে পারে, বেশ কিছু প্রজাতির পতঙ্গদের শরীরে অত্যন্ত বিস্ময়কর ধরনের শুঙ্গ থাকে যা আপাতভাবে তাদের অঙ্গসজ্জা হিসেবেই কাজ করে, আবার শুধু দিনের আলোয় চলাচলকারী কিছু প্রজাতির পতঙ্গদের শরীরে নানারকম জেল্লাদার রঙ থাকে। শেষত, গুবরে-পোকাদের মধ্যে আকারে বৃহত্তম বেশ কিছু প্রজাতির পতঙ্গরা এই বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত। লিনিয়াস এবং ফ্যাব্রিসিয়াস এই বর্গটিকে এই শ্রেণীটির একেবারে প্রথমে স্থান দিয়েছিলেন।

শব্দসৃষ্টিকারী অঙ্গ। পৃথক পৃথক বর্গের অন্তর্ভুক্ত বহু ধরনের গুবরে-পোকাদের শরীরেই এই অঙ্গের অস্তিত্ব থাকে। এদের এই শব্দ অনেক সময় বেশ কয়েক ফুট, এমনকী বেশ কয়েক গজ দূর থেকেও শোনা যায় বটে, তবে তা কিছুতেই অর্থোপ্টেরা বর্গের পতঙ্গদের দ্বারা সৃষ্ট শব্দের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এদের শরীরের উখার মতো অংশটায় থাকে একটা সরু ও ঈষৎ-উঁচু তল এবং তার ওপর আড়াআড়িভাবে থাকে খুব সূক্ষ্ম ও সমান্তরাল কিছু পঞ্জরাস্থি (rib)। কখনও-কখনও এই পঞ্জরাস্থিগুলো এতই সূক্ষ্ম হয় যে তা থেকে নানারকম রঙ দেখা যায় এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই পঞ্জরাস্থিগুলোকে দেখতেও খুব চমৎকার লাগে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, সেমন টাইফিউস মাইনিউট প্রজাতির পতঙ্গদের মধ্যে, দেখা যায় যে ওই উখাতুল্য অঙ্গের পঞ্জরাস্থিগুলোর মধ্যে দিয়ে সরু সরু চুল বা আঁশের মতো কিছু অভিক্ষিপ্ত উপাদান চলে গেছে এবং ওই চুল বা আঁশগুলো দিয়েই ওই অঙ্গের চারপাশের সবটা অঞ্চল প্রায় সমান্তরাল রেখার মতো করে ঢাকা পড়ে থাকে। এই চুল বা আঁশগুলো একত্রে মিলিত ও সোজা হয়ে ওঠার ফলে এবং সেইসঙ্গেই আরও অভিক্ষিপ্ত ও মসৃণ হয়ে ওঠার ফলেই এগুলোর পক্ষে ওই পঞ্জরাস্থিগুলোর মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া সম্ভব হয়। এদের শরীরের সংলগ্ন অংশে একটা শক্ত অঞ্চল থাকে যেটা ওই উখাটির ঘর্ষক হিসেবে কাজ করে, তবে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে এই ঘর্ষকটিকে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষভাবে পরিবর্তিত হতেও দেখা গেছে। এই ঘর্ষকটি দ্রুত উখাটির ওপর দিয়ে চলে যায় অথবা উখাটিই দ্রুত চলে যায় ঘর্ষকটির ওপর দিয়ে।

বিভিন্ন প্রজাতির পতঙ্গদের মধ্যে এই অঙ্গগুলো শরীরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অবস্থিত থাকে। শবভোজী বা ক্যারিয়ন-বিট্‌ল্‌দের (Necrophorus) শরীরে পেটের পঞ্চম অংশের পৃষ্ঠতলের ওপরে দুটো সমান্তরাল উখাতুল্য অঙ্গ (r—২১নং চিত্র) থাকে, প্রতিটি উখায় ১২৬ থেকে ১৪০টি পর্যন্ত সূক্ষ্ম পঞ্জরাস্থি থাকে। এই পঞ্জরাস্থিগুলো সামনের ডানার পিছনের দিকে ঘর্ষিত হয়, যে-ডানাগুলোর একটা ছোট অংশ এদের সাধারণ দেহরেখা থেকে একটু বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে। ক্রিওসেরিডি বর্গের বহু পতঙ্গদের মধ্যে এবং ক্লাইথ্রা ৪-পাংক্‌টাটা (Clythra 4-punctata—খ্রাইসোমেলিডি বর্গের একটি প্রজাতি) প্রজাতির পতঙ্গদের মধ্যে এবং টেনেব্রায়োনিডি ইত্যাদি বর্গের[১৪] কিছু প্রজাতির পতঙ্গদের শরীরে উখাটি থাকে পেটের পৃষ্ঠদেশীয় চূড়ায়, পাইজিডিয়াম বা প্রো-পাইজিডিয়াম-এর ওপরে, এবং এটিও একইভাবে সামনের ডানার ওপরে ঘর্ষিত হয়। অন্য একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হেটেরোসেরাস-দের শরীরে উখাটি থাকে পেটের প্রথম অংশের পাশে এবং সেটি উর্বাস্থির প্রান্তরেখার সঙ্গে ঘর্ষিত হয়। কারকিউলায়োনিডি ও ক্যারাবিডি[১৫] বর্গের কিছু পতঙ্গের শরীরে এই অঙ্গগুলো সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে থাকে। এদের উখাতুল্য অঙ্গটা থাকে সামনের ডানার নীচের দিকে, তাদের চূড়ার কাছাকাছি অঞ্চলে অথবা তার বাইরের কিনারা বরাবর, এবং পেটের অংশগুলোর প্রান্তসমূহই ওই উখাটির ঘর্ষক হিসেবে কাজ করে থাকে। পেলোবিয়াস হারমানি-দের (Pelobius Hermani —ডাইটিসকিডে বা জলচর গুবরে-পোকাদের একটি প্রজাতি) ক্ষেত্রে একটি শক্ত প্রান্তরেখা তাদের সামনের ডানার অস্থিসন্ধির (sutural) কিনারার কাছ দিয়ে এবং

১৪। এই তিনটি বর্গের এবং অন্যান্য শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের গুবরে-পোকাদের বহু নমুনা পাঠিয়ে সাহায্য করার জন্য মিঃ জি. আর. ক্রচ-এর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। নানারকম মূল্যবান তথ্য জুগিয়েও তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন। মিঃ ক্রচ-এর মতে, ক্লাইথ্রা-দের যে শব্দ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে, সেটা এর আগে আর কেউ লক্ষ করেননি। মিঃ ই. ডব্লিউ. জ্যানসন-ও আমাকে বহু তথ্য ও নমুনা জুগিয়ে সাহায্য করেছেন। এই সঙ্গে আমার পুত্র মিঃ এফ. ডারউইন-এর নামটাও উল্লেখ করা যায়। সে দেখেছিল ডারমেসটেস মিউরিনাস প্রজাতির পতঙ্গরা শব্দ সৃষ্টি করতে সক্ষম, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে তাদের শরীরের শব্দসৃষ্টির অঙ্গটা আবিষ্কার করতে পারেনি। ডঃ চ্যাপম্যান সম্প্রতি জানিয়েছেন যে স্কোলাইটাস-রাও শব্দ সৃষ্টি করতে সক্ষম (দ্রষ্টব্য, 'এনটোমোলজিস্টস্ মান্থলি ম্যাগাজিন', খণ্ড ৬, পৃঃ ১৩০)।

১৫। এই দু'টি শ্রেণীর এবং অন্যান্য শ্রেণীর পতঙ্গদের শব্দসৃষ্টিকারী অঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন ওয়েস্টরিং (ক্রুরার, 'Naturhist Tidskrift', খণ্ড ২, ১৮৪৯, পৃঃ ৩৩৪)। মিঃ ক্রচ আমার কাছে ক্যারাবিডি বর্গের অন্তর্ভুক্ত ইলেফ্রাস ইউলিজিনোসাস ও ব্রেথিসা মালটিপাংক্‌টাটা প্রজাতির পতঙ্গদের নমুনা পাঠিয়েছিলেন। আমি তাদের পরীক্ষা করে দেখেছি। ব্রেথিসাদের ক্ষেত্রে পেটের অংশের খাঁজ-কাটা পার্শ্বদেশে অবস্থিত আড়াআড়ি প্রান্তরেখাগুলো উখাটিকে সামনের ডানার ওপরে ঘষার ব্যাপারে কোনও কাজে লাগে না—অন্তত আমি সে-রকম কিছু লক্ষ করিনি।

তার সমান্তরালে লম্বালম্বিভাবে এগিয়ে যায়, তার ওপরে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত থাকে পঞ্জরাস্থিগুলো। এই পঞ্জরাস্থিগুলোর মধ্যভাগ একটু স্থূল হয় কিন্তু উভয় প্রান্তেই ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে যায়—বিশেষত ওপরের দিকটায়। এই পতঙ্গটিকে জলের নীচে বা ওপরের বাতাসে চেপে ধরলে এরা শব্দ করতে শুরু

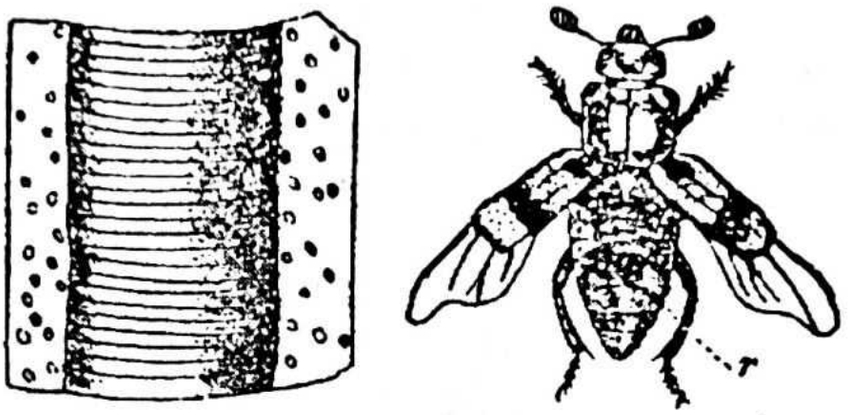

২১নং ছবি—নেক্রোফোরাস (ল্যান্ডোয়া-র গ্রন্থ থেকে নেওয়া)।
r–দুটি উখা।
বাঁদিকের ছবিটিতে উখার একটি অংশকে অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে।

করে। পেটের অত্যন্ত শক্ত প্রান্তভাগটা উখার সঙ্গে ঘর্ষিত হওয়ার ফলেই এই শব্দটা সৃষ্টি হয়ে থাকে। দীর্ঘ শুঙ্গবিশিষ্ট গুবরে-পোকাদের (Longicornia) অনেকের শরীরেই শব্দসৃষ্টির অঙ্গটা অন্যভাবে থাকে। এদের উখাটা থাকে বুকের মধ্য অংশে এবং সেটি ঘর্ষিত হয় বুকের একেবারে সামনের অংশের ওপরে। ল্যান্ডোয়া গুনে দেখেছিলেন—সেবাম্বিক্স হেরস প্রজাতির পতঙ্গদের উখায় মোট ২৩৮টি অতি সূক্ষ্ম পঞ্জরাস্থি থাকে।

ল্যামেলিকর্ন বর্গের অনেক পতঙ্গেরই শব্দ সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকে এবং এদের বিভিন্ন প্রজাতির শব্দসৃষ্টির অঙ্গের অবস্থানে ব্যাপক পার্থক্য থাকে। কয়েকটি প্রজাতির পতঙ্গরা খুব উঁচু পর্দার শব্দ সৃষ্টি করতে পারে। মিঃ এফ. স্মিথ একবার ট্রক্স স্যাবুলোসাস প্রজাতির একটি পতঙ্গকে ধরেছিলেন। সেটি এত জোরে শব্দ করতে শুরু করেছিল যে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা জনৈক বনরক্ষী ভেবেছিল মিঃ স্মিথ বোধহয় একটা ইঁদুরকে ধরেছেন। তবে এই প্রজাতির পতঙ্গদের শব্দসৃষ্টির অঙ্গটা আমি আবিষ্কার করতে পারিনি। জিওট্রুপেস্ ও টাইফিউস-দের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতিটি পিছনের পায়ের (জিওট্রুপেস স্টারকোরারিয়াস-দের এই পা-গুলোতে ৮৪টি করে অস্থি থাকে) নিম্নভাগের ওপর দিয়ে একটা সরু প্রান্তরেখা তির্যকভাবে এগিয়ে গেছে (r, ২২নং চিত্র)। এই প্রান্তরেখাটির সঙ্গে পেটের একটি অত্যধিক অভিক্ষিপ্ত অংশের ঘর্ষণ হওয়ার ফলেই শব্দ সৃষ্টি হয়। এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত কোপ্রিস লুনারিস প্রজাতির পতঙ্গদের ক্ষেত্রে দেখা যায় একটা অত্যন্ত সরু ও সূক্ষ্ম উখাতুল্য

অঙ্গ সামনের ডানার অস্থিসন্ধির কিনারা বরাবর এগিয়ে গেছে, সেইসঙ্গেই শরীরের নীচের দিকের বহিঃস্থ কিনারা বরাবর রয়েছে আর-একটা ছোট উখাতুল্য অংশ। লেকস্তে বলেছেন—কোপ্রিনি বর্গের কিছু প্রজাতির পতঙ্গদের শরীরে এই উখাটা পেটের পৃষ্ঠতলে অবস্থিত থাকে। ওরিক্টেস-দের ক্ষেত্রে এই উখাটা থাকে প্রো-পাইজিডিয়াম-এর ওপরে। পতঙ্গবিজ্ঞানী লেকস্তে আরও জানিয়েছেন যে ডাইনাসটিনি বর্গের কিছু পতঙ্গের এই উখাটা থাকে সামনের ডানার নীচের দিকে। শেষত, ওয়েস্টরিং বলেছেন যে ওমালোপ্লিয়া ব্রুনিয়া প্রজাতির পতঙ্গদের উখাটা থাকে সামনের বক্ষাস্থির (pro-sternum) ওপরে এবং ঘর্ষকটি থাকে মাঝের বক্ষাস্থির (meta-sternum) ওপরে। অর্থাৎ এদের এই অঙ্গগুলো থাকে শরীরের নীচের দিকে, লংগিকর্নদের মতো শরীরের ওপর দিকে থাকে না।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোলিওপ্টেরা শ্রেণীর বিভিন্ন বর্গের পতঙ্গদের শব্দসৃষ্টির অঙ্গগুলো শরীরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকে ঠিকই, কিন্তু সেগুলোর গঠনকাঠামোর মধ্যে খুব-একটা পার্থক্য থাকে না। একই শ্রেণীর কিছু কিছু পতঙ্গ এইসব অঙ্গগুলোর অধিকারী হয়, আবার অনেকের শরীরে এই অঙ্গ আদৌ থাকে না। যদি ধরে নেওয়া যায় যে একেবারে প্রথমে বিভিন্ন ধরনের গুবরে-পোকারা তাদের শরীরের কোনও-কোনও শক্ত ও কর্কশ অংশকে (যেগুলো একে অপরের স্পর্শসীমার মধ্যে থাকত) পরস্পরের সঙ্গে ঘষে এক ধরনের খস্‌খস্ বা হিস্‌হিস্ শব্দ সৃষ্টি করত এবং এইভাবে সৃষ্ট শব্দটা তাদের পক্ষে কোনও-না-কোনও ভাবে উপযোগী ছিল বলে শরীরের ওই কর্কশ অংশগুলোই ক্রমান্বয়ে শব্দসৃষ্টিকারী অঙ্গে পরিণত হয়েছে—তাহলে এদের এই অঙ্গের বিভিন্নতার কারণটা বুঝে নিতে কোনও

২২নং ছবি—জিওট্রুপেস স্টারকোরারিয়াস প্রজাতির পতঙ্গদের পিছনের পা (ল্যান্ডোয়া-র গ্রন্থ থেকে নেওয়া)।
r—উখা ; c—নিতম্ব ; f—উর্বাস্থি ;
t—জঙ্ঘাস্থি ; tr—গুল্‌ফ্।

অসুবিধে হয় না। অনেক ধরনের গুবরে-পোকাদের শরীরে শব্দসৃষ্টির যথাযথ অঙ্গ না-থাকা সত্ত্বেও চলাফেরা করার সময় তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে এক ধরনের খস্‌খস্‌ শব্দ সৃষ্টি করে থাকে। মিঃ ওয়ালেস আমাকে জানিয়েছেন যে ইউচিরাস লংগিম্যানাস (Euchirus longimanus—ল্যামেলিকর্ন বর্গের একটি পতঙ্গ, এদের পুরুষদের সামনের পা-গুলো অত্যন্ত দীর্ঘ হয়) প্রজাতির পতঙ্গরা 'চলাফেরা করার সময় পেটের সঙ্কোচন ও প্রসারণের সাহায্যে এক ধরনের নিচু হিস্‌হিস্‌ শব্দ সৃষ্টি করে থাকে। এদেরকে চেপে ধরলে এরা পিছনের পা-গুলো সামনের ডানার কিনারায় ঘষে এক ধরনের খরখর শব্দ করতে থাকে।' সামনের প্রতিটি ডানার অস্থিসন্ধির কিনারা দিয়ে একটি সরু উখাতুল্য অঙ্গ চলাচল করে বলেই যে ওই হিস্‌হিস্‌ শব্দটা সৃষ্টি হয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। উর্বাস্থির খস্‌খসে উপরিতলটিকে সন্নিহিত সামনের ডানার কণাময় কিনারায় ঘষলে খরখর শব্দটাও উৎপন্ন হবে। তবে এদের শরীরে ওই উখাটির অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি আমি। এত বড় মাপের একটা পতঙ্গের শরীরে ওই অঙ্গটা থাকলে সেটা কিছুতেই আমার নজর এড়িয়ে যেতে পারত না। সাইচ্‌রাস বর্গের পতঙ্গদের পরীক্ষা করার পর এবং এদের সম্বন্ধে ওয়েস্টরিং-এর রচনাটি পড়ার পর আমার মনে গভীর সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে এদের শরীরে কোনও উখাতুল্য অঙ্গ আদৌ থাকে কিনা। তবে এরাও যে এক ধরনের শব্দ সৃষ্টি করতে সক্ষম, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

অর্থোপ্‌টেরা এবং হোমোপ্‌টেরা-দের দৃষ্টান্ত সামনে থাকার দরুন আমি আশা করেছিলাম যে কোলিওপ্‌টেরা-দের মধ্যেও স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের শব্দসৃষ্টির অঙ্গগুলো পৃথক পৃথক ধরনের হবে। কিন্তু এদের বেশ কিছু প্রজাতিকে পরীক্ষা করে দেখার পরেও এ-ধরনের কোনও পার্থক্যের অস্তিত্ব ল্যান্ডোয়া-র চোখে পড়েনি। ওয়েস্টরিং-ও এ-রকম কোনও পার্থক্য লক্ষ করেননি। মিঃ জি. আর ক্রচ, যিনি অনুগ্রহ করে বহু প্রজাতির পতঙ্গদের নমুনা পাঠিয়ে আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছেন, তিনিও এ-ধরনের কোনও পার্থক্যের অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। তবে এইসব অঙ্গের মধ্যেকার পার্থক্যটা খুব সামান্য হলে সেটা খুঁজে পাওয়া নিতান্তই দুরূহ, কারণ এই অঙ্গগুলো অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। যেমন, নেক্রোফোরাস হিউমেটর এবং পেলোবিয়াস-দের প্রথম যে-দু'টি জোড়াকে আমি পরীক্ষা করেছিলাম, তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই স্ত্রী-পতঙ্গটির তুলনায় পুরুষ-পতঙ্গটির শরীরের উখাতুল্য অঙ্গটি অনেক বড় ছিল, কিন্তু এই দু'টি প্রজাতির অন্য জোড়াগুলির ক্ষেত্রে এ-রকম কোনও পার্থক্য আমার নজরে পড়েনি। জিওট্রুপেস স্টারকোরারিয়াস প্রজাতির তিনটি স্ত্রী-পতঙ্গের তুলনায় তিনটি পুরুষ-পতঙ্গের উখাতুল্য অঙ্গগুলিকে স্থূলতর, অনচ্ছতর ও অধিক অভিক্ষিপ্ত বলে মনে হয়েছিল আমার। এদের স্ত্রী-পুরুষের শব্দসৃষ্টির ক্ষমতায় কোনও

পার্থক্য আছে কিনা খুঁজে দেখার জন্য আমার পুত্র মিঃ এফ. ডারউইন এদের সাতান্নটি জীবন্ত নমুনা সংগ্রহ করেছিল। এদেরকে একইভাবে চেপে ধরলে এরা একটা শব্দ করত। সেই শব্দের জোর কম না বেশি, সেই অনুযায়ী এদেরকে সে দু'ভাগে ভাগ করে। অতঃপর ওই সাতান্নটি নমুনাকে পরীক্ষা করে সে দেখে যে দু'টো ভাগেই স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। মিঃ এফ. স্মিথ মোনোইন্‌খাস সিউডাকোরি (Monoynchus pseudacori— কারকিউলায়োনিডি বর্গের অন্তর্ভুক্ত) প্রজাতির অসংখ্য পতঙ্গকে জীবন্ত অবস্থায় ধরেছেন। তাঁর মতে, এদের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই শব্দ সৃষ্টি করে এবং সেই শব্দের জোরও প্রায় একইরকম।

তা সত্ত্বেও এটা নিশ্চিত যে কোলিওপ্‌টেরা বর্গের কিছু কিছু পতঙ্গদের ক্ষেত্রে এই শব্দসৃষ্টির ক্ষমতাটা একটা লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্য হিসেবেই বিদ্যমান থাকে। মিঃ ক্রচ দেখেছিলেন যে হেলিওপ্যাথেস (Heliopathes—টেনেব্রায়োনিডি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত) বর্গের দু'টি প্রজাতির শুধুমাত্র পুরুষ-পতঙ্গদের শরীরেই শব্দসৃষ্টিকারী অঙ্গ থাকে। এইচ. গিবাস প্রজাতির পাঁচটি পুরুষ-পতঙ্গকে পরীক্ষা করে দেখেছিলাম আমি। এদের প্রত্যেকেরই পেটের একেবারে শেষ অংশটার পৃষ্ঠতলে একটা করে সুবিকশিত উখা ছিল এবং প্রত্যেকেরই উখাটা কিছুটা দু'ভাগে ভাগে ভাগ হওয়া অবস্থায় ছিল। আবার এই প্রজাতিরই পাঁচটি স্ত্রী-পতঙ্গকে পরীক্ষা করে তাদের কারও শরীরেই উখার চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাইনি আমি, বরং দেখেছিলাম তাদের পেটের ওই অংশের ঝিল্লিগুলো স্বচ্ছ এবং পুরুষ-পতঙ্গদের তুলনায় অনেক পাতলা। এইচ. ক্রিব্যাটোস্ট্রিয়াটাস প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের শরীরেও ওই উখাটা থাকে, তবে সেটা দু'ভাগে ভাগ হওয়া অবস্থায় থাকে না, আর এদের স্ত্রী-পতঙ্গদের শরীরে এই অঙ্গটা আদৌ থাকে না। তাছাড়াও এদের পুরুষ-পতঙ্গদের সামনের ডানাগুলোর চূড়ার দিকে, অস্থিসন্ধির উভয় দিকে, তিন-চারটি ছোট ছোট ও লম্বালম্বি শক্ত প্রান্তরেখা থাকে, তার ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে চলে যায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিছু পঞ্জরাস্থি যেগুলো তাদের পেটের উখায় থাকা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অস্থিগুলোর সমতুল ও সমান্তরাল। এই প্রান্তরেখাগুলো একটা আলাদা উখা হিসেবে কাজ করে নাকি পেটের উখাটির ঘর্ষক হিসেবে কাজ করে, তা আমি নির্ণয় করে উঠতে পারিনি। এদের স্ত্রী-পতঙ্গদের শরীরে এই ধরনের কোনও প্রান্তরেখার চিহ্নমাত্রও থাকে না।

আবার, ল্যামেলিকর্ন বর্গের ওরিক্‌টেস-দের তিনটি প্রজাতির মধ্যেও প্রায় একইরকম ঘটনা লক্ষ করা যায়। ও. গ্রাইফাস এবং ন্যাসিকরনিস প্রজাতির স্ত্রী-পতঙ্গদের প্রো-পাইজিডিয়ামে অবস্থিত উখার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অস্থিগুলো পুরুষ-পতঙ্গদের অস্থির মতো অতটা ঘনসংবদ্ধ নয় এবং অতটা স্পষ্টভাবে সেগুলোকে বোঝাও যায় না। তবে প্রধান পার্থক্যটা অন্য—উপযুক্ত আলোয় ধরলে দেখা যায় যে স্ত্রী-পতঙ্গদের

শরীরের এই অংশের পুরো উপরিতলটা রোমে ঢাকা, অন্যদিকে পুরুষ-পতঙ্গদের শরীরে এ-রকম কোনও রোম থাকে না অথবা থাকলেও তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধরনের হয়ে থাকে। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, কোলিওপ্টেরা বর্গের কোনও পতঙ্গেরই উখার সক্রিয় অংশে রোমের চিহ্নমাত্রও থাকে না। ও. সেনোগালেন্‌সিস প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যেকার পার্থক্যটা আরও সুস্পষ্ট। এদের পেটের ওই অংশটাকে পরিষ্কার করে একটি স্বচ্ছ বস্তু হিসাবে দেখলে এই পার্থক্যটা সবথেকে ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়। স্ত্রী-পতঙ্গদের শরীরের এই গোটা অঞ্চলটা জুড়ে ছোট ছোট ও পৃথক পৃথক চূড়া থাকে এবং তাতে কিছু কাঁটা জাতীয় অংশ থাকে। অন্যদিকে, পুরুষ-পতঙ্গদের এই চূড়াগুলো যতই আগা-র দিকে এগোয় ততই বেশি বেশি করে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়, সুষম হয়ে ওঠে এবং তাতে কাঁটা জাতীয় কোনও বস্তু থাকে না। এদের এই অংশের তিন-চতুর্থাংশই ঢাকা থাকে অতি সূক্ষ্ম ও সমান্তরাল কিছু অস্থির দ্বারা, অন্যদিকের স্ত্রী-পতঙ্গদের এই অংশে আদৌ কোনও অস্থি থাকে না। তবে ওরিক্‌টেস-দের এই তিনটি প্রজাতিরই স্ত্রী-পতঙ্গদের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার লক্ষ করা যায়। এদের মধ্যে থেকে একটু নরম শরীরবিশিষ্ট স্ত্রী-পতঙ্গদের বেছে নিয়ে তাদের পেটে সামনে-পেছনে চাপ দিলে এক ধরনের খরখরে বা কর্কশ শব্দ উৎপন্ন হয়—অবশ্য সে শব্দটা নিতান্তই ক্ষীণ।

হেলিওপ্যাথেস এবং ওরিক্‌টেস-দের ব্যাপারে একটা কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে—এদের পুরুষ-পতঙ্গরা শব্দ সৃষ্টি করে স্ত্রী-পতঙ্গদের ডাকার জন্য অথবা তাদের উত্তেজিত করে তোলার জন্য। কিন্তু অন্য অধিকাংশ গুবরে-পোকাদের ক্ষেত্রে এই শব্দটা উভয় লিঙ্গের সদস্যদের কাছেই পরস্পরকে আহ্বান করার উপায় হিসেবেই কাজ করে থাকে। গুবরে-পোকারা তাদের বিভিন্ন ধরনের আবেগের প্রেরণায় শব্দ সৃষ্টি করে, ঠিক যেমন পাখিরা তাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের গান শোনানোর পাশাপাশি আরও নানান উদ্দেশ্যে নিজেদের কণ্ঠকে ব্যবহার করে থাকে। চিয়াসোগ্‌ন্যাথাস-রা শব্দ করে ক্রুদ্ধ হলে কিংবা কাউকে যুদ্ধে আহ্বান করার জন্য। অনেক প্রজাতির পতঙ্গরা পালানোর পথ বন্ধ বলে বুঝতে পারলে ভয়ে অথবা মর্মপীড়ায় শব্দ করতে শুরু করে। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে মিঃ ওলাস্টন ও মিঃ ক্রচ শব্দ শুনে গাছের ফাঁপা গুঁড়িতে আঘাত করেছিলেন এবং সেখানে তাঁরা অ্যাকালেস বর্গের গুবরে-পোকাদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। শেষত, অ্যাটিউখাস বর্গের পুরুষ-পতঙ্গরা তাদের স্ত্রী-পতঙ্গদের কাজে উৎসাহ জোগানোর জন্য এবং স্ত্রী-পতঙ্গটিকে ওখান থেকে সরিয়ে নিলে হতাশায় শব্দ করে থাকে। কিছু কিছু প্রকৃতিবিজ্ঞানীর মতে, গুবরে-পোকারা এই শব্দটা করে থাকে তাদের শত্রুদের ভয় দেখিয়ে দূরে সরানোর জন্য। কিন্তু কোনও চতুষ্পদ প্রাণী অথবা পাখি, যারা যে-কোনও

বৃহদাকার গুবরে-পোকাকেও অনায়াসে খেয়ে ফেলতে পারে, তারা এই সামান্য শব্দে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করার কোনও কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। এই শব্দটা যে আসলে একটা যৌন আহ্বান হিসেবেই কাজ করে, এই মতটি সমর্থিত হয় একটি বিশেষ তথ্যের সাহায্যে—মরণ-পোকা বা ডেথ-টিক্-রা (Anobium tessellatum) পরস্পরের টিক্‌টিক্ শব্দের উত্তর দেয়, এবং আমি নিজের কানে শুনেছি যে এরা একটা কৃত্রিম শব্দ সৃষ্টি করতে পারে। মিঃ ডাব্‌ল্‌ডে-ও আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি অনেক সময় এদের কোনও স্ত্রী-পতঙ্গকে টিক্‌টিক্ শব্দ করতে শুনেছেন[১৬] এবং দু'-এক ঘণ্টা পরে দেখেছেন সেই স্ত্রী-পতঙ্গটি কোনও পুরুষ-পতঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, এমনকী একবার তিনি দেখেছিলেন স্ত্রী-পতঙ্গটির চারপাশে বেশ কিছু পুরুষ-পতঙ্গ এসে জুটেছে। অবশেষে বলা যায় যে বিভিন্ন ধরনের গুবরে-পোকাদের স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গরা হয়তো প্রথমে পরস্পরকে খুঁজে বার করত তাদের শরীরের সংলগ্ন শক্ত অংশগুলোর পারস্পরিক ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট ক্ষীণ শব্দটুকুর সাহায্যেই, এবং যে-সব পুরুষ বা স্ত্রী-পতঙ্গরা সবথেকে বেশি শব্দ সৃষ্টি করতে পারত তাদের বরাতেই সবথেকে ভাল সঙ্গিনী বা সঙ্গী জুটত, অতঃপর তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের কুঞ্চনগুলো যৌন নির্বাচন মারফত ক্রমান্বয়ে সত্যিকারের শব্দসৃষ্টিকারী অঙ্গে পরিণত হয়েছে—এমনটা হওয়াও একেবারে অসম্ভব নয়।

১৬। মিঃ ডাব্‌লডে-র মতে, 'পতঙ্গটি প্রথমে পায়ে ভর দিয়ে যতটা সম্ভব উঁচুতে তোলে নিজেকে, তারপর যে-জিনিসটার ওপরে সে বসে আছে সেই জিনিসটার গায়ে নিজের বুক দিয়ে পরপর পাঁচ-ছ'বার আঘাত করে। এর ফলেই সৃষ্টি হয় শব্দটা।' এ বিষয়ে আরও জানার জন্য দ্রষ্টব্য, ল্যান্ডোয়া, 'Zeitschrift fun wissen. Zoolog.', খণ্ড ১৭, পৃঃ ১৮১। অলিভিয়ের বলেছেন (কার্বি এবং স্পেন্স কর্তৃক 'Introduct.', খণ্ড ২, পৃঃ ৩৯৫-তে উদ্ধৃত) যে পিমেলিয়া স্ট্রিয়াটা প্রজাতির স্ত্রী-পতঙ্গরা কোনও শক্ত জিনিসের ওপর নিজেদের পেট দিয়ে আঘাত করে বেশ উচ্চ শব্দ সৃষ্টি করে থাকে, 'আর তাদের এই ডাকে সাড়া দিয়ে দ্রুতই ছুটে আসে পুরুষ-পতঙ্গরা। অতঃপর তারা মিলিত হয়।'

ডিসেন্ট অফ ম্যান

দ্বিতীয় খণ্ড ❑ দ্বিতীয় ভাগ

❑ প্রথম পরিচ্ছেদ ❑

মানুষের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ

নারী-পুরুষের মধ্যেকার পার্থক্য—এইসব পার্থক্য এবং নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণ—যুদ্ধের নীতি—মানসিক ক্ষমতা এবং কণ্ঠস্বরের পার্থক্য—মানুষের বিবাহে সৌন্দর্যের প্রভাব—অলংকারের প্রতি বন্য মানুষের আকর্ষণ—নারীদের সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাদের ধারণা—প্রতিটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যকে বাড়িয়ে দেখানোর প্রবণতা।

মানুষের দু'টি লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যেকার পার্থক্য অধিকাংশ চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের তুলনায় বেশি, তবে কোনও কোনও চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী প্রাণীর থেকে কম—যেমন ম্যান্‌ড্রিল বেবুনদের থেকে। মানুষের দুনিয়ায় পুরুষরা সাধারণত নারীদের থেকে দৈর্ঘ্যে, ওজনে ও শক্তিতে অনেকটাই এগিয়ে থাকে, তাদের কাঁধ বেশি চওড়া এবং পেশীগুলো নারীদের তুলনায় অনেক স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। পেশীর বিকাশ এবং ভ্রূ-র অভিক্ষেপের (projection) মধ্যেকার সম্পর্কের দরুন[১] নারীদের তুলনায় পুরুষদের দুই ভ্রূর মিলনস্থলটি সাধারণত অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। পুরুষদের সারা শরীরে, বিশেষত মুখমণ্ডলে বেশি লোম থাকে এবং তাদের কণ্ঠস্বর নারীদের থেকে ভিন্ন ধরনের ও বেশি জোরদার হয়। কোনও কোনও জাতির নারীদের ত্বকের আভা (tint) পুরুষদের থেকে সামান্য আলাদা হয়। যেমন, আফ্রিকার অভ্যন্তরে বিষুবরেখার কয়েক ডিগ্রি উত্তরে বসবারকারী মনবাটু গোষ্ঠীর জনৈক নিগ্রো নারীর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শোয়েইনফার্থ লিখেছেন, 'গোষ্ঠীর অন্য সব নারীর মতোই তারও গাত্রত্বক তার স্বামীর থেকে বেশ কিছুটা হালকা আভাযুক্ত, অনেকটা আধ্‌সেঁকা কফির রঙের।'[২] এদের মেয়েরা মাঠে কাজ করে এবং প্রায়-বিবস্ত্রই থাকে। ফলে এমন যুক্তি হাজির করা যাবে না যে খোলা প্রকৃতির সংস্পর্শে কম আসার দরুনই তাদের গায়ের রঙ পুরুষদের থেকে অন্যরকম হয়। ইউরোপীয় পুরুষ ও নারীদের দেখলে নারীদের গায়ের রঙ পুরুষদের তুলনায় কিছুটা উজ্জ্বলতর বলেই মনে হয়।

নারীদের তুলনায় পুরুষরা অধিকতর সাহসী, যুদ্ধপ্রিয় ও কর্মচঞ্চল হয় এবং তাদের উদ্ভাবনী-প্রতিভাও নারীদের তুলনায় বেশি। পুরুষদের মস্তিষ্ক নারীদের তুলনায়

১। শ্যাফহউসেন, 'অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল রিভিউ'-এ অনুবাদ, অক্টোবর ১৮৬৮, পৃঃ ৪১৯, ৪২০, ৪২৭।

২। 'দ্য হার্ট অফ আফ্রিকা', ইংরেজি অনুবাদ, ১৮৭৩, খণ্ড ১, পৃঃ ৫৪৪।

নিঃসন্দেহেই আকারে বড়, তবে তা তাদের বৃহত্তর শরীরের সঙ্গে সমানুপাতিক হারে বড় কিনা সে ব্যাপারটা এখনও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। নারীদের মুখমণ্ডল পুরুষদের থেকে বেশি গোলাকার হয়, চোয়াল এবং করোটির নীচের দিকটা ক্ষুদ্রতর হয়, দেহরেখা অধিকতর গোলাকার এবং কোনও কোনও জায়গায় সামনের দিকে বেশি অভিক্ষিপ্ত হয়, এছাড়া তাদের শ্রোণী (pelvis) পুরুষদের থেকে প্রশস্ততর হয়।[৩] তবে এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যটিকে অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য না করে মুখ্য যৌন বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম বলেই বিবেচনা করা উচিত। পুরুষদের থেকে কম বয়সেই যৌবনে উপনীত হয় নারীরা।

সমস্ত শ্রেণীর জীবজন্তুদের মতোই মানুষের ক্ষেত্রেও পুরুষদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো বয়ঃপ্রাপ্তির আগে পুরোপুরি বিকশিত হয় না, আর অণ্ডকোষচ্ছেদন করা হলে কখনওই বিকশিত হয় না। যেমন, দাড়ি একটি অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্য, কিন্তু অল্পবয়সী পুরুষ-শিশুদের মাথায় প্রচুর চুল থাকলেও দাড়ি থাকে না। যে-সব ধারাবাহিক শারীরিক পরিবর্তন মারফত পুরুষরা তাদের পুরুষোচিত বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করেছে, সেগুলো একটু বেশি বয়সে দেখা দেয় বলেই সম্ভবত সেগুলো শুধুমাত্র পুরুষ-সন্তানদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়। পুরুষ এবং স্ত্রী-শিশুদের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য থাকে—যেমনটা দেখা যায় বহু ধরনের প্রাণীর স্ত্রী ও পুরুষ-শিশুদের মধ্যে, যাদের পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ-সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য থাকে। পূর্ণবয়স্ক নারীদের সঙ্গে পুরুষ ও স্ত্রী-শিশুদের যতটা সাদৃশ্য থাকে, পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে ততটা থাকে না। তবে নারীরা শেষপর্যন্ত একান্ত নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, এবং বলা হয় করোটির গঠনের ব্যাপারে তারা শিশুদের ও পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের অন্তর্বর্তী অবস্থায় থাকে।[৪] আবার, ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত অথচ পরস্পর-পৃথক বিভিন্ন প্রজাতির পূর্ণবয়স্ক প্রাণীদের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও তাদের অল্পবয়সী সদস্যদের মধ্যে যেমন খুব-একটা পার্থক্য থাকে না, তেমনি মানুষের বিভিন্ন জাতির শিশুদের মধ্যেও খুব বেশি পার্থক্য চোখে পড়ে না। অনেকের মতে, শিশুদের করোটিতে জাতিগত পার্থক্যের কোনও ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না।[৫] গায়ের রঙের ব্যাপারে বলা যায়—সদ্যোজাত নিগ্রো শিশুর গায়ের রঙ হয় লাল্‌চে-বাদামি, অল্পদিনের মধ্যেই তা স্লেট-ধূসর হয়ে ওঠে। সুদানের নিগ্রো শিশুদের গায়ের কালো রঙটা ফুটে ওঠে জন্মের এক বছরের মধ্যে, কিন্তু ইজিপ্টে এই ঘটনাটা তিন বছর বয়সের আগে

৩। একার, 'অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল রিভিউ'-এ অনুবাদ, অক্টোবর ১৮৬৮, পৃঃ ৩৫১-৩৫৬। নারী ও পুরুষের করোটির গঠনগত তুলনার কাজটা খুব সতর্কভাবে করেছেন ওয়েল্‌কার।

৪। একার এবং ওয়েলকার, পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ৩৫২, ৩৫৫ ; ফখ্‌ৎ, 'লেকচারস অন ম্যান', ইংরেজি অনুবাদ, পৃঃ ৮১।

৫। শ্যাফহউসেন, 'অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল রিভিউ', পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২৯।

ঘটে না। নিগ্রো শিশুদের চোখ প্রথমে নীল রঙের হয়, মাথার চুলও কালো না হয়ে পিঙ্গল বর্ণের হয় এবং চুলের শুধু শেষপ্রান্তটা কোঁকড়ানো থাকে। জন্মের ঠিক পরেই অস্ট্রেলীয় শিশুদের গায়ের রঙ থাকে হল্‌দেটে-বাদামি, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশ কাল্‌চে হয়ে ওঠে। প্যারাগুয়ের গুয়ারানিস গোষ্ঠীর সদ্যোজাত শিশুদের গায়ের রঙ থাকে ফ্যাকাশে হলুদ, কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বাবা-মা-র মতন হল্‌দেটে-বাদামি গাত্রবর্ণ অর্জন করে তারা। আমেরিকার অন্যান্য অংশেও এ-ধরনের ঘটনা লক্ষ করা গেছে।[৬]

মানবজগতের পুরুষ ও নারীদের মধ্যেকার উপরোক্ত পার্থক্যগুলোর কথা উল্লেখ করার কারণ হল—এই পার্থক্যগুলো কয়েক ধরনের চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেকার পার্থক্যের মতোই। এইসব প্রাণীদের মধ্যেও স্ত্রী-প্রাণীরা পুরুষ-প্রাণীদের থেকে কম বয়সেই যৌবনে উপনীত হয়। অন্ততপক্ষে সেবুস অ্যাজারে-দের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা নিশ্চিতভাবেই লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ প্রজাতিরই পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের চেয়ে আকারে বড় ও অধিকতর শক্তিশালী হয়, যার সুপরিচিত দৃষ্টান্ত হল গরিলারা। এমনকী দুই ভ্রূ-র মিলনস্থলের অধিকতর অভিক্ষিপ্ততার মতো তুচ্ছ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও কয়েক ধরনের বানরদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য থাকে[৮] এবং এ-ব্যাপারে তাদের সাদৃশ্য থাকে মানুষের স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে। গরিলা এবং অন্য কয়েক ধরনের বানরদের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ-প্রাণীদের করোটিতে একটা সুস্পষ্ট চূড়ার মতো উঁচু অংশ থাকে, কিন্তু স্ত্রী-গরিলাদের করোটিতে এ-রকম কোনও অংশ থাকে না। অস্ট্রেলিয়ার পুরুষ ও নারীদের মধ্যে ঠিক এই একই পার্থক্য লক্ষ করেছেন একার।[৯] যে-সব ক্ষেত্রে বানরদের স্ত্রী-পুরুষের কণ্ঠস্বরে পার্থক্য থাকে, সেখানে সবসময়ই পুরুষ-বানরদের কণ্ঠস্বর বেশি জোরালো হয়। আমরা আগেই দেখেছি যে কয়েক ধরনের পুরুষ-বানরের মুখে রীতিমতো দাড়ি থাকে,

---

৬। প্রুনার-রে-র নিগ্রো সংক্রান্ত রচনা থেকে ফখ্‌ৎ কর্তৃক উদ্ধৃত, 'লেকচারস অন ম্যান,' ইংরেজি অনুবাদ ১৮৬৪, পৃঃ ১৮৯। নিগ্রো শিশুদের সম্বন্ধে আরও জানার জন্য (উইন্টারবটম ও ক্যাম্পার-এর রচনা থেকে উদ্ধৃতি সম্বলিত) লরেন্স-এর 'লেকচারস অন ফিজিওলজি' ইত্যাদি, ১৮২২, পৃঃ ৪৫১ দ্রষ্টব্য। গুয়ারানি শিশুদের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য—রেঙ্গার, 'Saugethiere' ইত্যাদি, পৃঃ ৩। এছাড়াও দ্রষ্টব্য, গড্রন, 'De l'Espece', খণ্ড ২, ১৮৫৯, পৃঃ ২৫৩। অস্ট্রেলীয় শিশুদের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, ওয়ে জ, 'ইনট্রোডাকশন টু অ্যানথ্রোপলজি', ইংরেজি অনুবাদ, ১৮৬৩, পৃঃ ৯৯।

৭। রেঙ্গার, 'Saugethiere' ইত্যাদি, ১৮৩০, পৃঃ ৪৯।

৮। যেমনটা দেখা যায় ম্যাকাকাস সাইনোমোল্‌গাস্‌-দের ক্ষেত্রে (ডেসম্যারেস্ট, 'ম্যামালজি', পৃঃ ৬৫)। এবং হাইলোবেত্‌স অ্যাজিলিস-দের ক্ষেত্রে (জিওফ্রয় সেন্ট হিলেয়ার এবং এফ. কুভিয়ের, 'Hist. Nat. des Mamm', ১৮২৪, খণ্ড ১, পৃঃ ২)।

৯। 'অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল রিভিউ', অক্টোবর ১৮৬৮, পৃঃ ৩৫৩।

কিন্তু তাদের স্ত্রী-বানরদের মুখে দাড়ি প্রায়ই থাকে না বা থাকলেও খুব সামান্যই থাকে। পুরুষ-বানরদের থেকে স্ত্রী-বানরদের দাড়ি, জুলফি বা গোঁফ লম্বায় বড়, এমন নজির কোনও জাতের বানরদের মধ্যেই দেখা যায়নি। এমনকী মানুষ আর চতুষ্পদ বানরদের দাড়ির রঙেও আশ্চর্য মিল চোখে পড়ে। মানুষের ক্ষেত্রে মাথার চুলের রঙ যখন দাড়ির রঙের থেকে আলাদা হয় (আর সচরাচর তাই-ই দেখা যায়), তখন দাড়ির রঙটা প্রায় সর্বদাই কিছুটা হালকা, খানিকটা লাল্‌চে হতেই দেখা যায়। ইংল্যান্ডে এ-ঘটনার ভুরি ভুরি নজির পেয়েছি আমি। তবে সম্প্রতি দু'জন ভদ্রলোক আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে এ ব্যাপারে তাঁরা রীতিমতো ব্যতিক্রম। এঁদের মধ্যে একজনের মতে, তাঁর পিতৃকুল আর মাতৃকুলের চুলের রঙে বিপুল পার্থক্য থাকার ফলেই এই উলটো ব্যাপারটা দেখা দিয়েছে তাঁর মধ্যে। নিজেদের এই বৈশিষ্ট্যটি সম্বন্ধে দু'জনেই রীতিমতো সচেতন (এঁদের মধ্যে একজনকে প্রায়শই অন্যদের মুখ থেকে শুনতে হত যে তিনি নাকি তাঁর দাড়িতে কলপ লাগিয়েছেন)। নিজেদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার দরুন অনেক বছর ধরে অন্য মানুষদের খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁরা এবং সিদ্ধান্তে এসেছেন—এ-রকম ব্যতিক্রমের ঘটনা নিতান্তই বিরল। আমার হয়ে এ-ব্যাপারে রাশিয়ায় পর্যবেক্ষণ চালিয়ে একটিও ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত খুঁজে পাননি ডঃ হুকার। কলকাতার বোটানিক গার্ডেনস-এর মিঃ জে. স্কট-ও অনুগ্রহ করে আমার হয়ে এ-ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ চালিয়েছেন। কলকাতার এবং ভারতের অন্যান্য জায়গার বেশ কিছু জাতিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি—সিকিমের দু'টি জাতি, ভুটিয়া, হিন্দু, বর্মি এবং চিনাদের। এদের মধ্যে অধিকাংশ জাতিরই মুখে খুব কম লোম থাকে, আর মাথার চুল ও দাড়ির রঙে পার্থক্য থাকলে দাড়ির রঙটা সবসময়েই চুলের রঙের থেকে হালকা হয়। আমরা আগেই বলেছি যে বানরদের দাড়ির রঙ প্রায়শই মাথার চুলের রঙের থেকে অনেকটা আলাদা হয়। এইসব ক্ষেত্রে দাড়ির রঙটা প্রায়শই চুলের রঙের থেকে হালকা ধরনের হয়—কখনও পুরো সাদা, কখনও হলুদ কিংবা লাল্‌চে।[১০]

শরীরের সাধারণ রোমশতার ব্যাপারে বলা যায়—মানুষের সমস্ত জাতির নারীদের

১০। মিঃ ব্লাইদ আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি মাত্র একটি ঘটনা দেখেছেন যেখানে একটি বানরের দাড়ি, জুলফি ইত্যাদি তার বৃদ্ধ অবস্থায় সাদা হতে শুরু করেছিল—ঠিক যেমনটা দেখা যায় আমাদের ক্ষেত্রে। তবে এই ঘটনাটা ঘটেছিল আটক করে রাখা একটি বয়স্ক ম্যাকাকাস সাইনোমোল্‌গাস-এর ক্ষেত্রে, যার গোঁফ ছিল 'অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অনেকটা মানুষের মতো'। এই বর্ষীয়ান বানরটির সঙ্গে ইউরোপের জনৈক ক্ষমতাসীন রাজার হাস্যকর রকমের সাদৃশ্য ছিল বলে তাঁর নামেই ডাকা হত বানরটিকে। কিছু কিছু জাতির মানুষদের মাথার চুল প্রায় কখনোই ধূসর হয় না বা পাকে না। মিঃ ফোর্বস আমাকে জানিয়েছেন যে দক্ষিণ-আমেরিকার আইমারা ও কুইচুয়াদের মধ্যে ধূসর চুলের একটি দৃষ্টান্তও তাঁর নজরে পড়েনি।

শরীর পুরুষদের তুলনায় কম রোমশ হয়। কয়েক ধরনের স্ত্রী-বানরদেরও শরীরের নীচের দিকটা পুরুষ-বানরদের তুলনায় কম রোমশ হয়।[১১] শেষত, মানব-পুরুষদের মতোই পুরুষ-বানররাও স্ত্রী-বানরদের থেকে বেশি সাহসী ও হিংস্রতর হয়। তারা দলকে নেতৃত্ব দেয়, বিপদের সময় সামনে এসে দাঁড়ায়। এ থেকে বোঝা যায় মানুষ এবং বানরদের লিঙ্গগত পার্থক্যের মধ্যে কতখানি সাদৃশ্য থাকে। তবে দু'-একটি প্রজাতির ক্ষেত্রে, যেমন কয়েক ধরনের বেবুন, ওরাং ও গরিলাদের ক্ষেত্রে, স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যেকার পার্থক্যটা মানুষের স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্যের থেকে অনেক বেশি হয়, কারণ এদের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য থাকে ছেদক-দন্তের আকারে, লোমের বৃদ্ধিতে ও রঙে, বিশেষত গাত্রত্বকের রোমহীন অংশের রঙে।

মানুষের যাবতীয় অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যই অত্যন্ত পরিবর্তনশীল, এমনকী একই জাতির মানুষদের মধ্যেও। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষদের মধ্যে এ-ব্যাপারে বিপুল পার্থক্য লক্ষ করা যায়। 'নোভারা' জাহাজের চমৎকার পর্যবেক্ষণটি[১২] থেকে দেখা যায়—অস্ট্রেলীয় পুরুষরা নারীদের থেকে লম্বায় মাত্র ৬৫ মিলিমিটার বেশি, অন্যদিকে জাভার পুরুষরা জাভার নারীদের থেকে গড়ে ২১৮ মিলিমিটার লম্বা। অর্থাৎ, জাভার নারী-পুরুষদের দৈর্ঘ্যের তফাতটা অস্ট্রেলিয়ার নারী-পুরুষদের থেকে তিন গুণেরও বেশি। দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত এই ব্যাপারটা নিয়ে নানারকম অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল—বিভিন্ন জাতির মানুষদের ঘাড় ও বুকের দূরত্ব মাপা হয়েছে, মাপা হয়েছে মেরুদণ্ড ও বাহুর দৈর্ঘ্যও। এর প্রায় সবক'টি পরিমাপ থেকেই দেখা গেছে যে এ-সব ব্যাপারে নারীদের পরস্পরের মধ্যে যতটা পার্থক্য থাকে, তার থেকে অনেক বেশি পার্থক্য থাকে পুরুষদের মধ্যে। এ থেকে বোঝা যায় যে মূল বংশধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন জাতি গড়ে ওঠার পর এইসব বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে পরিবর্তনটা প্রধানত পুরুষদের মধ্যেই ঘটেছে।

বিভিন্ন জাতির, এমনকী একই জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠী বা বংশের পুরুষদের মধ্যে দাড়ির ব্যাপারে এবং শরীরের রোমশতার ব্যাপারে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ করা যায়। আমরা, অর্থাৎ ইউরোপীয়রা, এর প্রমাণ খুঁজে পাই নিজেদের মধ্যেই। মার্টিন-এর[১৩] মতে, সেন্ট কিল্‌ডা দ্বীপের পুরুষদের বয়স তিরিশ বা তার বেশি না-হওয়া পর্যন্ত

১১। হাইলোবেত্‌স্-দের বেশ কিছু প্রজাতির স্ত্রী-প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা চোখে পড়ে। দ্রষ্টব্য, জিওফ্রয় সেন্ট হিলেয়ার এবং এফ. কুভিয়ের, 'Hist, Nat. des Mamm', খণ্ড ১। আরও দ্রষ্টব্য, এইচ, লার প্রসঙ্গে, 'পেনি সাইক্লোপিডিয়া', খণ্ড ২, পৃঃ ১৪৯, ১৫০।

১২। ডা কে. স্কেরজার এবং ডঃ শোয়ার্জ-এর দ্বারা প্রদত্ত হিসাবের ভিত্তিতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন ডঃ ওয়েসব্যাখ। দ্রষ্টব্য, 'Reise der Novara : Anthrpolog. Theil' ১৮৬৭, পৃঃ, ২১৬, ২৩১, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৯, ২৬৯।

১৩। 'ভয়েজ টু সেন্ট কিল্‌ডা' (তৃতীয় সংস্করণ, ১৭৫৩), পৃঃ ৩৭।

তাদের মুখে দাড়ি দেখা দেয় না, এমনকী ওই বয়সের পরেও তাদের মুখে খুব পাতলা দাড়িই থাকে। ইউরোপীয়-এশিয়া মহাদেশে ভারত পর্যন্ত অঞ্চলে পুরুষদের মুখে দাড়ি দেখা যায়, তারপর আর দেখা যায় না। তবে প্রাচীন আমলে ডায়োডোরাস[১৪] লক্ষ করেছিলেন যে সিংহলের বাসিন্দাদের মধ্যে দাড়ি ব্যাপারটা প্রায়শই অনুপস্থিত থাকে। ভারতের পূর্বদিক থেকেই দাড়ি ব্যাপারটা প্রায় উধাও হয়ে গেছে—শ্যাম, মালয়, কলমাক, চিনা ও জাপানিদের দাড়ি থাকে না। তবে এইসঙ্গে একটা কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার—জাপান দ্বীপপুঞ্জের উত্তরতম দ্বীপগুলোতে বসবাসকারী আইনো[১৬] পুরুষরা হচ্ছে পৃথিবীর সবথেকে রোমশ পুরুষ। নিগ্রোদের মুখে দাড়ি খুব কম থাকে অথবা থাকেই না, জুলফিও প্রায়শই দেখা যায় না। এদের নারী-পুরুষ উভয়েরই শরীরে লোম প্রায় থাকে না বললেই চলে।[১৬] অন্যদিকে, মালয় দ্বীপপুঞ্জের যে-পাপুয়ানরা প্রায় নিগ্রোদের মতোই কালো, তাদের পুরুষদের মুখে রীতিমতো বড়সড় দাড়ি দেখা যায়।[১৭] প্রশান্ত মহাসাগরে ফিজি দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাদের বড় বড় ঝাঁকড়া দাড়ি থাকে, আবার ফিজির কাছাকাছি টোঙ্গা আর সামোয়া দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দারা দাড়িহীন হয়—তবে এরা ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষ। এলিস অঞ্চলের সমস্ত বাসিন্দারা একই জাতির সদস্য। এখানকার একটিমাত্র দ্বীপের (নুনেমায়া দ্বীপের) 'পুরুষদের মুখে চমৎকার দাড়ি থাকে', অথচ অন্য দ্বীপগুলোর পুরুষদের মুখে 'দাড়ি বলতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ডজনখানেক চুল ছাড়া আর কিছু সাধারণত চোখে পড়ে না।'[১৮]

সমগ্র আমেরিকা মহাদেশের পুরুষরা সাধারণত দাড়িহীনই হয়। তবে প্রায় সব গোষ্ঠীরই পুরুষদের মুখে দু'-চারগাছা চুল দেখা যায়, বিশেষত বৃদ্ধ বয়সে। ক্যাট্‌লিন অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে উত্তর আমেরিকার গোষ্ঠীগুলোর পুরুষদের প্রতি কুড়ি জনের মধ্যে আঠারো জনই সম্পূর্ণ দাড়িহীন হয়, তবে মাঝেমধ্যে এক-আধজন

১৪। সার জে. ই. টেনেন্ট, 'সিলোন', খণ্ড ২, ১৮৫৯, পৃঃ ১০৭।

১৫। কাত্রেফাজ, 'Revue des Cours Scientifiques', ২৯ আগস্ট, ১৮৬৮, পৃঃ ৬৩৬ ; ফখ্‌ৎ, 'লেকচারস অন ম্যান', ইংরেজি অনুবাদ, পৃঃ ১২৭।

১৬। নিগ্রোদের দাড়ির ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, ফখ্‌ৎ, 'লেকচারস' ইত্যাদি, পৃঃ ১২৭ ; ওয়েৎজ্‌, 'ইনট্রোডাকশন টু অ্যানথ্রোপলজি', ইংরেজি অনুবাদ, ১৮৬৩, খণ্ড ১, পৃঃ ৯৬। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ('ইনভেস্টিগেশনস ইন মিলিটারি অ্যান্ড অ্যানথ্রোপলজিক্যাল স্ট্যাটিসটিকস অফ আমেরিকান সোলজারস', ১৮৬৯, পৃঃ ৫৬৯) খাঁটি নিগ্রোদের এবং তাদের বর্ণসংকর বংশধরদের শরীর প্রায় ইউরোপীয়দের মতোই রোমশ হয়।

১৭। ওয়ালেস, 'দ্য মালয় আর্কিপেল্যাগো', খণ্ড ২, ১৮৬৯, পৃঃ ১৭৮।

১৮। মহাসাগরীয় জাতিসমূহ প্রসঙ্গে ডঃ জে. বার্নার্ড ডেভিস-এর প্রবন্ধ, 'অ্যানথ্রোপলজিক্যাল রিভিউ', এপ্রিল ১৮৭০, পৃঃ ১৮৫, ১৯১।

পুরুষের দেখা মেলে যারা বয়ঃসন্ধির সময় গালের চুলগুলো তুলে ফেলে দেয়নি এবং ফলস্বরূপ যাদের গালে এক বা দু'ইঞ্চি লম্বা নরম দাড়ি থাকে। আশপাশের সমস্ত গোষ্ঠীর থেকে প্যারাগুয়ের গুয়ারানিদের কিছু পার্থক্য আছে—এদের পুরুষদের মুখে অল্প দাড়ি থাকে, শরীরেও কিছু লোম থাকে, তবে জুলফি থাকে না।[১৯] মিঃ ডি. ফোর্বস, যিনি এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ চালিয়েছেন, আমাকে জানিয়েছেন যে কর্ডিলেরা অঞ্চলের আইমারা ও কুইচুয়া-দের মুখে দাড়ি বলতে কিছুই থাকে না, তবে বৃদ্ধ বয়সে থুতনিতে মাঝেমধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু'-চারগাছা চুল দেখা যায়। ইউরোপীয় পুরুষদের শরীরের যে-সব জায়গায় প্রচুর লোম দেখা যায়, এই দু'টি গোষ্ঠীর পুরুষদের শরীরের সেইসব জায়গায় নিতান্তই অল্প লোম থাকে এবং এদের নারীদের শরীরের সেইসব জায়গায় আদৌ কোনও লোম থাকে না। তবে এদের নারী-পুরুষ উভয়েরই মাথার চুল অস্বাভাবিক লম্বা হয়, এমনকী অনেক সময় মাটিতেও লুটিয়ে পড়ে। উত্তর আমেরিকার কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যেও এই একই ব্যাপার লক্ষ করা যায়। শরীরের লোমের পরিমাণ এবং শরীরের সাধারণ আকৃতির ব্যাপারে আমেরিকার আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর নারী-পুরুষের মধ্যে তেমন-কোনও পার্থক্য থাকে না, যেমনটা চোখে পড়ে অন্য অধিকাংশ জাতির নারী-পুরুষের মধ্যে।[২০] কয়েক ধরনের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত বাঁদরদের মধ্যেও ঠিক একই ঘটনা লক্ষ করা যায়—ওরাং বা গরিলাদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যতটা পার্থক্য থাকে, শিম্পাঞ্জিদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ততটা পার্থক্য থাকে না।[২১]

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, মাছ, কীটপতঙ্গ ইত্যাদিদের বহু বৈশিষ্ট্য যৌন নির্বাচন মারফত প্রথমে কোনও-একটি লিঙ্গের সদস্যরা অর্জন করেছে, অতঃপর তা সঞ্চারিত হয়েছে অপর লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যেও। সঞ্চরণের এই ধরনটি মানুষদের ক্ষেত্রেও একইভাবে কাজ করেছে। তাই,একই বিষয়ের নিরর্থক পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য, আমরা এখানে আলোচনা করব পুরুষদের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যের এবং নারী-পুরুষ উভয়ের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের উৎস নিয়ে।

১৯। ক্যাটলিন, 'নর্থ আমেরিকান ইন্ডিয়ানস', তৃতীয় সংস্করণ, ১৮৪২, খণ্ড ২, পৃঃ ২২৭। গুয়ারানিদের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, আজারা, 'Voyages dans l'Amerique Merid.', খণ্ড ২, ১৮০৯, পৃঃ ৫৮ ; আরও দ্রষ্টব্য, রেঙ্গার, 'Saugethiere von Paraguay', পৃঃ ২।

২০। অধ্যাপক এবং মিসেস আগাসি ('জার্নি ইন ব্রাজিল', পৃঃ ৫৩০) বলেছেন যে নিগ্রোদের এবং উন্নত জাতিগুলোর নারী-পুরুষের মধ্যে যতটা পার্থক্য থাকে, আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের নারী-পুরুষের মধ্যে ততটা পার্থক্য থাকে না। এছাড়াও গুয়ারানিদের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য—রেঙ্গার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩।

২১। রুটিমেয়ার, 'Die Grenzen der Thierwelt ; eine Betrachtung zu Darwin's Lehre', ১৮৬৮, পৃঃ ৫৪।

যুদ্ধের নীতি

বন্যদের ক্ষেত্রে, যেমন অস্ট্রেলীয়দের ক্ষেত্রে, নারীরা সারাক্ষণই পুরুষদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ হিসেবে কাজ করে থাকে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা যেমন একই গোষ্ঠীর পুরুষদের নিজেদের মধ্যে চলে, তেমনি এক গোষ্ঠীর পুরুষদের সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর পুরুষদের মধ্যেও চলে। প্রাচীনকালেও চিত্রটা একই ছিল : 'nam fuit ante Helenam mulier teterrima belli causa.' উত্তর আমেরিকার কিছু কিছু ইন্ডিয়ান গোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা একটা ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। সুদক্ষ পর্যবেক্ষক হার্নে[২২] বলেছেন, 'নারীদের পাওয়ার জন্য পুরুষদের কুস্তি লড়ার ব্যাপারটা এদের মধ্যে বরাবরই একটা প্রথা হিসেবে চালু থেকেছে। স্বাভাবিকভাবেই বলিষ্ঠতম পুরুষরাই সবসময় পুরস্কার হিসেবে লাভ করেছে নারীদের। কোনও দুর্বল পুরুষ যদি দক্ষ শিকারি এবং সবার প্রিয়পাত্র না হয়, তাহলে তাকে বিশেষ একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়—কোনও বলিষ্ঠতর পুরুষ তার স্ত্রীকে পেতে চাইলে স্ত্রীকে হারানো ছাড়া তার আর কোনও উপায় থাকে না। সব গোষ্ঠীর মধ্যেই এই প্রথাটা চালু আছে। অদম্য উৎসাহে যুবকরা সবসময়ই অন্যদের ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। একেবারে ছোটবেলা থেকে যে-কোনও ব্যাপারেই পরস্পরের সঙ্গে শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং কুস্তির নৈপুণ্যের প্রতিযোগিতায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এরা।' দক্ষিণ আমেরিকার গুয়ানা-দের ব্যাপারে আজারা বলেছেন যে কুড়ি বা তার থেকে বেশি বয়স না-হওয়া পর্যন্ত এদের পুরুষেরা বিবাহ করে না বললেই চলে, কারণ সাধারণত ওই বয়সে পৌঁছনোর আগে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাস্ত করার মতো শক্তি তারা অর্জন করে উঠতে পারে না।

এ-রকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত পেশ করা যায়। কিন্তু এ-রকম কোনও দৃষ্টান্ত হাতের কাছে না থাকলেও, উচ্চতর শ্রেণীর বানরদের[২৩] নজিরকে সামনে রেখে জোর দিয়েই বলা যেত যে মানুষের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে যুদ্ধের নীতিটা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলই। এখনও মাঝেমধ্যে কোনও কোনও মানুষের মুখগহ্বরে অন্য দাঁতগুলির থেকে বেশি-এগিয়ে-থাকা ছেদক-দন্ত দেখা যায় এবং তাতে বিপরীত

২২। 'আ জার্নি ফ্রম প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্ ফোর্ট', অষ্টম সংস্করণ, ডাবলিন, ১৭৯৬, পৃঃ ১০৪। উত্তর আমেরিকায় এই ধরনের আরও ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন স্যর জে. লুবক ('অরিজিন অফ সিভিলাইজেশন', ১৮৭০, পৃঃ ৬৯)। দক্ষিণ আমেরিকার গুয়ানা-দের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য—আজারা, 'ভয়েজেস' ইত্যাদি, খণ্ড ২, পৃঃ ৯৪।

২৩। পুরুষ-গরিলাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—ডঃ স্যাভেজ-এর প্রবন্ধ 'বোস্টন জার্নাল অফ ন্যাচরাল হিস্ট্রি', খণ্ড ৫, ১৮৪৭, পৃঃ ৪২৩। প্রেসবাইটিস এনটেলা-দের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য—'ইন্ডিয়ান ফিল্ড', ১৮৫৯, পৃঃ ১৪৬।

দিকের ছেদক-দন্তকে গ্রহণ করার জন্য একটা ফাঁকা জায়গা থাকে। খুব সম্ভবত এটা সেই পূর্বতন অবস্থায় প্রত্যাবর্তনেরই ঘটনা, যখন আজকের দিনের বহু শ্রেণীর পুরুষ-বানরদের মতো মানুষের পূর্বপুরুষদের শরীরও এইসব অস্ত্রে সমৃদ্ধ ছিল। পূর্ববর্তী একটি পরিচ্ছেদে আমরা বলেছি যে মানুষ যতই সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখেছে এবং লাঠি-পাথর নিয়ে লড়াই করার জন্য আর জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য নিজের হাত ও বাহুকে সে যতই বেশি করে ব্যবহার করতে শুরু করেছে, ততই কমে এসেছে তার চোয়াল আর দাঁতের ব্যবহার। এই অব্যবহারের ফলে ক্রমেই ছোট হয়ে এসেছে তার চোয়াল ও চোয়াল-সংলগ্ন পেশীসমূহ, সেইসঙ্গেই পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মিতবিকাশের (economy of growth) এখনও-অব্যাখ্যাত কোনও নিয়মের ফলে ছোট হয়ে গেছে তার দাঁতগুলোও। প্রাণীদের শরীরের যে-অংশগুলো এখন আর কোনও কাজে লাগে না, সেগুলো সর্বদাই আকারে ছোট হয়ে যায়। চারপাশে তাকালে এ-রকম বিস্তর নজির আমাদের চোখে পড়ে। পুরুষ ও নারীদের চোয়াল আর দাঁতের আকারে যে-পার্থক্য আদিতে ছিল, কালক্রমে তা এইভাবেই দূর হয়ে গেছে। অনেক ধরনের রোমন্থক প্রাণীদের পুরুষ-সদস্যদের ক্ষেত্রেও প্রায় একই ব্যাপার দেখা যায়। খুব সম্ভবত মাথার শিং আরও বড় হয়ে ওঠার ফল হিসেবেই এদের ছেদক-দন্তগুলো লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে কিংবা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ওরাং ও গরিলাদের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের করোটির আকারে বিপুল পার্থক্য থাকে এবং পুরুষ-প্রাণীদের মুখে প্রকাণ্ড আকারের ছেদক-দন্ত দেখা দেওয়ার সঙ্গে এর একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও আছে। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে মানুষের সেই বহুপ্রাচীন পুরুষ-পূর্বজদের চোয়াল ও দাঁত আকারে ছোট হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা তাদের আকৃতিতে নিশ্চয়ই একটা আকর্ষণীয় ও সুবিধাজনক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

নারীর তুলনায় পুরুষের আকার ও শক্তি বেশি হয়, কাঁধ প্রশস্ততর হয়, পেশীগুলো বেশি সুগঠিত হয়, দেহরেখা অমসৃণ হয়, সাহস ও যুদ্ধপ্রিয়তা বেশি হয়। এই সবকিছু যে সে মূলত তার অর্ধ-মানব পুরুষ-পূর্বজদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রেই লাভ করেছে, তাতে কোনও সন্দেহই নেই। তবে, মানুষের বন্য দশার সুদীর্ঘ পর্যায়ে, জীবনধারণের সাধারণ সংগ্রামে এবং স্ত্রী-সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় সবথেকে বলিষ্ঠ ও সবথেকে সাহসী পুরুষদের সাফল্যের মধ্যে দিয়েই এই বৈশিষ্ট্যগুলো রক্ষিত হয়েছে বা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে—যে-সাফল্যের ফলে অপেক্ষাকৃতভাবে কম সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা অন্যান্য মানুষদের থেকে অনেক বেশি সন্তান-সন্ততি রেখে যেতে সক্ষম হয়েছে তারা। নিজের এবং নিজের পরিবারের জীবনধারণের জন্য পুরুষরা নারীদের তুলনায় অধিকতর কঠোর পরিশ্রম করত এবং সেই ঘটনারই উত্তরাধিকারমূলক ফল হিসেবে আদিতে পুরুষরা নারীদের থেকে বেশি শক্তি অর্জন

করেছিল—এ-যুক্তি আদৌ ধোপে টেকে না, কারণ সমস্ত বর্বর জাতির মধ্যেই নারীরা পুরুষদের সমানই কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়। সভ্য জাতিগুলোর মধ্যে নারীদের দখল করার ব্যাপারে লড়াইকে সালিশি মানার ব্যাপারটা অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যদিকে, এই সভ্য জাতিগুলোর মধ্যে পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য নারীদের তুলনায় পুরুষদেরই সাধারণত বেশি পরিশ্রম করতে হয় এবং তার ফল হিসেবে তাদের শক্তিসামর্থ্য নারীদের তুলনায় বেশি হয়ে থাকতে পারে।

নারী-পুরুষের মানসিক ক্ষমতার পার্থক্য

নারী ও পুরুষের মধ্যে মানসিক ক্ষমতার যে-পার্থক্য দেখা যায়, সে ব্যাপারে যৌন নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করেছে বলে মনে হয়। নারী-পুরুষের মধ্যে এই জাতীয় কোনও সহজাত পার্থক্য থাকার ব্যাপারে অনেক লেখকই যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তা আমার অজানা নয়। কিন্তু নিম্নতর শ্রেণীর যে-সব প্রাণীদের মধ্যে অন্যান্য অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাদের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে ব্যাপারটাকে আর একেবারে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গাভীদের থেকে বলদদের, স্ত্রী-বন্যশুয়োরের থেকে পুরুষ-বন্যশুয়োরের, মাদি-ঘোড়াদের থেকে মদ্দা-ঘোড়াদের মেজাজ যে আলাদা হয়, তা তো সবারই জানা। বন্যপ্রাণী সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধায়কদের কাছ থেকে জানা যায় যে বড় জাতের বিভিন্ন বর্গের বানরদের মধ্যেও পুরুষ-বানরদের সঙ্গে স্ত্রী-বানরদের মেজাজের পার্থক্য থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে পুরুষদের মেজাজের সঙ্গে নারীদের মেজাজের মূল পার্থক্যটা নিহিত থাকে নারীদের কোমলতর স্বভাব এবং কম স্বার্থপরতার মধ্যে। বন্য দশার মানুষদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য, যার প্রমাণ পাওয়া যায় মাঙ্গো পার্কের ভ্রমণবৃত্তান্তের একটি সুপরিচিত অনুচ্ছেদে এবং অন্য বহু পর্যটকের বক্তব্যে। সহজাত মাতৃভাবের দরুন নারীরা তাদের সন্তানদের প্রতি আচরণে নিজেদের এই মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করে থাকে। অতএব এই মনোভাব যে তারা তাদের আশপাশের অন্য মানুষজনদের দিকেও প্রসারিত করে দেবে, তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। পুরুষরা অন্য পুরুষদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই দেখে। প্রতিযোগিতায় তারা আনন্দ পায়। এ থেকে জন্ম নেয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাই পরিণত হয় স্বার্থপরতায়। এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো যেন পুরুষদের স্বাভাবিক এবং দুর্ভাগ্যজনক জন্মগত অধিকারে পরিণত হয়েছে। এটা মোটামুটি স্বীকৃত যে নারীদের স্বজ্ঞা, দ্রুত উপলব্ধির ক্ষমতা এবং সম্ভবত অনুকরণক্ষমতাও পুরুষদের থেকে বেশি হয়। তবে এগুলোর মধ্যে অন্তত কয়েকটা ব্যাপার অনুন্নত জাতিগুলোর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, অতএব সেগুলোকে সভ্যতার বিগত এবং নিম্নতর অবস্থারই বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনা করা উচিত।

নারী ও পুরুষের মননগত ক্ষমতার মধ্যে প্রধান পার্থক্যটা কোথায়? যে-কোনও ব্যাপারেই, তা সে গভীর চিন্তা, যুক্তিপ্রয়োগ বা কল্পনা সংক্রান্তই হোক কিংবা স্রেফ নিজের স্বাভাবিক বোধ আর হাতকে কাজে লাগানোই হোক—সব ব্যাপারেই পুরুষরা যে নারীদের থেকে বেশি উচ্চতায় পৌঁছতে পারে, সেটা ঘটনা। কাব্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত (সঙ্গীত সৃষ্টি এবং পরিবেশন, উভয় ক্ষেত্রেই), ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের জগতের বিশিষ্টতম পুরুষ আর নারীদের নামের দু'টো আলাদা তালিকা যদি বানানো যায় এবং প্রতিটা বিষয়ে যদি ছ'জনের নাম সেই তালিকায় রাখা হয়, তাহলে দেখা যাবে দু'টো তালিকার মধ্যে কোনও তুলনাই করা চলে না। 'হেরেডিটরি জিনিয়াস' রচনায় মিঃ গ্যাল্টন গড়পড়তা ধরন থেকে বিচ্যুতির যে-নিয়মটিকে চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই নিয়ম অনুযায়ী বিচার করলে এই সিদ্ধান্তেও আসা যায় যে বিভিন্ন বিষয়ে পুরুষরা যদি নারীদের থেকে স্পষ্টতই উন্নততর হতে সক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে পুরুষদের গড় মানসিক ক্ষমতাও নারীদের থেকে অবশ্যই উন্নততর।

মানুষের অর্ধ-মানব পূর্বজদের মধ্যে এবং বন্য দশায় থাকা মানুষদের জীবনবৃত্তে নারীদের দখল করার জন্য পুরুষদের মধ্যে বহু প্রজন্ম ধরে লড়াই চলেছে এবং চলেই থাকে। কিন্তু সাহস, অধ্যবসায় এবং স্থিরসঙ্কল্প উৎসাহের সঙ্গে যুক্ত না হলে শুধু শারীরিক শক্তি ও বড়সড় চেহারার দৌলতে এ-লড়াইতে জেতা যায় না। সমাজবদ্ধ প্রাণীদের ক্ষেত্রে, কোনও নারীকে জয় করার জন্য তরুণ পুরুষদের অনেক প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে হয় এবং নিজেদের নারীদের রক্ষা করার জন্য নিত্যনতুন লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয় বর্ষীয়ান পুরুষদের। মানুষের ক্ষেত্রে দায়িত্বটা আরও বেশি—নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের রক্ষা করতে হয় সব ধরনের শত্রুর আক্রমণ থেকে, সেইসঙ্গেই ব্যবস্থা করতে হয় জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহের। কিন্তু শত্রুকে এড়িয়ে যাওয়া অথবা তাকে আক্রমণ করা, বন্য জীবজন্তুদের বন্দী করা, হাতিয়ার বানানো প্রভৃতি কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন উন্নততর মানসিক গুণ—পর্যবেক্ষণ, যুক্তিপ্রয়োগ, উদ্ভাবন অথবা কল্পনাশক্তি। চলার পথে এই গুণগুলো সারাক্ষণই বাস্তবে প্রযুক্ত হয় এবং তাদের সঠিক-বেঠিক নির্ধারিত হয়। ক্রমাগত প্রয়োগের ফলস্বরূপ জীবনের এক-একটি পর্যায়ে গুণগুলো উন্নততরও হয়ে উঠে। এর ফল হিসেবে এই গুণগুলো প্রধানত তাদের পুরুষ-সন্তানদের মধ্যে জীবনের সেই নির্দিষ্ট পর্যায়গুলোতে সঞ্চারিত হতে পারে বলে আশা করা যায়—যে-নিয়মটির কথা আগে আমরা অনেকবারই বলেছি।

ধরা যাক দু'জন পুরুষের মধ্যে অথবা একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর প্রতিযোগিতা চলছে। মানসিক গুণাবলী দু'জনেরই সমান, তবে একজনের উৎসাহ,

অধ্যবসায় ও সাহস অন্যজনের থেকে বেশি। সেক্ষেত্রে কী ঘটবে? ঘটবে একটাই ঘটনা—উৎসাহ, অধ্যবসায় আর সাহস যার বেশি সে প্রতিটি বিষয়েই বিশিষ্টতর হয়ে উঠবে এবং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে।[২৪] তাকে প্রতিভাধরও বলা যেতে পারে, কারণ জনৈক সুপণ্ডিত ব্যক্তির মতে—ধৈর্যই হল প্রতিভা। আর এই অর্থে ধৈর্য বলতে বোঝায় অবিচল, অদম্য অধ্যবসায়। তবে প্রতিভা সংক্রান্ত এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কিছুটা অসম্পূর্ণতা বোধহয় রয়েই গেছে, কারণ কল্পনাশক্তি ও যুক্তিপ্রয়োগের উন্নত ক্ষমতা ছাড়া বহু বিষয়েই কোনও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয় না। এই শেষোক্ত গুণগুলো এবং সেইসঙ্গে পূর্বোক্ত গুণগুলোও পুরুষদের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে অংশত যৌন নির্বাচন মারফত অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা মারফত, এবং অংশত প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত অর্থাৎ জীবনধারণের সাধারণ সংগ্রামে সাফল্যের মারফত। এই উভয় ক্ষেত্রেই সংগ্রামটা পরিণত বয়সেই ঘটে বলে অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের নারী-সন্তানদের তুলনায় অনেক পূর্ণাঙ্গভাবে সঞ্চারিত হয় তাদের পুরুষ-সন্তানদের মধ্যেই। যৌন নির্বাচন মারফত আমাদের বেশ কিছু মানসিক ক্ষমতার রূপান্তরের এবং নতুন করে বেড়ে ওঠার এই দৃষ্টিভঙ্গীটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দু'টো ব্যাপারের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, বয়ঃসন্ধির সময়ে এই ক্ষমতাগুলোর একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে[২৫]। দ্বিতীয়ত, নপুংসকরা সারা জীবনই এই ক্ষমতাগুলোর ব্যাপারে অনেকটা পিছিয়ে থাকে। তো, এইভাবেই পুরুষরা শেষপর্যন্ত নারীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। উভয় লিঙ্গের সন্তানদের মধ্যেই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সমানভাবে সঞ্চারিত হওয়ার নিয়মটা যে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান আছে, সেটা রীতিমতো সৌভাগ্যেরই কথা। অন্যথায় শরীরের (পেখম জাতীয়) চাকচিক্যের ব্যাপারে ময়ূরেরা ময়ূরীদের থেকে যতটা এগিয়ে থাকে, মানসিক গুণাবলীর ব্যাপারে পুরুষরাও নারীদের থেকে ততটাই এগিয়ে থাকত।

একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার। কোনও-একটি লিঙ্গের সদস্যরা বেশি বয়সে যে-সব বৈশিষ্ট্য অর্জন করে সেগুলো সেই লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে সেই বয়সেই সঞ্চারিত হয় এবং কম বয়সে অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো সঞ্চারিত হয় উভয় লিঙ্গেরই বংশধরদের মধ্যে—এই নিয়ম দু'টি সাধারণভাবে সত্য হলেও সব ক্ষেত্রেই সত্য নয়। এ-নিয়ম সব ক্ষেত্রেই সত্য হলে আমরা বলতে পারতাম (এখানে আমাকে

২৪। জে. স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন ('দ্য সাবজেকশন অফ উইমেন', ১৮৬৯, পৃঃ ২২২), 'যে-সব ব্যাপারে অত্যন্ত কষ্ট করে লেগে থাকতে হয় এবং একটিমাত্র বিষয় নিয়ে নাছোড়বান্দার মতো পরিশ্রম করতে হয়, সেইসব ব্যাপারেই পুরুষরা নারীদেরকে সবথেকে বেশি করে ছাপিয়ে যায়।' উৎসাহ আর অধ্যবসায় ছাড়া একে আর কী-ই বা বলা যায়?

২৫। মড্‌স্লে, 'মাইন্ড অ্যান্ড বডি', পৃঃ ৩১।

আমার আলোচনার পরিধির বাইরে চলে যেতে হচ্ছে)—ছেলেমেয়েরা যখন অল্প বয়স থেকেই শিক্ষালাভ করছে, তখন সেই শিক্ষার প্রভাব উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হওয়া উচিত ছিল তাদের উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই। কিন্তু তা হয়নি। অর্থাৎ নারী-পুরুষের মানসিক ক্ষমতার বর্তমান অসাম্যকে অল্প বয়স থেকে শিক্ষার সাহায্যে দূর করা যাবে না, আবার অল্প বয়স থেকে বিসদৃশ ধরনের শিক্ষার সাহায্যে এই অসাম্য সৃষ্টি করাও যায় না। নারীদেরকে পুরুষদের সমান উচ্চতায় তুলে আনার জন্য যা করা দরকার তা হল—তারা প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠলে তাদের কর্মোদ্যম ও অধ্যবসায়ের শিক্ষা দিতে হবে, যুক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতা ও কল্পনাশক্তিকে সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগানোর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তা যদি করা যায়, তাহলে হয়তো তারা তাদের এই মানসিক ক্ষমতাগুলো প্রধানত নিজেদের প্রাপ্তবয়স্ক কন্যাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে সক্ষম হবে। তবে সব নারীদের এভাবে উন্নত করে তোলা সম্ভব নয়। উপরোক্ত গুণাবলীতে সমৃদ্ধ নারীরা প্রত্যেকে বিবাহ করলে এবং অন্য নারীদের তুলনায় তাদের সন্তানসন্ততির সংখ্যা বেশি হলেই একমাত্র এই লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব হতে পারে। শারীরিক শক্তির ব্যাপারে আগে বলা কথাটাই আবার উল্লেখ করা যায়—স্ত্রী-সংগ্রহের জন্য লড়াই করার রীতিটা অপ্রচলিত হয়ে যাওয়ার ফলে এখন আর পুরুষদের স্ত্রী-সংগ্রহের জন্য লড়াই করতে হয় না ঠিকই, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার পর নিজেদের এবং নিজেদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য সাধারণত বেশ কঠোর সংগ্রামই করতে হয় তাদের। এর ফলে তাদের মানসিক ক্ষমতাগুলোও যথাযথভাবে বজায় থাকে বা এমনকী বেড়েও যায়, আর তার ফলস্বরূপই দেখা দেয় নারী-পুরুষের মধ্যেকার এই বর্তমান অসাম্য।[২৬]

কণ্ঠস্বর এবং সাঙ্গীতিক ক্ষমতা

বানরদের কিছু প্রজাতির পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীদের কণ্ঠস্বরে এবং স্বরতন্ত্রীর বিকাশে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ করা যায়। আদি পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এই পার্থক্যটা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে মানুষও। পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের স্বরতন্ত্রী পূর্ণবয়স্ক নারীদের

২৬। এ-ব্যাপারে ফখ্‌ৎ কিছু অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 'লক্ষণীয় বিষয় হল, কোনও জাতি যতই উন্নত হয়ে ওঠে, তার অন্তর্গত পুরুষ ও নারীদের করোটি-গহ্বরের মধ্যেকার পার্থক্যও ততই বেড়ে চলে। যেমন, ইউরোপীয় পুরুষদের করোটি-গহ্বর ইউরোপীয় নারীদের চেয়ে অনেক বড়, নিগ্রো পুরুষদের করোটি-গহ্বর নিগ্রো নারীদের চেয়ে অনেক বড়। হাশ্‌কে-র এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন ওয়েকার, যিনি নিগ্রো এবং জার্মানদের করোটি পরিমাপ করে দেখেছেন।' তবে ফখ্‌ৎ স্বীকার করেছেন ('লেকচারস অন ম্যান', ইংরেজি অনুবাদ, ১৮৬৪, পৃঃ ৮১) যে এ-বিষয়ে আরও অনুসন্ধান চালানো দরকার।

থেকে কিংবা অল্পবয়সী বালকদের থেকে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দীর্ঘতর হয়। নিম্নতর শ্রেণীর পুরুষ-প্রাণীদের খোজা করা হলে যা ফল হয়, মানব-পুরুষের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই-ই ঘটে, কারণ এর ফলে তাদের 'গল-গ্রন্থি (thyroid) ইত্যাদির সেই লক্ষণীয় বৃদ্ধিটা রুদ্ধ হয়ে যায় যা তাদের স্বরতন্ত্রীর প্রসারণে সাহায্য করে থাকে।'[২৭] নারী-পুরুষের মধ্যেকার এই পার্থক্যের কারণ সম্বন্ধে বলতে গেলে আগের পরিচ্ছেদে বলা কথাটারই পুনরাবৃত্তি করতে হয়, অর্থাৎ—প্রেম, ক্রোধ আর ঈর্ষার উত্তেজনায় পুরুষরা তাদের স্বরযন্ত্রগুলিকে বহু যুগ ধরে বেশি মাত্রায় ব্যবহার করে এসেছে এবং সম্ভবত তার ফলেই দেখা দিয়েছে এই পার্থক্য। স্যর ডানকান গিব-এর মতে[২৮] —মানুষের বিভিন্ন জাতির সদস্যদের কণ্ঠস্বর ও স্বরযন্ত্রের গঠনে পার্থক্য থাকে, কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ জাতির মতো তাতার, চিনা প্রভৃতি জাতির পুরুষদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তাদের নারীদের কণ্ঠস্বরের খুব-একটা পার্থক্য থাকে না।

গান গাওয়া বা সঙ্গীতসৃষ্টির ক্ষমতা ও তার প্রতি ভালবাসা মানুষের কোনও যৌন বৈশিষ্ট্য না হলেও তা নিয়ে আলোচনা করাটা অবশ্যই দরকার। সব ধরনের পশুপাখিরা কণ্ঠ থেকে যে-সব শব্দ সৃষ্টি করে তা তাদের নানাবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে ঠিকই, তবু জোর দিয়েই বলা চলে যে স্বরসৃষ্টির অঙ্গগুলো প্রথমে ব্যবহৃত হত এবং যথাযথ হয়ে উঠত প্রজাতির বংশবিস্তারের স্বার্থেই। ইচ্ছাকৃতভাবে শব্দ সৃষ্টির ব্যাপারে নিম্নতম শ্রেণীর প্রাণী হচ্ছে কীটপতঙ্গ ও কয়েক ধরনের মাকড়সা। সাধারণত শব্দসৃষ্টির সুগঠিত অঙ্গের সাহায্যেই শব্দ সৃষ্টি করে তারা এবং এই অঙ্গগুলো প্রায়শ শুধু পুরুষ-প্রাণীদের শরীরেই থাকে। এইভাবে সৃষ্ট শব্দগুলোর মধ্যে, আমার ধারণা সব ক্ষেত্রেই, একই সুর (note) থাকে, ছন্দোবদ্ধভাবে তার পুনরাবৃত্তি হয়,[২৯] এবং এই সুরটা কখনও কখনও মানুষের কানেও শ্রুতিমধুর লাগে। এইভাবে শব্দসৃষ্টির প্রধান, এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে একমাত্র, উদ্দেশ্য হল বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীদের আহ্বান করা অথবা আকৃষ্ট করা।

শব্দ মাছেরাও সৃষ্টি করে। কয়েকটি ক্ষেত্রে সঙ্গমের মরশুমে শুধু পুরুষ-মাছেরাই শব্দ সৃষ্টি করে বলে শোনা যায়। শ্বাসগ্রহণকারী সব ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণীদেরই শ্বাস নেওয়া ও ত্যাগ করার জন্য একটা অঙ্গ থাকেই, যার মধ্যে এক মুখ বন্ধ করা যায় এমন একটা নল থাকে। তার ফলে এই বর্গের আদি সদস্যরা যখন অত্যন্ত

২৭। ওয়েন, 'অ্যানাটমি অফ ভার্টিব্রেট্স্', খণ্ড ৩, পৃঃ ৬০৩।

২৮। 'জার্নাল অফ দ্য অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি', এপ্রিল ১৮৬৯, পৃঃ ৫৭ এবং ৬৬।

২৯। ডঃ স্কাডার, 'নোটস অন স্ট্রাইডিউলেশন' লেখাটির জন্য দ্রষ্টব্য—'প্রসিডিংস অফ দ্য বোস্টন সোসাইটি অফ ন্যাচরাল হিস্ট্রি', খণ্ড ১১, এপ্রিল ১৮৬৮।

উত্তেজিত হয়ে উঠত এবং তাদের পেশীগুলো ভীষণভাবে সঙ্কুচিত হত, তখন কিছু উদ্দেশ্যহীন শব্দ অবশ্যই সৃষ্টি হত বলে ধরে নেওয়া যায়। এইভাবে সৃষ্ট শব্দগুলো কোনওভাবে তাদের কাজে লাগার উপযোগী হিসেবে প্রমাণিত হলে যথাযথভাবে অভিযোজিত পরিবর্তনের পথ বেয়ে শব্দসৃষ্টির অঙ্গগুলোও উন্নত হয়ে উঠত। শ্বাসগ্রহণকারী নিম্নতম শ্রেণীর মেরুদণ্ডী হচ্ছে উভচর প্রাণীরা। এদের মধ্যে ব্যাঙ এবং ব্যাঙসদৃশ টোড-দের শরীরে স্বরসৃষ্টির অঙ্গ থাকে। সঙ্গমের মরশুমে এই অঙ্গটিকে অবিরাম ব্যবহার করে তারা এবং স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের শরীরের এই অঙ্গটি প্রায়শই অধিকতর উন্নত অবস্থায় থাকে। কচ্ছপদের মধ্যে একমাত্র পুরুষ-কচ্ছপরাই শব্দ সৃষ্টি করে থাকে এবং শুধুমাত্র সঙ্গমের মরশুমেই এই শব্দ সৃষ্টি করে তারা। সঙ্গমের মরশুমে পুরুষ-কুমিররাও (alligator) গর্জন করে থাকে। প্রেম-নিবেদনের পন্থা হিসেবে কত ধরনের পাখিরা যে তাদের স্বরযন্ত্রকে ব্যবহার করে থাকে, তা তো কারুরই অজানা নয়। কিছু কিছু প্রজাতির পাখিরা এমন সুর সৃষ্টি করে যাকে অনায়াসেই যন্ত্রসঙ্গীত হিসেবে চিহ্নিত করা চলে।

স্তন্যপায়ীদের—যাদের নিয়েই আমরা এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করতে চাইছি—প্রায় সব প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীরাই অন্য যে-কোনও সময়ের থেকে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে অনেক বেশি ব্যবহার করে সঙ্গমের মরশুমে। কয়েকটি প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীরা শুধুমাত্র এই সঙ্গমের মরশুম বাদে অন্য সময়ে পুরোপুরি মূক থাকে। আবার অন্য কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে উভয় লিঙ্গের সদস্যরাই কিংবা শুধুমাত্র স্ত্রী-প্রাণীরাই সঙ্গমের আহ্বান হিসেবে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে ব্যবহার করে থাকে। এই তথ্যগুলি আমরা মনে রাখছি, সেইসঙ্গেই মনে রাখছি যে কয়েক ধরনের চতুষ্পদ প্রাণীর পুরুষ-সদস্যদের স্বরযন্ত্র স্ত্রী-সদস্যদের থেকে অনেক বড় হয়—কখনও স্থায়ীভাবে, কখনও-বা শুধু সঙ্গমের মরশুমে। আমরা আরও মনে রাখছি যে নিম্নতর শ্রেণীর অধিকাংশ পুরুষ-প্রাণীরা যে-শব্দ সৃষ্টি করে তা যে শুধু স্ত্রী-প্রাণীদের আহ্বান করার কাজেই লাগে তা-ই নয়, তাদের উত্তেজিত করা বা প্রলুব্ধ করার কাজেও সাহায্য করে। এইসব তথ্য সামনে থাকা সত্ত্বেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, স্তন্যপায়ী পুরুষ-প্রাণীরা যে স্ত্রী-প্রাণীদের মুগ্ধ করার জন্য নিজেদের এই অঙ্গগুলিকে কাজে লাগায়, এমন কোনও সুস্পষ্ট প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অবশ্য আমেরিকান মাইসেটেস ক্যারায়া আর মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হাইলোবেত্‌স অ্যাজিলিস-দের এর ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এই উল্লুকদের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উচ্চ অথচ সুরেলা। মিঃ ওয়াটারহাউস বলেছেন[৩০], 'আমি দেখেছি এদের

৩০। দ্রষ্টব্য, ডব্লিউ. সি. এল. মার্টিন-এর 'জেনারেল ইনট্রোডাকশন টু ন্যাচরাল হিস্ট্রি অফ ম্যামালিয়ান অ্যানিম্যালস', ১৮৪১, পৃঃ ৪৩২ ; ওয়েন, 'অ্যানাটমি অফ ভার্টিব্রেট্‌স্', খণ্ড ৩, পৃঃ ৬০০।

কণ্ঠস্বরের আরোহ-অবরোহের সময় বিরতির স্থানগুলো সর্বদাই অর্ধস্বন (half-tone) হয়। সর্বোচ্চ স্বরটা যে নিম্নতম স্বরেরই অষ্টকে (octave) বাঁধা থাকে, সে ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত। স্বরগুলি অত্যন্ত সুরেলা। উল্লুকদের স্বরলিপির ব্যাপারে কোনও বেহালাবাদক যে নিখুঁত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হবেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই—একমাত্র ওই উচ্চরবের ব্যাপারটা ছাড়া।' অতঃপর উল্লুকদের স্বরগুলো (notes) আমাদের সামনে পেশ করেছেন মিঃ ওয়াটারহাউস। অধ্যাপক ওয়েন, যিনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেও স্বীকৃত, তিনি উপরোক্ত মন্তব্যটিকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন (যদিও কথাটা ঠিক নয়) যে 'স্তন্যপায়ী পশুদের মধ্যে একমাত্র এই উল্লুকরাই গান গাইতে পারে।' গান গাওয়ার পর এই উল্লুকরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকার সময় এদের অভ্যাস-আচরণ যে কখনও খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়নি, সেটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। তবে অন্যান্য প্রাণীদের দৃষ্টান্ত মনে রেখে বলা যেতে পারে যে, নিজেদের এই সাঙ্গীতিক ক্ষমতাকে সঙ্গমের মরশুমেই বেশি মাত্রায় ব্যবহার করে এরা।

এই বর্গের মধ্যে শুধু এই প্রজাতির উল্লুকরাই যে গান গায়, এমন নয়। আমার পুত্র ফ্রান্সিস ডারউইন চিড়িয়াখানায় গিয়ে এইচ. লিউকিসকাস প্রজাতির উল্লুকদেরও গান গাইতে শুনে এসেছে—তিনস্বরবিশিষ্ট সুরে, সঙ্গীতের নিয়ম মেনে ঠিক জায়গায় ফাঁক দিয়ে দিয়ে, রীতিমতো সুরেলা গলায় গান গাইছিল এই প্রজাতির একটি উল্লুক। আরও বেশি বিস্ময়কর ব্যাপার হল—তীক্ষ্ণদন্তী কিছু কিছু প্রাণীও সুরেলা শব্দ সৃষ্টি করে থাকে। গান-গাওয়া নেংটি ইঁদুরের কথা প্রায়ই শোনা গেলেও অনেকেই ব্যাপারটাকে জালিয়াতি বলেই মনে করেন। তবে অবশেষে রেভারেন্ড এস. লকউড[৩১]-এর মতো একজন স্বনামধন্য পর্যবেক্ষক আমাদের সামনে পেশ করেছেন হেসপেরোমিস কগ্‌ন্যাটাস নামক আমেরিকান প্রজাতির এক ধরনের নেংটি ইঁদুরদের সাঙ্গীতিক ক্ষমতার বৃত্তান্ত। ইংরেজ প্রজাতির নেংটি ইঁদুরদের থেকে পৃথক বর্গের ইঁদুর এরা। এই প্রজাতির একটি ছোট্ট স্ত্রী-ইঁদুরকে একলা বন্দী করে রাখা হয়েছিল এবং তখন তার এই সুরেলা ডাক ঘনঘন শোনা গিয়েছিল। যে-দু'টো গান সে বেশি করে সাধছিল তার মধ্যে একটায় 'শেষ স্বরটা প্রায়শই দু'-তিন মাত্রা পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল, মাঝেমাঝে তার গলা সি শার্প থেকে ডি-তে, সি ন্যাচরাল থেকে ডি-তে চলে যাচ্ছিল, তারপর কিছুক্ষণ এই দু'টো সুরে স্বরকম্পন ঘটিয়ে, অতঃপর সি শার্প আর ডি-তে দ্রুত একবার কিঁচকিঁচ করে গান থামাচ্ছিল। দুনমাত্রিক ধ্বনিগুলোর (semitone) মধ্যে পার্থক্য ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট এবং শোনার কান থাকলে তা ভাল

৩১। 'আমেরিকান ন্যাচরালিস্ট', ১৮৭১, পৃঃ ৭৬১।

লাগতে বাধ্য।' তার দু'টো গানেরই (বা সুরেরই) স্বরলিপি তৈরি করেছেন মিঃ লকউড, সেইসঙ্গেই বলেছেন যে এই ছোট্ট ইঁদুরটির 'ছন্দ বা তালবোধ না থাকলেও সে কিন্তু বি-এর (দু'টি ফ্ল্যাট) স্বরগ্রামেই, মূলত মেজর স্বরগ্রামেই, আবদ্ধ থাকছিল'...'তার কোমল ও স্পষ্ট স্বর একেবারে নিখুঁতভাবেই অষ্টকের স্বরগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল, তারপর শেষ করার সময় একবার সি শার্প আর ডি-তে অত্যন্ত দ্রুত স্বরের কম্পন করে গান থামাচ্ছিল সে।'

জনৈক প্রাবন্ধিক প্রশ্ন তুলেছেন—নির্বাচনের সাহায্যে মানুষের কানগুলো (এইসঙ্গেই অন্যান্য প্রাণীদের কথাও তিনি বলতেই পারতেন) কী করে এমনভাবে অভিযোজিত হল যাতে করে তারা বিভিন্ন সাঙ্গীতিক স্বরের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে? প্রশ্নটা একটু বিভ্রান্তিকর। বাতাসে বিভিন্ন মাত্রার বেশ কিছু 'সাধারণ কম্পন'-এর সহাবস্থানের অনুভূতিই হল শব্দ। প্রতিটি কম্পনের মধ্যে ফাঁক এত কম থাকে যে তাদের পৃথক পৃথক অস্তিত্বটা আমরা অনুভব করে উঠতে পারি না। এই ধরনের কম্পনের ধারাবাহিকতার এবং সামঞ্জস্যের অভাবই সাধারণ শব্দকে সাঙ্গীতিক স্বরের থেকে আলাদা করে দেয়। তাই যে-কান বিভিন্ন শব্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম (এবং তাবত পশুদের মধ্যে এই ক্ষমতার বিপুল গুরুত্বের কথাটা সকলেই স্বীকার করে থাকেন), সেই কান সাঙ্গীতিক স্বরের ব্যাপারেও সংবেদনশীল হতে বাধ্য। নিম্নতম শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও এই ক্ষমতা থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের দেহে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের শ্রবণ-কেশ (anditory hair) থাকে এবং উপযুক্ত সুরের অভিঘাতে সেগুলো আন্দোলিত হয়।[৩২] পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা বলেছি যে ডাঁশদের শুঙ্গের কেশেও একই ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। সুদক্ষ পর্যবেক্ষকরা জোর দিয়ে বলেছেন যে মাকড়সারা সঙ্গীতের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এটাও সকলেরই জানা যে বিশেষ বিশেষ সুর শুনলে কিছু কুকুর ঘেউঘেউ করতে শুরু করে।[৩৩] সীলমাছেরাও সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়। সঙ্গীতের প্রতি তাদের এই আকর্ষণের কথা 'প্রাচীনকালের মানুষরা খুব ভাল করেই জানত। আজকের দিনের শিকারিরাও প্রায়শই এই আকর্ষণের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে শিকার করে থাকে।'[৩৪]

অতএব, সাঙ্গীতিক সুরের ইন্দ্রিয়গত উপলব্ধির ব্যাপারে মানুষের অথবা অন্য

৩২। হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ, 'Theorie Phys. de la Musique', ১৮৪৮, পৃঃ ১৮৭।

৩৩। এ ব্যাপারে বেশ কিছু বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। মিঃ পিচ আমাকে একটি বৃদ্ধ কুকুরের কথা জানিয়েছেন। বাঁশিতে বি-ফ্ল্যাট বাজানো হলেই কুকুরটি ঘেউঘেউ করতে শুরু করত, অথচ অন্য কোনও সুর বাজালে তার কোনও প্রতিক্রিয়া হত না। এইসঙ্গে আর-একটি কুকুরের কথাও আমি যোগ করতে পারি। কনসার্টিনার একটা বেসুরো সুর বাজালেই কেঁউকেঁউ করে কাঁদতে শুরু করত সে।

৩৪। মিঃ আর. ব্রাউন-এর প্রবন্ধ, 'প্রসিডিংস অফ দ্য জুলজিক্যাল সোসাইটি', ১৮৬৮, পৃঃ ৪১০।

কোনও প্রাণীর বিশেষ কোনও অসুবিধা থাকে না। শারীরতাত্ত্বিক নীতির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করে হেল্‌মহোল্‌ৎজ্‌ দেখিয়েছেন মানুষের কানে বিভিন্ন সুরের সুসমন্বয় কেন শ্রুতিমধুর লাগে, আর কেনই-বা বিভিন্ন সুরের অসামঞ্জস্য শ্রুতিকটু লাগে। তবে এ বিষয়টা নিয়ে আমাদের তত মাথাব্যথা নেই, কারণ ঐকতানবিশিষ্ট সঙ্গীত অনেক পরবর্তীকালের উদ্ভাবন। এখানে আমরা বেশি করে বুঝতে চাইছি সুরেলা ধ্বনির ব্যাপারটা। এক্ষেত্রেও হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজের ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় আমাদের সঙ্গীতের স্কেলে বিভিন্ন স্বর ব্যবহার করা হয় কেন। যাবতীয় ধ্বনিকেই তাদের গঠনকর 'সরল কম্পন'-এ বিশ্লিষ্ট করে নেয় আমাদের কান, যদিও বিশ্লেষণের এই প্রক্রিয়াটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। সঙ্গীতের স্বরমালায় সাধারণত সবথেকে খাদের স্বরগুলোরই প্রাধান্য থাকে। বাকি থাকে অষ্টক, দ্বাদশ, দ্বিতীয় অষ্টক ইত্যাদি এবং এগুলো সবই মূল প্রাধান্যকারী স্বরের ঐকতান হিসেবে কাজ করে। আমাদের স্কেলের যে-কোনও দু'টো স্বরের এ-রকম বেশ কিছু সাধারণ ঐকতানমূলক উপস্বর থাকে। তাই কোনও প্রাণী যদি সবসময় একই গান গাইতে চায়, তাহলে সে পর্যায়ক্রমে ঠিক সেই স্বরগুলোই সৃষ্টি করে চলবে যেগুলোর মধ্যে বেশ কিছু সাধারণ উপস্বর আছে—অর্থাৎ সে তার গানের জন্য বেছে নেবে আমাদের সাঙ্গীতিক স্কেলের স্বরগুলোকেই।

কিন্তু যদি প্রশ্ন তোলা হয় যে বিশেষ কোনও বিন্যাস ও তালের সাঙ্গীতিক স্বর মানুষ আর অন্যান্য প্রাণীদের কেন আনন্দ দেয়, তাহলে তার কোনও স্পষ্ট উত্তর আমরা দিতে পারব না, শুধু বলতে পারব বিশেষ কিছু স্বাদ আর গন্ধ যেমন আমাদের তৃপ্ত করে এ ব্যাপারটাও অনেকটা সেইরকমই। সঙ্গমের মরশুমে বহু ধরনের কীটপতঙ্গ, মাকড়সা, মাছ, উভচর প্রাণী ও পাখিরা সাঙ্গীতিক স্বর সৃষ্টি করে থাকে। এ থেকে অনুমান করে চলে যে এই ধরনের স্বর বা ধ্বনি তাদের তৃপ্তি দেয়। কারণ তা যদি না হত, স্ত্রী-প্রাণীরা যদি এইসব ধ্বনির মর্মগ্রহণ করতে না পারত এবং তার দ্বারা উত্তেজিত বা মুগ্ধ না হত, তাহলে পুরুষ-প্রাণীদের এত অধ্যবসায়, এত প্রচেষ্টা এবং যে-সব জটিল অঙ্গগুলো প্রায়শ শুধু তাদের শরীরেই থাকে—তার সবটুকুই নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় হতে যেত। আর তা হওয়াটা একেবারেই অসম্ভব।

মানুষের কণ্ঠসঙ্গীতকেই সাধারণত যন্ত্রসঙ্গীতের ভিত্তি বা উৎস বলে মনে করা হয়। মানুষের জীবনযাপনের ব্যাপারে গান শুনে আনন্দ পাওয়ার বা সুরসৃষ্টির ক্ষমতার কোনও ভূমিকাই নেই বলে ব্যাপারটাকে মানুষের সবথেকে রহস্যময় গুণাবলীর অন্যতম একটি বলেই বিবেচনা করা উচিত। সব জাতির মানুষদের মধ্যেই, এমনকী সবথেকে বন্য দশার মানুষদের মধ্যেও, এই গুণগুলো নিতান্ত প্রাথমিক বা অমার্জিত অবস্থায় হলেও বিদ্যমান থাকে। কিন্তু বিভিন্ন জাতির সাঙ্গীতিক রুচিতে দুস্তর পার্থক্য থাকে বলে আমাদের সঙ্গীত বন্য দশার মানুষদের কোনও তৃপ্তি দেয়

না, আবার তাদের সঙ্গীতকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুৎসিত ও অর্থহীন বলে মনে করি আমরা। এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে ডঃ সিমান[৩৫] 'বলেছেন যে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মেলামেশা থাকা সত্ত্বেও তারা একে অপরের সঙ্গীতকে যথাযথভাবে বোঝে কি না, সে ব্যাপারে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে'। পূর্বদিকে এগোলে আমরা দেখি যে সেখানকার সঙ্গীতের ভাষা স্পষ্টতই আলাদা। তাদের আনন্দের গান এবং নৃত্যানুষঙ্গ এখন আর আমাদের মেজর স্বরগ্রামে বাঁধা হয় না, বাধা হয় মাইনর স্বরগ্রামে। গান-গাঁওয়া উল্লুকদের মতো মানুষের অর্ধ-মানব পূর্বপুরুষরা সাঙ্গীতিক স্বর সৃষ্টি করা এবং তার রসগ্রহণ করার ক্ষমতার অধিকারী ছিল কি না তা জোর দিয়ে বলা না গেলেও এটুকু আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে একেবারে সুপ্রাচীন কালের মানুষরাও এইসব ক্ষমতার অধিকারী ছিল। প্রাচীন কালের দু'টি বাঁশির বর্ণনা দিয়েছেন মঁসিয়ে লার্তেত। বল্‌গা-হরিণের হাড় আর শিং দিয়ে তৈরি এই বাঁশি দুটো পাওয়া গিয়েছিল একটা গুহার মধ্যে, যেখানে আগুন জ্বালার জিনিসপত্র (চকমকি জাতীয়) এবং অধুনালুপ্ত কিছু প্রাণীর দেহাবশেষও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল। গান গাওয়া আর নাচা, দু'টোই খুব প্রাচীন শিল্প। বর্তমানে সবথেকে পিছিয়ে-থাকা সমস্ত বা প্রায়-সমস্ত জাতির মানুষরাও এ-শিল্পের চর্চা করে থাকে। একইভাবে কবিতাও, যাকে গানেরই সন্তান হিসেবে ধরে নেওয়া যায়, অতি প্রাচীন কাল থেকেই চালু আছে। যে সুপ্রাচীন অতীতের নিতান্ত সামান্য নথিই আমাদের হাতে আছে, সেই অতীতেই কবিতার জন্ম হয়েছিল—এ-কথা জেনে অনেকেই রীতিমতো বিস্মিত হয়ে থাকেন।

সাঙ্গীতিক ক্ষমতার অভাব কোনও জাতির মধ্যেই দেখা যায় না এবং এই ক্ষমতা অত্যন্ত দ্রুত ও অত্যুন্নত মাত্রায় বিকশিতও হতে পারে। যেমন নিগ্রোরা আর হটেন্‌টটরা উৎকৃষ্ট সঙ্গীতজ্ঞে পরিণত হয়েছে, যদিও আমরা যাকে সঙ্গীত বলে মনে করি তেমন কিছুর চর্চা এরা নিজেদের দেশে করে না বললেই চলে। তবে আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে খুব সাধারণ কিছু সুর শুনে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন শোয়েইনফার্থ। কিন্তু মানুষের গহনে সুপ্ত অবস্থায় থাকা সাঙ্গীতিক ক্ষমতা কোনও ব্যতিক্রমী ব্যাপার নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় কখনও গান-না-গাওয়া কয়েক প্রজাতির পাখিদের গান গাইতে শেখানো মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়—মানুষের বাড়িতে থাকা একটি চড়াই পাখি তার গলায় তুলে নিয়েছিল শ্যামাপাখির (linnet)

৩৫। 'জার্নাল অফ অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি', অক্টোবর ১৮৭০, পৃঃ ১১। এছাড়াও দ্রষ্টব্য স্যর জন লুবক-এর 'প্রিহিস্টোরিক টাইমস্', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৬৯-এর শেষ দিকের কয়েকটি পরিচ্ছেদ। এখানে তিনি বন্য দশার মানুষদের অভ্যাস-আচরণ নিয়ে রীতিমতো মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

গান। এই দু'টি প্রজাতি অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধযুক্ত এবং এরা দু'জনে একই বর্গের (Insessores) অন্তর্ভুক্ত, যে-বর্গটির মধ্যে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত গায়ক-পাখিরাই পড়ে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে চড়াই পাখিটির কোনও পূর্বপুরুষ হয়তো গায়ক-পাখিই ছিল। তোতাপাখিরা (parrot) এই বর্গের সদস্য নয় এবং তাদের স্বরযন্ত্রের গঠনও এদের থেকে ভিন্ন ধরনের। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কথা বলতে তো শেখানো যায়ই, এমনকী মানুষের উদ্ভাবিত কোনও সুর শিশ্ দিয়ে বাজাতেও শেখানো যায়। অর্থাৎ এদের মধ্যেও সাঙ্গীতিক কিছু ক্ষমতা অবশ্যই থাকে। তবে এ থেকে যদি ধরে নেওয়া হয় যে প্রাচীন কোনও গায়ক-পাখির থেকেই তোতাপাখিরা উদ্ভূত হয়েছে, তাহলে সেটা বোধহয় একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যাবে। প্রাণীদের শরীরের অনেক অঙ্গ ও সহজাত প্রবৃত্তির যে আদতে কোনও-একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য অভিযোজিত হয়ে পরে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, এমন নজির ভুরি ভুরি পেশ করা যায়।[৩৬] এ থেকে বলা যায়, উচ্চমানের সাঙ্গীতিক দক্ষতা অর্জনের ক্ষমতা, যা বন্য দশার মানব-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দেখা যায়, তার সম্ভাব্য কারণ দু'টোই হতে পারে : এক) আমাদের অর্ধ-মানব পূর্বপুরুষরা কোনও অমার্জিত ধরনের সঙ্গীতের চর্চা করত এবং তাদের থেকেই এই ক্ষমতাটা উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হয়েছে ; দুই) ভিন্ন কোনও উদ্দেশ্যে অর্জিত যথাযথ স্বরযন্ত্রটিই এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হয়েছে। তবে শেষোক্ত অনুমানটি সত্য হলে ধরে নেওয়াই যায় (উপরোক্ত তোতাপাখিদের উদাহরণটির মতোই) যে সুর সম্বন্ধে একটা ধারণা তাদের মধ্যে আগে থেকেই ছিল (বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে যে-ব্যাপারটা হামেশাই লক্ষ করা যায়)।

সঙ্গীত আমাদের মধ্যে বিভিন্ন আবেগ জাগিয়ে তোলে, তবে আতঙ্ক, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদির মতো ভয়ংকর আবেগগুলোকে নয়। সঙ্গীত আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে কোমলতা ও ভালবাসার মতো শান্ত অনুভূতি, যা অতি দ্রুতই গভীর অনুরক্তিতে পরিণত হয়। চৈনিক প্রবাদে বলা হয়, 'স্বর্গকে এই পৃথিবীতে নামিয়ে আনার শক্তি আছে সঙ্গীতের।' সঙ্গীত আমাদের মধ্যে জয়গৌরব এবং যুদ্ধোদ্যমের অনুভূতিকেও

৩৬। এই পরিচ্ছেদটি ছাপা হয়ে যাওয়ার পর মিঃ চন্‌সি রাইট-এর লেখা একটি মূল্যবান প্রবন্ধ আমার নজরে পড়ে। ('নর্থ আমেরিকান রিভিউ', অক্টোবর ১৮৭০, পৃঃ ২৯৩)। ওই প্রবন্ধে উপরোক্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মিঃ রাইট বলেছেন, 'প্রকৃতির চূড়ান্ত নিয়মসমূহ বা একরূপতার এমন বহু ফলাফল আছে যেগুলির সাহায্যে কোনও-একটি প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্জনের সহগামী হিসেবে দেখা দেয় বিভিন্ন বাস্তব ও সম্ভাব্য সুবিধা ও অসুবিধা, যেগুলি হয়তো তাদের উপযোগিতার নীতির কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত ছিলই না।' এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী একটি পরিচ্ছেদে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে মানুষের কিছু মানসিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের ব্যাপারে এই নীতিটির যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

সক্রিয় করে তোলে। এইসব শক্তিশালী ও মিশ্র অনুভূতি থেকে মহত্তর কোনও বোধ গড়ে ওঠা মোটেই আশ্চর্য নয়। ডঃ সিমান-এর সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায়—অনেক অনেক লিখিত পৃষ্ঠার থেকে সঙ্গীতের একটিমাত্র স্বরের ওপরে আমরা আমাদের অনুভূতিকে অনেক নিবিড়ভাবে কেন্দ্রীভূত করতে পারি। স্ত্রী-পাখিদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে পুরুষ-পাখিরা যখন তাদের গানের ডালি উজাড় করে দেয়, তখন তারাও হয়তো প্রায় একই আবেগ অনুভব করে—তবে অনেক দুর্বলভাবে এবং অনেক কম জটিলভাবে। ভালবাসাই আজও আমাদের গানের সবতেকে সার্বজনীন বিষয়বস্তু। হাবার্ট স্পেন্সার বলেছেন, 'সঙ্গীত আমাদের মধ্যেকার এমন অনেক সুপ্ত অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে যেগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই আমরা সচেতন থাকি না এবং সেগুলোর অর্থও বুঝি না। অথবা, রিখ্টার যেমন বলেছেন, সঙ্গীত আমাদের এমন অনেক জিনিসের কথা বলে যেগুলো আমরা কোনওদিন দেখবও না।' অন্যদিকে, বক্তৃতা দেওয়ার সময় কোনও বক্তা যখন কোনও অনুভূতিকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন এবং ব্যক্ত করেন (এমনকী সাধারণ কথা বলার ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য), তখন তার মধ্যে সাঙ্গীতিক আরোহ-অবরোহ ও তাল আপনা থেকেই এসে পড়ে। আফ্রিকার নিগ্রোরা ক্রুদ্ধ হলে প্রায়শই গান গাইতে শুরু করে, 'অন্য একজন গান গেয়েই তার উত্তর দেয়, আর গোটা দলটা যেন এক সুরেলা তরঙ্গে আন্দোলিত হয়ে এক সুরে ধুয়ো তোলে।'[৩৭] এমনকী বানররাও তাদের জোরদার অনুভূতিগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন সুরে প্রকাশ করে—ক্রোধ আর অস্থিরতা প্রকাশ করে নিচু সুরে, ভয় আর যন্ত্রণা প্রকাশ করে চড়া সুরে।[৩৮] এইভাবে সঙ্গীত আমাদের মধ্যে যে-অনুভূতি আর ভাবনা জাগিয়ে তোলে অথবা বক্তৃতার আরোহ-অবরোহের মধ্যে দিয়ে যা প্রকাশ পায়, সেগুলো অনির্দিষ্ট হলেও গভীরতায় কম নয়—ব্যাপারটা কোনও-এক সুদূর অতীতের আবেগ ও চিন্তায় মানসিক প্রত্যাবর্তনের মতোই।

যদি আমরা ধরে নিই যে আমাদের সেই অর্ধ-মানব পূর্বপুরুষরা সাঙ্গীতিক সুর ও তালকে ব্যবহার করত সঙ্গমের মরশুমে, যখন সব ধরনের প্রাণীরা শুধু প্রেমের তাড়নাতেই উত্তেজিত হয় না, উত্তেজিত হয় ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও জয়লাভের প্রবল তাড়নাতেও—একমাত্র তাহলেই সঙ্গীত ও আবেগদীপ্ত কথা বলা সংক্রান্ত এই ব্যাপারগুলোকে কিছুটা বুঝে ওঠা সম্ভব হয়। উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত সম্বন্ধ বা অনুষঙ্গের সুদৃঢ় নীতিটির ভিত্তিতে বিচার করলে মনে হয়—সুদূর অতীতের সেই

৩৭। উইনডউ রিড, 'দ্য মার্টারডম অফ ম্যান', ১৮৭২, পৃঃ ৪১১, এবং 'আফ্রিকান স্কেচ বুক' ১৮৭৩, খণ্ড ২, পৃঃ ৩১৩।

৩৮। রেঙ্গার, 'Sauggethire von Paraguay', পৃঃ ৪৯।

প্রবল আবেগগুলোই যেন এক্ষেত্রে অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্টভাবে ফুটে বেরোয় সঙ্গীতের সুরের মধ্যে দিয়ে। কথা বলার ক্ষমতাটা যে সময়ের বিচারে মানুষের অর্জিত ক্ষমতাগুলোর একেবারে অন্তিম পর্যায়ে এসেছে (এবং এটাই তার সর্বোত্তম ক্ষমতাও বটে) আর সাঙ্গীতিক সুর ও তাল সৃষ্টি করার সহজাত ক্ষমতাটা যে নিম্নতম শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায়—তা ধরে নেওয়ার প্রভূত কারণ আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আমরা যদি ধরে নিই যে আবেগদীপ্ত কথা বলার সময় ব্যবহৃত সুর থেকেই মানুষের সাঙ্গীতিক ক্ষমতাটা গড়ে উঠেছে, তাহলে সেটা কিন্তু বিবর্তনের নীতির বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে। কথা বলা বা বক্তৃতা দেওয়ার সময় তাল ও স্বরের উত্থান-পতনের ব্যাপারটা যে আগে-থেকে-গড়ে-ওঠা সাঙ্গীতিক ক্ষমতা থেকেই আসে, তা আমাদের মেনে নিতেই হবে।[৩৯] বাজনা, নাচ, গান ও কবিতা যে কেন এত প্রাচীন শিল্পকলা, তা এ থেকেই বোঝা যায়। এ থেকে আরও এগিয়ে গিয়ে আমরা বলতে পারি এবং পূর্ববর্তী একটি পরিচ্ছেদে আমরা বলেওছি যে ভাষা সৃষ্টির অন্যতম ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল সাঙ্গীতিক ধ্বনি।[৪০]

বানরদের কিছু প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীদের স্বরযন্ত্র স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় অনেক উন্নত এবং উল্লুকরা (নরধর্মী বা মানুষের কাছাকাছি প্রজাতির বানর) সাঙ্গীতিক স্বরমালার পুরো অষ্টকটাই উচ্চারণ করতে পারে, এমনকী গান গাইতে পারে বললেও খুব ভুল বলা হয় না। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে পারস্পরিক ভালবাসাকে

৩৯। 'সঙ্গীতের উৎস ও ক্রিয়াকলাপ' প্রসঙ্গে মিঃ হারবার্ট স্পেনসার-এর অত্যন্ত আকর্ষণীয় আলোচনাটি পাওয়া যাবে তাঁর সংগৃহীত 'প্রবন্ধাবলী' (Essays), ১৮৫৮, পৃঃ ৩৫৯-এ। আমার সিদ্ধান্তের ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন মিঃ স্পেনসার। দিদেরোর মতোই তিনিও বলেছেন যে আবেগদীপ্ত বক্তৃতায় স্বরের যে-উত্থান-পতন ঘটে তার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল সঙ্গীত। আমার মতে, বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের আকৃষ্ট করার জন্যই সাঙ্গীতিক সুর ও তাল অর্জন করেছিল মানবজাতির পুরুষ অথবা নারী-পূর্বজরা। একইভাবে জীবজন্তুদের কিছু প্রবল আবেগের সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে গেছে সাঙ্গীতিক সুর। প্রবল কোনও আবেগকে ব্যক্ত করার সময় সেগুলোকে তারা সহজাত প্রেরণার বশেই কাজে লাগায় অথবা কোনও অনুষঙ্গ মারফত ব্যবহার করে। চড়া অথবা গভীর স্বর কেন মানুষ এবং নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণী উভয়েরই কিছু কিছু আবেগকে অভিব্যক্ত করতে পারে, তার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মিঃ স্পেনসারও দেননি, আমিও দিতে পারছি না। কবিতা আবৃত্তি এবং গান গাওয়ার মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়েও চমৎকার আলোচনা করেছেন মিঃ স্পেনসার।

৪০। লর্ড মনবোডো-র 'অরিজিন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ', খণ্ড ১ (১৭৭৪), পৃঃ ৪৬৯-এ ডঃ ব্ল্যাকলক-এর লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি আছে। ডঃ ব্ল্যাকলকেরও ধারণা ছিল যে 'মানুষের প্রথম ভাষা ছিল সঙ্গীত। স্পষ্টোচ্চারিত ধ্বনির সাহায্যে ভাবনাকে প্রকাশ করার আগে মানুষ তার ভাবনা প্রকাশ করতে সুরের সাহায্যে, অনুদাত্ততা ও তীক্ষ্ণতার বিভিন্ন মাত্রা অনুযায়ী সেই সুরের তারতম্য ঘটত।'

স্পষ্টোচ্চারিত ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জনের আগে, মানুষের পূর্বজদের পুরুষ অথবা নারী অথবা উভয় লিঙ্গের সদস্যরাই পরস্পরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করত সাঙ্গীতিক সুর ও তালের সাহায্যে। সঙ্গমের মরশুমে বিভিন্ন প্রজাতির বানররা তাদের কণ্ঠস্বরকে কীভাবে ব্যবহার করে সে সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায়নি বলে এটাও বোঝার কোনও উপায় নেই যে গান গাওয়ার অভ্যাসটা প্রথম কারা অর্জন করেছিল—আমাদের পুরুষ-পূর্বজরা নাকি নারী-পূর্বজরা। নারীদের কণ্ঠস্বর সাধারণত পুরুষদের থেকে শ্রুতিমধুর হয়। এই তথ্যটুকুর ভিত্তিতে অনুমান করা যেতেও পারে যে বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের আকৃষ্ট করার জন্য গান গাওয়ার ক্ষমতাটা তারাই প্রথম অর্জন করেছিল।[৪১] কিন্তু তা-ও যদি হয়ে থাকে, তাহলেও তা ঘটেছিল বহুকাল আগে—আমাদের পূর্বপুরুষরা যথেষ্ট পরিমাণে মানুষ হয়ে উঠে নিজেদের নারীদেরকে নিছকই উপযোগী দাসী হিসেবে ভাবতে এবং সেইমতো আচরণ করতে শেখার আগেই। কোনও আবেগদীপ্ত বক্তা, চারণকবি বা সঙ্গীতজ্ঞ যখন স্বরের তারতম্য ও উত্থান-পতনের সাহায্যে শ্রোতাদের মধ্যে তীব্র আবেগ সঞ্চারিত করে দেন, তখন তিনি যে আসলে ঠিক সেই উপকরণগুলোকেই ব্যবহার করেন যে-উপকরণগুলোর সাহায্যে বহুকাল আগে তাঁর অর্ধ-মানব পূর্বজরা প্রেমনিবেদন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় পরস্পরের তীব্র আবেগকে জাগিয়ে তুলত—তাতে কোনও সন্দেহই নেই।

মানুষের বিবাহের ব্যাপারে সৌন্দর্যের ভূমিকা

সভ্য দুনিয়ায় পুরুষরা তাদের স্ত্রী-নির্বাচনের ব্যাপারে সর্বাংশে না হলেও বহুলাংশেই প্রভাবিত হয় বাহ্যিক রূপের দ্বারা। তবে আমরা মূলত প্রাচীন কালের অবস্থাটাই জানতে চাইছি। প্রাচীনকালে এই ব্যাপারটা ঠিক কেমন ছিল তা বোঝার একমাত্র উপায় হল আজকের দিনের অর্ধ-সভ্য ও বন্য দশায় থাকা জাতিগুলোর অভ্যাস-আচরণ পর্যালোচনা করা। যদি দেখা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির পুরুষরা ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নারীদের পছন্দ করে অথবা ভিন্ন ভিন্ন জাতির নারীরা পছন্দ করে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পুরুষদের, তাহলে একটা বিশেষ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের। প্রশ্নটা হল—বহু প্রজন্ম ধরে এই ধরনের পছন্দমাফিক সঙ্গী-সঙ্গিনী বাছাইয়ের ব্যাপারটা কোনও নির্দিষ্ট জাতির (সেই জাতির মধ্যে বিদ্যমান উত্তরাধিকারের নিয়ম অনুযায়ী) পুরুষ বা নারী অথবা উভয় লিঙ্গেরই সদস্যদের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভাব ফেলে কিনা।

৪১। এ বিষয়ে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন হ্যাকেল, 'Generelle Morph', খণ্ড ২, ১৮৬৬, পৃঃ ২৪৬।

বন্য দশার মানুষরা সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেয় নিজেদের শারীরিক সৌন্দর্যের ওপর।[৪২] অলংকার তাদের অত্যন্ত প্রিয় জিনিস। জনৈক ইংরেজ দার্শনিক তো এমন কথাও বলেছেন যে পোশাক প্রথমে তৈরি হয়েছিল অলংকার হিসেবেই, উষ্ণতার আচ্ছাদন হিসেবে নয়। অধ্যাপক ওয়েৎজ্ বলেছেন, 'মানুষ যতই দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত হোক না কেন, নিজেকে সাজাতে প্রত্যেকেই ভালবাসে।' নিজেদের শরীর চিত্রিত করতে দক্ষিণ আমেরিকার উলঙ্গ ইন্ডিয়ানরা এত অত্যধিক ভালবাসে যে 'লম্বা-চওড়া চেহারার একজন পুরুষ নিজেকে লাল রঙে চিত্রিত করার জন্য প্রয়োজনীয় চিকা (chica) সংগ্রহ করার স্বার্থে পুরো পনেরো দিন হাড়ভাঙা মেহনত করেছিল।'[৪৩] বল্গা-হরিণ যুগে (Reindeer period) ইউরোপের প্রাচীন বর্বর দশার মানুষরা যে-কোনও উজ্জ্বল বা বিচিত্র জিনিস দেখতে পেলেই নিজেদের গুহায় নিয়ে আসত। আজকের দিনের সারা পৃথিবীর সব জায়গার বন্য দশার মানুষরা পাখির পালক, হার, বাহুর বালা, কানের দুল ইত্যাদির সাহায্যে সাজানোর চেষ্টা করে নিজেদের। নানান বিচিত্র শৈলীতে, নিজেদের শরীরকে রঙ দিয়ে চিত্রিত করে তারা। হাম্বোল্ড বলেছেন, 'পোশাক-পরিহিত জাতির মানুষদের যতটা গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, ততটা গুরুত্ব দিয়ে শরীরচিত্রণকারী জাতির মানুষদের পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যেত যে সবথেকে উর্বর কল্পনা এবং সতত পরিবর্তনশীল খেয়াল থেকেই সৃষ্টি হয়েছে শরীর-চিত্রণের এবং পোশাক-পরিচ্ছদের ধরন।'

আফ্রিকার একটা অংশের মানুষরা চোখের পাতায় কালো রঙ লাগায়। আফ্রিকারই অন্য এক অংশের মানুষরা নখে হলুদ বা বেগনি-লাল রঙ লাগায়। অনেক জায়গার মানুষরা নানারকম রঙ লাগায় মাথার চুলে। অনেক দেশের মানুষরা দাঁতে লাগায় কালো, লাল, নীল ইত্যাদি রঙ। মালয় দ্বীপপুঞ্জে 'কুকুরের মতো' সাদা দাঁত থাকাটাকে

৪২। পৃথিবীর সব জায়গার বন্যা দশার মানুষরা কীভাবে নিজেদের শরীর চিত্রিত করে এবং অলংকার দিয়ে সাজায়, তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন ইতালীয় পর্যটক অধ্যাপক মান্তেগাজা, 'Rio de la Plata, Viaggie Studie' ১৮৬৭, পৃঃ ৫২৪-৫৪৫ ; আলাদাভাবে উল্লেখ করা না-থাকলে পরবর্তী যাবতীয় বিবৃতি তাঁর রচনা থেকে গৃহীত বলেই ধরে নিতে হবে। এছাড়াও দ্রষ্টব্য, ওয়েৎজ, 'ইনট্রোডাকশন টু অ্যান্থ্রোপলজি', ইংরেজি অনুবাদ, খণ্ড ১, ১৮৬৩, পৃঃ ২৭৫। ১৮২২ সালে প্রকাশিত 'লেকচারস অন ফিজিওলজি' রচনায় লরেন্স-ও এ ব্যাপারে প্রচুর তথ্য উপস্থাপিত করেছেন। এই পরিচ্ছেদটি লিখিত হওয়ার পর প্রকাশিত হয়েছে স্যর জে. লুবক-এর গ্রন্থ 'অরিজিন অফ সিভিলাইজেশন', ১৮৭০। ওই গ্রন্থে বর্তমান বিষয়টি সম্বন্ধে একটি আলাদা পরিচ্ছেদ আছে। বন্য দশার মানুষরা কীভাবে তাদের দাঁত আর চুলে রং করে এবং দাঁতে ছিদ্র করে, সে ব্যাপারে কিছু তথ্য ওই পরিচ্ছেদটি থেকে গ্রহণ করেছি আমি (পৃঃ ৪২, ৪৮)।

৪৩। হাম্বোল্ড, 'পার্সোন্যাল ন্যারেটিভ', ইংরেজি অনুবাদ, খণ্ড ৪, পৃঃ ৫১৫ ; শরীর-চিত্রণে ফুটে ওঠা কল্পনা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৫২২ ; পায়ের ডিমের আকার পরিবর্তন করা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৪৬৬।

রীতিমতো লজ্জাজনক বলে মনে করা হয়। উত্তরের মেরু অঞ্চল থেকে শুরু করে দক্ষিণের নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত এলাকায় এমন একটা দেশেরও নাম করা যাবে না যেখানকার আদিবাসীরা গায়ে উল্‌কি আঁকে না। প্রাচীন আমলের ইহুদি এবং ব্রিটনদের মধ্যেও গায়ে উল্‌কি আঁকার চল ছিল। আফ্রিকার কোনও কোনও জায়গার বাসিন্দারা নিজেদের গায়ে উল্‌কি আঁকে ঠিকই, তবে ওই মহাদেশের চালু রীতি হল শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত সৃষ্টি করে তাতে নুন ঘষে সেখানটা ফুলিয়ে তোলা। কর্ডোফান আর ডারফার-এর বাসিন্দারা এই ব্যাপারটাকে 'দারুণ আকর্ষণীয়' বলে মনে করে। গালে 'কিংবা কপালে গভীর ক্ষতচিহ্ন'[৪৪] সৃষ্টি না-করা পর্যন্ত সৌন্দর্য নিখুঁত হয়ে ওঠে না বলে মনে করে আরব দেশগুলোর অধিবাসীরা। হাম্‌বোল্ড বলেছেন, দক্ষিণ আমেরিকায় 'কোনও মা যদি কৃত্রিম উপায়ে তার সন্তানদের পায়ের ডিমকে দেশের রীতি অনুযায়ী সাজিয়ে না দেয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে দণ্ডযোগ্য ঔদাসীন্যের অভিযোগ ওঠে।' পুরনো এবং নতুন দুনিয়ায় (অর্থাৎ পূর্ব গোলার্ধে এবং পশ্চিম গোলার্ধে) একসময় চালু রীতি ছিল শিশুদের মাথার আকারকে রীতিমতো অস্বাভাবিক ধাঁচে পালটে দেওয়া (এখনও অনেক জায়গায় এ-রীতি চালু আছে) এবং এই ধরনের বিকৃতিকে শরীরের অঙ্গসজ্জা বলেই মনে করা হত। যেমন, অত্যধিক চ্যাপটা বা চ্যাটালো মাথাকে 'সৌন্দর্যের অঙ্গ' বলে মনে করে কলম্বিয়ার বন্য দশার মানুষরা।[৪৫]

বিভিন্ন দেশের মানুষরা মাথার চুলের ব্যাপারে রীতিমতো যত্নবান হয়ে থাকে। কোথাও চুলকে বিনা বাধায় বড় হতে দেওয়া হয় যাতে একসময় তা মাটিকে ছুঁতে পারে। কোথাও আবার চুল আঁচড়ানো হয় এমনভাবে 'যাতে তা ঘন আর কোঁকড়ানো হয়ে ওঠে, পাপুয়ানদের কাছে যা রীতিমতো গর্ব ও অহংকারের বস্তু।'[৪৬] আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলের 'মানুষদের কেশবিন্যাস যথাযথ করে তোলার জন্য আট থেকে দশ বছর সময় লাগে।' অনেক জায়গার মানুষরা তাদের মাথা কামিয়ে ন্যাড়া হয়ে যায়। দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার কোনও কোনও অঞ্চলের বাসিন্দারা তো তাদের ভুরু আর অক্ষিপক্ষ্ম (eyelash) পর্যন্ত কামিয়ে ফেলে। নীলনদের উজানি অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের সামনের চারটে দাঁত ফেলে দেয়, কারণ হিসেবে বলে—জন্তুদের সঙ্গে নিজেদের কোনও সাদৃশ্য থাকুক, তা আমরা চাই না। আরও দক্ষিণের দিকের

৪৪। 'দ্য নাইল ট্রিবিউটারিস', ১৮৬৭ ; 'দ্য অ্যালবার্ট নায়ান্‌জা', ১৮৬৬, খণ্ড ১, পৃঃ ২১৮।

৪৫। প্রিচার্ড কর্তৃক উদ্ধৃত, 'ফিজিক্যাল হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইন্ড', চতুর্থ সংস্করণ, খণ্ড ১, ১৮৫১, পৃঃ ৩২১।

৪৬। পাপুয়ানদের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য—ওয়ালেস, 'দ্য মালয় আর্কিপেল্যাগো', খণ্ড ২, পৃঃ ৪৪৫। আফ্রিকার মানুষদের কেশবিন্যাসের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য—স্যার এস. বেকার, 'দ্য অ্যালবার্ট নায়ান্‌জা', খণ্ড ১, পৃঃ ২১০।

বাসিন্দা বাটোকা-রা শুধু তাদের ওপরের পাটির দু'টো ছেদক-দন্ত ফেলে দেয়। লিভিংস্টোনের[৪৭] মতে, এতে করে তাদের নীচের চোয়ালটা সামনের দিকে বেশি এগিয়ে আসে এবং তার ফলে মুখটা ভয়ংকর দেখায়। ছেদক-দন্ত থাকাটাকে এইসব লোকেরা অত্যন্ত কুৎসিত ব্যাপার বলে মনে করে। কয়েকজন ইউরোপীয়কে দেখে এরা চিৎকার করে বলে উঠেছিল, 'দ্যাখো দ্যাখো, ওদের মুখে কী-সব পেল্লাই-পেল্লাই দাঁত!' সেবিতুয়ানি নামে এদের জনৈক মোড়ল এই দাঁত তুলে ফেলার ব্যাপারটা বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে লাভ কিছু হয়নি। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা নিজেদের ছেদক-দন্তগুলোকে ঘষে ঘষে করাতের মতো খাঁজকাটা করে তোলে অথবা তাতে ফুটো করে তার মধ্যে পিন বা কাঠিজাতীয় কিছু গলিয়ে রাখে।

আমরা যেমন মুখকেই সৌন্দর্যের প্রধান ক্ষেত্র বলে মনে করি, বন্য দশার মানুষরা তেমনি মুখকেই কাটাছেঁড়া করার সবথেকে উপযুক্ত জায়গা বলে মনে করে। পৃথিবীর সব দেশেই নাকের দুই ছিদ্রের মাঝের পর্দায় এবং কোথাও কোথাও নাকের পাটায় ফুটো করার রীতি চালু আছে। এইসব ছিদ্রে দুল জাতীয় বস্তু, কাঠি, পালক এবং অন্যান্য অলংকার গলিয়ে রাখা হয়। কান বেঁধানোর প্রথাও সর্বত্রই চালু আছে এবং কানের ছিদ্রেও নানারকম অলংকার পরা হয়। দক্ষিণ আমেরিকার বোটোকুডো ও লেঙ্গুয়া-দের কানের এই ফুটোগুলো আস্তে আস্তে এত বড় হয়ে ওঠে যে এক সময় কানের নীচের দিকটা কাঁধকে স্পর্শ করে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার এবং আফ্রিকার অধিবাসীরা ওপরের কিংবা নীচের ঠোঁটে ফুটো করে। বোটোকুডোদের নীচের ঠোঁটের এই ছিদ্র এতই বড় হয় যে চার ইঞ্চি ব্যাসের একটা কাঠের চাকতিকে তার মধ্যে অনায়াসেই গলিয়ে রাখে তারা। নিজের 'টেম্‌বেটা' অর্থাৎ ঠোঁটের ছিদ্রে পরার রঙ-করা বৃহদাকার কাঠের টুকরোটা বিক্রি করে দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার জনৈক অধিবাসী কতটা লজ্জিত হয়েছিল এবং সবার কাছে সে কতটা হাস্যাস্পদ হয়ে গিয়েছিল, তার চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায় মান্তেগাজার রচনায়। মধ্য আফ্রিকার মেয়েরা নীচের ঠোঁটে ফুটো করে তাতে স্ফটিকের মতো এক ধরনের অলংকার পরে। জিভ নড়াচড়া করলেই অলংকারটা 'দুলতে থাকে আর কথা বলার সময় দুলুনিটা অত্যন্ত হাস্যকর চেহারা নেয়।' লাটুকা-র মোড়লের স্ত্রী স্যর এস. বেকারকে বলেছিল[৪৮] যে শ্রীমতী বেকার 'যদি তাঁর নীচের পাটির সামনের চারটে দাঁত তুলে ফেলেন আর নীচের ঠোঁটে লম্বা ছুঁচোলো রঙ-করা স্ফটিক পরেন, তাহলে তাঁকে অনেক সুন্দর দেখাবে।' আরও দক্ষিণের বাসিন্দা মাকালোলো-রা তাদের ওপরের

৪৭। 'ট্র্যাভ্‌ল্‌স্', পৃঃ ৫৩৩।

৪৮। 'দ্য অ্যালবার্ট নারান্‌জা', ১৮৬৬, খণ্ড ১, পৃঃ ২১৭।

ঠোঁটে ফুটো করে সেই ফুটোয় ধাতু আর বাঁশ দিয়ে তৈরি বড় মাপের একটা দুল গলিয়ে দেয়, যার স্থানীয় নাম পেলেলে। 'এর ফলে এদের একজন স্ত্রীলোকের ওপরের ঠোঁটটা নাকের ডগার থেকে দু ইঞ্চি সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। স্ত্রীলোকটি যখন হাসত তখন পেশীর সংকোচনের দরুন ঠোঁটটা চোখের ওপরে উঠে যেত। তাদের প্রবীণ মোড়ল চিন্‌সুর্দি-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "আচ্ছা, তোমাদের মেয়েরা এই ধরনের জিনিস পরে কেন?" এ-রকম নির্বোধ প্রশ্ন শুনে রীতিমতো অবাক হয়ে চিন্‌সুর্দি উত্তর দিয়েছিল, "কেন আবার, সৌন্দর্যের জন্যে। ওগুলোই তো মেয়েদের একমাত্র সুন্দর জিনিস। পুরুষদের দাড়ি থাকে, মেয়েদের তো কিছুই থাকে না। তো এই অবস্থায় পেলেলে না পরলে ওদেরকে কেমন দেখাবে বলুন তো? পুরুষদের মতন মুখ অথচ দাড়ি নেই—এ-রকম দেখতে হলে ওদেরকে তো আর মেয়েই বলা যাবে না!"[৪৯]

শরীরের যে-সব অংশকে কৃত্রিমভাবে সাজানো যায়, সে-রকম কোনও অংশকেই বাদ দেওয়া হয় না। এর জন্যে কষ্ট সইতে হয় খুবই, কারণ এর মধ্যে বেশ কয়েকটা সাজানোর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে কয়েক বছর সময়ও লেগে যায়, যা থেকে বোঝা যায় এগুলোকে তারা কতটা প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। এইসব কাজের উদ্দেশ্য বহুমুখী। যুদ্ধের সময় নিজেদের ভয়ংকর দেখানোর জন্য শরীর চিত্রিত করে পুরুষরা। কয়েক ধরনের অঙ্গচ্ছেদন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, অথবা তা দিয়ে বয়ঃপ্রাপ্তিকে চিহ্নিত করা কিংবা মানুষটির পদমর্যাদা বোঝানো হয় অথবা এগুলো বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেকার সম্পর্ককে সূচিত করে। বন্য দশার মানুষদের মধ্যে শরীর সাজানোর একই রীতি সুদীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকে, ফলে[৫০] কোনও অঙ্গচ্ছেদন প্রথমে যে-উদ্দেশ্যেই চালু হয়ে থাকুক না কেন, কিছুদিনের মধ্যেই তা স্বাতন্ত্র্যসূচক চিহ্নের মর্যাদা লাভ করে। তবে নিজেকে সুন্দর করে তোলা, প্রসাধন, এবং অন্যদের মুগ্ধ প্রশংসা অর্জন করা—এগুলোই সবথেকে সাধারণ উদ্দেশ্য হিসেবে কাজ করে থাকে। শরীরে উল্‌কি আঁকার ব্যাপারে নিউজিল্যান্ডের মিশনারিদের কাছ থেকে একটি ঘটনার কথা শুনেছিলাম আমি। এই মিশনারিরা যখন কয়েকটি মেয়েকে উল্‌কি আঁকার অভ্যাস পরিত্যাগ করার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, তখন

৪৯। লিভিংস্টোন, 'ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন', ১৮৬০ ; 'অ্যাথেনিয়াম', ৭ জুলাই ১৮৬০, পৃঃ ২৯-এ প্রদত্ত প্রতিবেদন।

৫০। মধ্য আফ্রিকার আদিবাসীদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্যর এস. বেকার (পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, খণ্ড ১, পৃঃ ১১০) বলেছেন, 'প্রতিটি গোষ্ঠীরই কেশসজ্জার একান্ত নিজস্ব ও অপরিবর্তিত রীতি থাকে।' আমাজন অঞ্চলের ইন্ডিয়ানরা শরীরে উল্‌কি আঁকে এবং তার রীতিরও কোনও পরিবর্তন হয় না। এ ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, আগাসি, 'জার্নি ইন ব্রাজিল', ১৮৬৮, পৃঃ ৩১৮।

তারা উত্তর দিয়েছিল, 'অন্তত ঠোঁটে কয়েকটা রেখা এঁকে নিতেই হবে, নইলে বয়েসকালে খুব কুৎসিত দেখাবে আমাদের।' নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীদের ব্যাপারে রীতিমতো ওয়াকিবহাল জনৈক গ্রন্থকার[৫১] বলেছেন, 'মুখে চমৎকার উল্‌কি আঁকার আকাঙ্ক্ষা সব যুবকরাই পোষণ করে। এর উদ্দেশ্য হল দুটো : মেয়েদের কাছে নিজেদের আকর্ষণীয় করে তোলা আর যুদ্ধের সময় দৃষ্টি-আকর্ষক হয়ে ওঠা।' আফ্রিকার একটা অংশের মেয়েরা কপালে আর থুতনিতে একটা দাগের উল্‌কি আঁকাকে দারুণ আকর্ষণীয় ব্যাপার বলে মনে করে।[৫২] পৃথিবীর সব জায়গায় না হলেও অধিকাংশ জায়গাতেই নারীদের তুলনায় পুরুষরাই বেশি অঙ্গসজ্জা করে এবং প্রায়শই তাদের অঙ্গসজ্জার ধরনও নারীদের থেকে আলাদা হয়। কোথাও কোথাও নারীরা তো অঙ্গসজ্জা করে না বললেই চলে। বন্যদের মধ্যে নারীদেরই বেশির ভাগ কাজ করতে হয় এবং সবথেকে ভাল খাবারগুলো খেতে দেওয়া হয় না তাদের। পুরুষদের চরিত্রগত স্বার্থপরতাই এর কারণ এবং এই একই কারণে পুরুষরা তাদেরকে সবথেকে ভাল অলংকারগুলো পেতে দেয় না অথবা ব্যবহার করতে দেয় না। শেষত, উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে বোঝা যায় যে মাথার আকারের পরিবর্তন ঘটানো, কেশসজ্জা, শরীর-চিত্রণ, উল্‌কি আঁকা, নাক, ঠোঁট বা কানে ছিদ্র করা, দাঁত তুলে ফেলা বা ঘষে সমান করা ইত্যাদির একই শৈলী পৃথিবীর সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক অঞ্চলে বহু দিন আগে থেকেই চালু ছিল এবং এখনও চালু আছে। এত পৃথক পৃথক জাতির দ্বারা অনুসৃত এইসব রীতিগুলো কোনও সাধারণ উৎস থেকে সৃষ্টি হয়ে ঐতিহ্য মারফত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে—এমনটা ঘটা একেবারেই অসম্ভব। বরং এ থেকে বোঝা যায় মানুষ যে-জাতিরই সদস্য হোক না কেন তাদের মন বা চিন্তার মধ্যে একটা সাদৃশ্য থাকেই, ঠিক যেমনটা দেখা যায় নাচা, মুখোশ পরে অভিনয় করা এবং অপটু হাতে ছবি আঁকার প্রায় বিশ্বজনীন অভ্যাসের মধ্যেও।

বন্য দশার মানুষরা বিভিন্ন ধরনের অঙ্গসজ্জাকে কতটা মূল্য দেয় এবং আমাদের চোখে যা রীতিমতো দৃষ্টিকটু তাকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, তা আমরা এতক্ষণ ধরে দেখলাম। এবার আমরা দেখার চেষ্টা করব তাদের নারীদের বাহ্যিক চেহারায় এইসব পুরুষরা কতখানি আকৃষ্ট হয় এবং সৌন্দর্য তাদের ধারণাটাই বা কী। অনেকে মনে করেন বন্য দশার পুরুষরা তাদের নারীদের সৌন্দর্যের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন, নারীদেরকে স্রেফ নিজেদের ক্রীতদাসী ছাড়া আর কিছুই ভাবে না তারা। বিভিন্ন অলংকারে বা প্রসাধনে নিজেদের সাজিয়ে তোলার জন্য এইসব নারীরা যে বিপুল যত্ন নেয়, তার সঙ্গে কিন্তু উপরোক্ত ধারণাটি একেবারেই খাপ খায়

৫১। রেভারেন্ড আর. টেলর, 'নিউজিল্যান্ড অ্যান্ড ইট্‌স্ ইনহ্যাবিট্যান্টস', ১৮৫৫, পৃঃ ১৫২।

৫২। মান্তেগাজা, 'Viaggi e Studi', পৃঃ ৫৪২।

না। জনৈকা বুশম্যান নারীর কথা লিখেছেন বুর্শেল।[৫৩] সেই নারীটি যে-পরিমাণ চর্বি, লাল মাটি আর ঔজ্জ্বল্য-বৃদ্ধিকারী পাউডার ব্যবহার করত, তাতে 'অতি ধনী কোনও স্বামীও ফতুর হয়ে যেতে পারে।' মিঃ উইনউড রিড আমাকে জানিয়েছেন যে পশ্চিম উপকূলের নিগ্রোরা প্রায়শই তাদের নারীদের রূপসৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করে। শিশুহত্যার যে-ভয়ংকর রীতিটা প্রায় সর্বত্র চালু আছে, তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে কয়েকজন সুযোগ্য পর্যবেক্ষক বলেছেন যে নিজেদের সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য নারীদের আকাঙ্ক্ষাটা এর অন্তত আংশিক কারণ বটেই।[৫৪] কোনও কোনও অঞ্চলের নারীরা পুরুষদের ভালবাসা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম তাবিজকবচ ও প্রণয়োদ্দীপক পানীয় (জলপড়া জাতীয়) ব্যবহার করে থাকে। উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার নারীরা এই উদ্দেশ্যে যে চার ধরনের গাছ-গাছড়া ব্যবহার করে, সেগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন মিঃ ব্রাউন।[৫৫]

সুদক্ষ পর্যবেক্ষক হার্লে[৫৬] বহু বছর আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে বসবাস করেছেন। ইন্ডিয়ানদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় সৌন্দর্য কাকে বলে, তাহলে তারা উত্তর দেবে—'চ্যাটালো মুখ, ছোট চোখ, উঁচু হনু, নিচু কপাল, বড় আর চওড়া থুতনি, চ্যাপটা বাঁকা নাক, তামাটে চামড়া আর কটিবন্ধ পর্যন্ত লম্বিত স্তন।' প্যালাস, যিনি চীন সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চল পরিদর্শন করেছিলেন, বলেছেন, 'মান্দ্‌সচু ধাঁচের নারীদেরই এরা বেশি পছন্দ করে। অর্থাৎ যে-সব নারীদের চওড়া মুখ, উঁচু হনু, অতিরিক্তরকম চওড়া নাক আর বড় বড় চোখ থাকে, তাদেরই।'[৫৭] ফখ্‌ৎ বলেছেন যে তির্যক চোখ হচ্ছে চীনা ও জাপানিদের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং ছবি আঁকার সময় সেই তির্যকতাকে অনেক বাড়িয়ে দেখানো হয় 'যাতে করে লালচুলো বর্বরদের চোখের থেকে তা অনেক সুন্দর দেখায় এবং তাদের সৌন্দর্যটা মূর্ত হয়ে ওঠে'। এটা সুবিদিত এবং হুক্‌-ও বারবার বলেছেন যে ইউরোপীয়দের সাদা চামড়া আর খাড়া নাকের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলের চীনারা তাদের কুৎসিত বলে মনে করে। সিংহলবাসীদের নাক কিন্তু আমাদের ধারণা অনুযায়ী মোটেই খাড়া নয়। তথাপি "সপ্তম শতাব্দীর

৫৩। 'ট্র্যাভ্‌ল্‌স্‌ ইন সাউথ আফ্রিকা', ১৮২৪, খণ্ড ১, পৃঃ ৪১৪।

৫৪। এর দৃষ্টান্তের জন্য দ্রষ্টব্য—গার্ল্যান্ড, 'Ueber das Aussterben der Natur. volker', ১৮৬৮, পৃঃ ৫১, ৫৩, ৫৫ ; এছাড়াও দ্রষ্টব্য—আজারা, 'ভয়েজেস', খণ্ড ২ পৃঃ ১১৬।

৫৫। উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের দ্বারা ব্যবহৃত ভেষজ দ্রব্য প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, 'ফার্মাসিউটিক্যাল জার্নাল', খণ্ড ১০।

৫৬। 'আ জার্নি ফ্রম প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌ ফোর্ট', ৮ম সংস্করণ, ১৭৯৬, পৃঃ ৮৯।

৫৭। প্রিচার্ড 'ফিজিক্যাল হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইন্ড', ৩য় সংস্করণ, খণ্ড ৪, ১৮৪৪, পৃঃ ৫১৯-এ উদ্ধৃত ; ফখ্‌ৎ, 'লেকচারস অন ম্যান', ইংরেজি অনুবাদ, পৃঃ ১২৯। সিংহলবাসীদের সম্পর্কে চীনাদের অভিমত প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, ই. টেনেন্ট, 'সিলোন', ১৮৫৯, খণ্ড ২, পৃঃ ১০৭।

চীনারা, যারা মঙ্গোল জাতিসুলভ খাঁদা নাক দেখতেই অভ্যস্ত ছিল, তারা সিংহলীদের খাড়া নাক দেখে রীতিমতো বিস্মিত হয়েছিল। থ্সাং তাদের সম্বন্ধে বলেছেন যে তাদের 'মানুষের মতো শরীরে একটা করে পাখির ঠোঁট থাকে'।"

কোচিন চীনাদের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়ার পর ফিন্লেসন বলেছেন যে গোলাকার মাথা আর মুখই হচ্ছে তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অতঃপর তিনি বলেছেন, 'পুরো মুখমণ্ডলের গোলাকার ভাবটা নারীদের মধ্যেই অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং যে-নারীর মুখমণ্ডল যত বেশি গোলাকার তাকে তত বেশি সুন্দরী বলে মনে করা হয়।' শ্যামদেশের বাসিন্দাদের বৈশিষ্ট্য হল ছোট নাক, ছড়ানো নাসারন্ধ্র, বিস্তৃত মুখ, বেশ পুরু ঠোঁট, রীতিমতো বড় মুখমণ্ডল এবং অত্যন্ত উঁচু ও চওড়া হনু। তাই এটা আদৌ বিস্ময়কর নয় যে 'আমরা যাকে সৌন্দর্য বলে মনে করি তা তাদের কাছে রীতিমতো অপরিচিত ব্যাপার। তথাপি তারা তাদের নারীদেরকে অন্যদের থেকে অনেক বেশি সুন্দরী বলে মনে করে।'[৫৮]

হটেন্টট নারীদের নিতম্ব চমৎকারভাবে কিছুটা উঁচু হয়ে থাকে। পরিভাষায় এদেরকে স্টিঅ্যাটোপাইগাস বলা হয়। স্যর অ্যান্ড্রু স্মিথ জোর দিয়ে বলেছেন যে নারীদের এই বৈশিষ্ট্যটা হটেন্টট পুরুষদের খুবই প্রিয়।[৫৯] একবার তিনি জনৈকা হটেন্টট নারীকে দেখেছিলেন যাকে সকলে সুন্দরী বলে মনে করত। তার নিতম্বটি এত বিশাল ছিল যে মাটিতে বসলে সে আর উঠতে পারত না, উঠে দাঁড়ানোর জন্যে তাকে ঘষে ঘষে এগিয়ে যেতে হত কোনও ঢালু জায়গার দিকে। নিগ্রোদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেও এই ধরনের উঁচু নিতম্ববিশিষ্ট কিছু নারীর দেখা পাওয়া যায়। বার্টন-এর মতে, সোমাল পুরুষরা 'তাদের স্ত্রী নির্বাচন করার সময় নারীদের সারি দিয়ে দাঁড় করায়, তারপর যার নিতম্ব সবথেকে উঁচু তাকেই বেছে নেয়। কোনও নারীর শরীরে এর বিপরীত বৈশিষ্ট্য দেখা গেলে তাকে রীতিমতো ঘৃণিত বলে মনে করে নিগ্রোরা।'[৬০]

গায়ের রঙের ব্যাপারে বলা যায়—মাঙ্গো পার্কের চামড়ার সাদা রঙ আর খাড়া নাক দেখে নিগ্রোরা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করেছিল, কারণ এই দু'টো ব্যাপারকেই তারা 'দৃষ্টিকটু ও অস্বাভাবিক' বলে মনে করত। উত্তরে তিনি তাদের চিকন-কালো

৫৮। ক্রফোর্ড এবং ফিন্লেসন-এর রচনা থেকে প্রিচার্ড কর্তৃক উদ্ধৃত, 'ফিজিক্যাল হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইন্ড, খণ্ড ৪, পৃঃ ৫৩৪, ৫৩৫।

৫৯। Idem illustrissmus viator dixit mihi praecinctorium vel tabulam foeminae, quod nobis teterrimum est, quondam permagno aestimari ab hominibus in hac gente. Nunc res mutata est, et censent talem conformationem minime oaptndam esse.

৬০। 'দ্য অ্যান্থ্রোপলজিক্যাল রিভিউ', নভেম্বর, ১৮৬৪, পৃঃ ২৩৭। আরও তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, ওয়েৎজ, 'ইনট্রোডাকশন টু অ্যান্থ্রোপলজি', ইংরেজি অনুবাদ, ১৮৬৩, খণ্ড ১, পৃঃ ১০৫।

ত্বকের আর নাকের চমৎকার খাঁজের প্রশংসা করেন। শুনে নিগ্রোরা বলে, 'এ-সব হল মন-রাখা কথা।' তবে তা সত্ত্বেও মাঙ্গো পার্ককে খেতে দিয়েছিল তারা। তাঁর চামড়ার সাদা রঙ দেখে আফ্রিকার মুর জাতির লোকেরাও 'ভুরু কোঁচকাত এবং আতঙ্কে কেঁপে উঠত।' আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের নিগ্রো বালকরা মিঃ বার্টনকে দেখে চিৎকার করে বলে উঠেছিল, 'দ্যাখ্ দ্যাখ্, ওই সাদা মানুষটাকে দ্যাখ্! ওকে দেখতে অনেকটা সাদা বনমানুষের মতন, না রে?' মিঃ উইনউড রিড আমাকে জানিয়েছেন যে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের নিগ্রোরা হাল্কা কালো রঙের চামড়ার থেকে কুচকুচে কালো রঙের চামড়াই বেশি পছন্দ করে। তবে সাদা রঙের ব্যাপারে তাদের আতঙ্ক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই পর্যটকই জানিয়েছেন—একদিকে এর কারণ হল অধিকাংশ নিগ্রোরই ধারণা দৈত্য আর ভূতেদের গায়ের রঙ সাদা হয়, অন্যদিকে সাদা রঙকে তারা শারীরিক দুর্বলতার লক্ষণ বলে মনে করে।

আফ্রিকার সুদূর দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসী বানইয়াই-রাও নিগ্রোই, তবে 'এদের অনেকেরই গায়ের রঙ হালকা দুধে-কফি রঙের হয় এবং বস্তুতপক্ষে এই গাত্রবর্ণটিকে দেশের সর্বত্রই অত্যন্ত সুন্দর বলে মনে করা হয়।' অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা ভিন্ন ধরনের রুচিবোধের পরিচয় পাচ্ছি। নিগ্রোদের সঙ্গে কাফিরদের প্রচুর পার্থক্য আছে। এই কাফিরদের 'একমাত্র দেলাগোয়া উপসাগর অঞ্চলে বসবাসকারী গোষ্ঠীগুলো বাদে অন্য গোষ্ঠীগুলোর সদস্যদের গায়ের রঙ ঠিক কালো হয় না, বরং কালো আর লালের একটা মিশ্রণ দেখা যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রঙটা দাঁড়ায় চকোলেট বা গাঢ় পিঙ্গল রঙে। গাঢ় রঙের গাত্রবর্ণই বেশি দেখা যায় বলে এই রঙটিকেই সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেয় এরা। কারও গায়ের রঙ হালকা কিংবা সাদা চামড়ার মানুষদের মতো বললে সেটাকে আদৌ প্রশংসা বলে মনে করে না কাফিররা। জনৈক হতভাগ্য কাফিরের কথা আমি শুনেছি যার গায়ের রঙ সাদাটে ধরনের ছিল বলে কোনও মেয়েই তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি।' জুলু রাজাদের অন্যতম উপাধি হল 'যে-তুমি কালো'।[৬১] দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দাদের সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করার সময় মিঃ গ্যাল্টন বলেছিলেন যে সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাদের ধারণা আমাদের থেকে অনেকটাই আলাদা। যেমন, এদের একটি গোষ্ঠীর দু'জন ছিপছিপে, কৃশকায় ও সুদর্শনা মেয়েকে গোষ্ঠীর কেউই পছন্দ করত না।

এবার পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। মাদাম ফাইফার

৬১। মাঙ্গো পার্ক-এর 'ট্র্যাভ্‌ল্‌স ইন আফ্রিকা', চতুর্থ সংস্করণ, ১৮১৬, পৃঃ ৫৩, ১৩১। বার্টন-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন শ্যাফহউসেন, 'Archiv fur Anthropology', ১৮৬৬, পৃঃ ১৬৩। বানইয়াই-দের প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, লিভিংস্টোন, 'ট্র্যাভ্‌ল্‌স্', পৃঃ ৬৪। কাফিরদের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, রেভারেন্ড জে. শুটার. 'দ্য কাফিরস অফ নাটাল অ্যান্ড দ্য জুলু কান্ট্রি', ১৮৫৭, পৃঃ ১।

বলেছেন—জাভার বাসিন্দারা সেই মেয়েকেই সুন্দরী বলে মনে করে যার গায়ের রঙ সাদা নয়, হলুদ। কোচিন চীনের জনৈক বাসিন্দা 'সেখানকার ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের স্ত্রীর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রীতিমতো ঘৃণার সুরে বলেছিল—ওঁর মুখে কুকুরের মতো সাদা-সাদা দাঁত আছে আর গায়ের রঙটা ঠিক যেন আলু-ফুলের মতন রাঙা।' আমরা আগেই দেখেছি যে আমাদের গায়ের সাদা চামড়াকে চীনারা মোটেই পছন্দ করে না আর উত্তর আমেরিকার বাসিন্দারা পছন্দ করে 'তামাটে চামড়া'। দক্ষিণ আমেরিকার বাসিন্দা ইউরাকা-রা পূর্ব কর্ডিলেরা-র অরণ্যময়, স্যাঁতসেঁতে, ঢালু এলাকায় বসবাস করে। নিজস্ব ভাষা অনুযায়ী যেভাবে এদের নামকরণ করা হয় তা থেকেই বোঝা যায় যে এদের গায়ের রঙ রীতিমতো ফ্যাকাশে। তা সত্ত্বেও তারা তাদের নিজেদের নারীদের থেকে ইউরোপীয় নারীদের অনেক নিকৃষ্ট বলে মনে করে থাকে।[৬২]

উত্তর আমেরিকার বেশ কিছু গোষ্ঠীর সদস্যদের মাথার চুল রীতিমতো লম্বা হয়। এই ব্যাপারটাকে তারা কতটা মূল্য দেয়, তার একটা চমৎকার নজির উল্লেখ করেছেন ক্যাট্‌লিন। ক্রো গোষ্ঠীর জনৈক সর্দার তার পদে নির্বাচিত হয়েছিল একটাই কারণে—ওই গোষ্ঠীর আর কোনও পুরুষের মাথার চুল তার মতো লম্বা ছিল না। ওই সর্দারটির চুলের দৈর্ঘ্য ছিল দশ ফুট সাত ইঞ্চি। দক্ষিণ আমেরিকার আইমারা এবং কুইচুয়া-দের মাথাতেও দীর্ঘ চুল দেখা যায়। মিঃ ফোর্বস আমাকে জানিয়েছেন যে দীর্ঘ কেশরাজিকে তারা সৌন্দর্যের অন্যতম লক্ষণ হিসেবেই মনে করে এবং চুল কেটে ফেললে অপরাধীকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হয়। মহাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অংশের বাসিন্দারাই তাদের চুলের দৈর্ঘ্য বাড়ানোর জন্য কখনও-কখনও চুলের মধ্যে তন্তুজাতীয় কোনও জিনিস জড়িয়ে দেয়। মাথার চুলকে এত মর্যাদা দিলেও মুখের চুলকে (বা দাড়িকে) উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানরা 'অত্যন্ত কুৎসিত' ব্যাপার বলে মনে করে এবং মুখের প্রতিটা চুলকে সযত্নে নির্মূল করে দেয়। সারা আমেরিকা মহাদেশে, উত্তরের ভ্যাঙ্কুবার দ্বীপ থেকে শুরু করে দক্ষিণের টিয়েরা ফেল ফুয়েগো পর্যন্ত সর্বত্রই, এই ব্যাপারটা লক্ষ করা যায়। 'বিগল্' জাহাজে ইয়র্ক মিনিস্টার নামক একজন ফুজিয়ান ছিলেন। তিনি দেশে ফেরার পর তাঁর দেশবাসীরা তাঁর মুখে গজিয়ে ওঠা ছোট ছোট চুলগুলো তুলে ফেলতে বলেছিল তাঁকে। জনৈক অল্পবয়সী মিশনারি কিছুদিন এই ফুজিয়ানদের সঙ্গে বসবাস করেছিলেন। তাঁর শরীর মোটেই তেমন রোমশ ছিল না, তথাপি সেখানকার বাসিন্দারা তাঁকে নগ্ন করে তাঁর

৬২। জাভা এবং কোচিন-চীনাদের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, ওয়েৎজ্, 'ইনট্রোডাকশন টু অ্যান্থ্রোপলজি', ইংরেজি অনুবাদ, খণ্ড ১, পৃঃ ৩০৫। ইউরাকারা-দের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, এ ডরলিনি, যাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন প্রিচার্ড, 'ফিজিক্যাল হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইন্ড', খণ্ড ৫, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৪৭৬।

মুখের এবং সারা শরীরের সমস্ত চুল তুলে ফেলার হুমকি দিয়েছিল। কোথাও কোথাও এই ব্যাপারটা একেবারে চরমে পৌঁছয়। যেমন, প্যারাগুয়ের ইন্ডিয়ানরা তাদের ভ্রূ আর চোখের পাতাগুলো পর্যন্ত তুলে ফেলে দেয় এবং বলে যে নিজেদেরকে ঘোড়ার মতো দেখাক তা তারা চায় না।[৬৩]

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, পৃথিবীর সর্বত্রই যে-সব জাতির মানুষদের মুখে দাড়ি থাকে না, তারা প্রত্যেকেই মুখে আর শরীরে চুলে থাকাকে অপছন্দ করে এবং সেইসব চুলকে নির্মূল করে দেওয়ার জন্য নানারকম কষ্ট স্বীকার করে। কল্‌মাক্‌দের মুখে দাড়ি থাকে না। ঠিক আমেরিকানদের মতোই তারাও মুখের এবং শরীরের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চুলগুলো তুলে ফেলে দেয়। এই একই ব্যাপার লক্ষ করা যায় পলিনেশীয়দের মধ্যে, মালয়ের কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে এবং শ্যামদেশীয়দের মধ্যে। মিঃ ভাইচ্‌ বলেছেন যে জাপানি মহিলারা 'প্রত্যেকেই আমাদের জুলফির ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিল, এগুলোকে অত্যন্ত কুৎসিত বলে মনে করেছিল তারা এবং এগুলো কেটে ফেলে জাপানি পুরুষদের মতো হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল।' নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীদের মুখে ছোট ও কোঁকড়ানো দাড়ি থাকে, কিন্তু আগে তারাও তাদের মুখের সমস্ত চুল তুলে ফেলে দিতে অভ্যস্ত ছিল। তারা বলত, 'রোমশ পুরুষের বরাতে কোনও মেয়ে জোটে না।' তবে এখন নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীদের মধ্যে এই রীতিটার পরিবর্তন ঘটেছে। ইউরোপীয়দের উপস্থিতিই হয়তো তার কারণ। মাওরি-রা তো এখন দাড়িকে রীতিমতো সম্মানের চোখেই দেখে।[৬৪]

অন্যদিকে, যে-সব জাতির মানুষদের মুখে দাড়ি থাকে তারা দাড়িকে রীতিমতো মর্যাদার চোখে দেখে। অ্যাংলো-স্যাক্সনরা শরীরের প্রতিটি অংশের গুরুত্বকে দামের নিরিখে বিচার করে—'দাড়ি হারানোর মূল্য হল কুড়ি শিলিং, কিন্তু উরুর হাড় ভাঙার মূল্য মাত্র বারো শিলিং।'[৬৫] পূর্বাঞ্চলের মানুষরা হামেশাই তাদের দাড়ির নামে দিব্যি করে। আফ্রিকার মাকালোলো গোষ্ঠীর মোড়ল চিনসুর্দি যে দাড়িকে একটা দারুণ অলংকার বলে মনে করত, তা তো আমরা আগেই দেখেছি। প্রশান্ত মহাসাগরের

৬৩। জি. ক্যাটলিন, 'নর্থ আমেরিকান ইন্ডিয়ানস', তৃতীয় সংস্করণ, ১৮৪২, খণ্ড ১, পৃঃ ৪৯ ; খণ্ড ২, ২২৭। ভাঙ্কুবার দ্বীপের অধিবাসীদের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, স্প্রোট, 'মিন্‌স্‌ অ্যান্ড স্টাডিজ অফ স্যাভেজ লাইফ', ১৮৬৮, পৃঃ ২৫। প্যারাগুয়ের ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, আজারা, 'ভয়েজেস', খণ্ড ২, পৃঃ ১০৫।

৬৪। শ্যামদেশীয়দের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, প্রিচার্ড, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ৪, পৃঃ ৫৩৩। জাপানিদের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, ভাইচ্‌-এর প্রবন্ধ, 'গার্ডনারস ক্রনিক্‌ল্‌', ১৮৬০, পৃঃ ১১০৪। নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীদের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, মান্তেগাৎসা, 'Viaggi e Studi', ১৮৬৭, পৃঃ ৫২৬। উল্লেখিত অন্যান্য জাতিসমূহের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, লরেন্স, 'লেকচারস অন ফিজিওলজি', ১৮২২, পৃঃ ২৭২।

৬৫। লুবক, 'অরিজিন অফ সিভিলাইজেশন', ১৮৭০, পৃঃ ৩২১।

ফিজি দ্বীপের বাসিন্দাদের দাড়ি 'বেশ ঘন আর ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া হয় এবং এটাই তাদের সবথেকে গর্বের বস্তু।' আবার এদেরই সন্নিহিত টোঙ্গা আর সামোয়া দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের 'দাড়ি থাকে না এবং অমসৃণ বা রোমশ চিবুককে রীতিমতো ঘৃণা করে তারা।' এলিস অঞ্চলের একটিমাত্র দ্বীপের 'পুরুষদের মুখে প্রচুর দাড়ি থাকে আর তা নিয়ে তাদের গর্বের শেষ নেই।'[৬৬]

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষদের সৌন্দর্যবোধ কত ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। যে-সব জাতির মানুষরা তাদের দেবতাদের কিংবা দেবমহিমায় উত্তীর্ণ শাসকদের মূর্তি বানানোর মতো অবস্থায় উন্নীত হয়েছে, তাদের সকলের ক্ষেত্রেই ভাস্কররা মূর্তি বানানোর সময় সৌন্দর্য ও মহনীয়তা সম্বন্ধে তাদের সর্বোচ্চ বোধকে ওইসব মূর্তির মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে থাকে।[৬৭] গ্রিকদের জুপিটার কিংবা অ্যাপোলোর মূর্তির সঙ্গে ইজিপ্ট বা আসিরিয়ার মূর্তিগুলোর তুলনা করলে, আবার এইসব মূর্তির সঙ্গে মধ্য আমেরিকার ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকাগুলো থেকে প্রাপ্ত ভয়ংকরদর্শন ব্যাস-রিলিফের কাজগুলোর তুলনা করলেই এ-কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়।

এ-সিদ্ধান্ত প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন। তবে মিঃ উইনউড রিড, যিনি শুধু আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের নিগ্রোদেরই গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেননি, পর্যবেক্ষণ করেছেন আফ্রিকার অভ্যন্তরের সেইসব জাতিদেরও যারা কখনও ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসেনি, তিনি বলেছেন যে তাদের সৌন্দর্যবোধ অনেকটা আমাদেরই মতো। বোর্নু সম্বন্ধে এবং পুলো গোষ্ঠীর লোকেরা যে-সব জায়গায় বাস করে সেইসব জায়গা সম্বন্ধে ডঃ রল্‌ফ্‌স্‌-ও একই কথা আমাকে লিখে জানিয়েছেন। মিঃ রিড দেখেছিলেন যে নিগ্রো মেয়েদের সৌন্দর্য সম্বন্ধে নিগ্রো পুরুষদের ধারণার সঙ্গে তাঁর নিজের ধারণার কোনও অমিল নেই, আবার ইউরোপীয় মেয়েদের সৌন্দর্যকে আমরা যে-চোখে দেখি নিগ্রোরাও সেই চোখেই দেখে। তারা বড় চুল পছন্দ করে, মাথায় প্রচুর চুল আছে দেখানোর জন্য নানারকম কৃত্রিম উপকরণও ব্যবহার করে। তাদের মুখে দাড়ি খুব কমই থাকে, তথাপি দাড়িকে তারা প্রশংসার চোখেই দেখে। কী ধরনের নাক তারা বেশি পছন্দ করে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি মিঃ রিড। একটি মেয়েকে তিনি বলতে শুনেছিলেন, 'ওকে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না। ওর তো নাকই নেই!' এ থেকে মনে হয় খাঁদা নাক এদের খুব-একটা পছন্দসই নয়।

৬৬। পলিনেশীয়দের সম্বন্ধে এই তথ্যগুলি মিঃ প্রিচার্ড এবং অন্যান্যদের রচনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন ডঃ বার্নার্ড ডেভিস, 'অ্যান্থ্রোপলজিক্যাল রিভিউ', এপ্রিল ১৮৭০, পৃঃ ১৮৫, ১৯১।

৬৭। এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন চ. কোঁৎ, 'Traite de Legislation', তৃতীয় সংস্করণ, ১৮৩৭, পৃঃ ১৩৬।

তবে মনে রাখা দরকার, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের নিগ্রোদের মধ্যে যে-ধরনের খাঁদা, থ্যাবড়া নাক আর সামনে-এগিয়ে-আসা চোয়াল দেখা যায়, সেটা আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের তুলনায় একটা ব্যতিক্রমী ব্যাপার। উপরোক্ত কথাগুলো বলার পরও মিঃ রিড লিখেছেন যে নিগ্রোরা 'আমাদের গায়ের রঙ পছন্দ করে না। নীল চোখ সম্বন্ধে তারা রীতিমতো বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, সেইসঙ্গেই মনে করে যে আমাদের নাক অতিরিক্ত লম্বা আর ঠোঁট ভীষণ পাতলা।' কোনও ইউরোপীয় নারীর শারীরিক কিছু লক্ষণ তাদের ভাল লাগতে পারে, কিন্তু তাই বলে যে তারা কখনও সুদর্শনা কোনও নিগ্রো-নারীর বদলে অত্যন্ত সুন্দরী কোনও ইউরোপীয় নারীকে পছন্দ করবে—এমন আশা সুদূরপরাহত বলেই মনে করেন মিঃ রিড।[৬৮]

অনেক দিন আগে একটি সাধারণ নীতির কথা বলেছিলেন হামবোল্ড।[৬৯] তিনি বলেছিলেন—প্রকৃতি মানুষকে যা-কিছু বৈশিষ্ট্য দেয়, তাকে সে গুরুত্ব দেয় তো বটেই, এমনকী প্রায়শ সেগুলোকে আরও বাড়িয়ে তোলারও চেষ্টা করে। কথাটা যে সত্য, তার প্রমাণের কোনও অভাব নেই। যে-সব জাতির মানুষদের মুখে দাড়ি থাকে না তারা তাদের মুখের এবং প্রায়শই সারা শরীরের সমস্ত রোম নির্মূল করে ফেলে—এটি ওই নীতিটিরই একটি দৃষ্টান্ত। প্রাচীনকালে এবং এই আধুনিক যুগেও অনেক জাতির লোকেরাই তাদের মাথার খুলির বিপুল পরিবর্তন ঘটাত এবং ঘটায়। বিশেষত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরা যে নিজেদের কিছু স্বাভাবিক ও প্রশংসিত বৈশিষ্ট্যকে আরও বাড়িয়ে তোলার জন্যই এ-কাজ করে থাকে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বেশ কিছু আমেরিকান ইন্ডিয়ান গোষ্ঠীর লোকেরা একেবারে চ্যাপটা মাথাকে রীতিমতো সুন্দর বলে মনে করে, আমাদের চোখে যা নিতান্তই হাস্যকর। উত্তর-পশ্চিম উপকূলের বাসিন্দারা তাদের মাথাকে চাপ দিয়ে ছুঁচোলো শঙ্কুর মতো করে নেয়। সেইসঙ্গেই তাদের অভ্যাস হল 'মাথার ওপরদিকে চুলগুলোকে ঝুঁটি করে বাঁধা। ডঃ উইলসন-এর

৬৮। 'আফ্রিকান স্কেচ বুক', খণ্ড ২, ১৮৭৩, পৃঃ ২৫৩, ৩৯৪, ৫২১। ফুজিয়ানদের মধ্যে দীর্ঘদিন বসবাসকারী জনৈক মিশনারি আমাকে জানিয়েছেন যে ইউরোপীয় নারীদেরকে তারা অত্যন্ত সুন্দরী বলে মনে করে। কিন্তু আমেরিকার অন্যান্য আদিবাসীদের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞাত তথ্যের আলোয় বিচার করলে তাঁর এই উক্তিটিকে ভুল বলেই মনে হয়। কথাটা সত্য হতে পারে একমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন ফুজিয়ান সম্বন্ধে যারা কিছুদিন ইউরোপীয়দের সঙ্গে বসবাস করেছে এবং তার ফলে আমাদেরকে তাদের তুলনায় উৎকৃষ্টতর জীব বলে ভাবতে শিখেছে। অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক ক্যাপ্টেন বার্টন-এর একটি মন্তব্য আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। বার্টন বলেছেন—যে-নারীকে আমরা সুন্দরী বলে মনে করি, তাকে সারা পৃথিবীর সব জায়গায় লোকেরাই সুন্দরী বলে মনে করে, 'অ্যানথ্রোপলজিক্যাল রিভিউ', মার্চ ১৮৬৪, পৃঃ ২৪৫।

৬৯। 'পার্সোনাল ন্যারেটিভ', ইংরেজি অনুবাদ, খণ্ড ৪, পৃঃ ৫১৮ এবং অন্যত্র। 'Viaggi e Studi', ১৮৬৭, গ্রন্থে মান্তেগাজা-ও জোর দিয়ে এই একই নীতির কথা বলেছেন।

মতে এর কারণ হল মাথার ওই অতিপ্রিয় শাঙ্কবাকার ধরনটাকে আরও বেশি উঁচু বা ছুঁচোলো করে দেখানো।' আরাখানের অধিবাসীরা 'চওড়া, মসৃণ কপাল পছন্দ করে, আর কপালকে চওড়া ও মসৃণ করে তোলার জন্য সদ্যোজাত শিশুদের মাথায় সীসের একটা পাত বেঁধে দেয় তারা।' অন্যদিকে, ফিজি দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা 'মাথার খুলির পিছনদিকটা চওড়া ও গোল হলে তাকে রীতিমতো সৌন্দর্যের দ্যোতক বলে মনে করে।'[৭০]

খুলির ব্যাপারে যা, নাকের ব্যাপারেও তা-ই। অ্যাটিলার আমলের হুন্‌রা তাদের শিশুদের নাক চ্যাপটা করার জন্য নাকের ওপর পটি বেঁধে দিত, 'যাতে নাকের স্বাভাবিক আদলটা আরও সুন্দর হয়ে ওঠে।' তাহিতির বাসিন্দারা 'দীর্ঘনাসা' শব্দটাকে রীতিমতো অপমানজনক ব্যাপার বলে মনে করে এবং নিজেদের সন্তানদের সুন্দর করে তোলার জন্য চাপ দিয়ে তাদের নাক আর কপাল চ্যাপটা করে দেয়। এই একই রীতি চালু আছে সুমাত্রার মালয়ীদের মধ্যে, হটেন্‌টট্‌দের মধ্যে, কিছু নিগ্রো গোষ্ঠীর মধ্যে এবং ব্রাজিলের অধিবাসীদের মধ্যে।[৭১] চীনাদের পা এমনিতেই অত্যন্ত ছোট হয়।[৭২] এই ছোট পা-কে আরও ছোট করার জন্য উচ্চতর শ্রেণীর মহিলারা নিজেদের পা-কে মুচড়ে বিকৃত করার চেষ্টা করে থাকে। শেষত, হামবোল্ড-এর মতে—নিজেদের ত্বকের স্বাভাবিক রঙকে আরও বাড়িয়ে তোলার জন্যই আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা তাদের শরীরকে লাল রঙে চিত্রিত করে ; কিছুদিন আগে পর্যন্তও ইউরোপীয় মহিলারা নিজেদের স্বাভাবিক উজ্জ্বল রঙকে উজ্জ্বলতর করে তোলার জন্য রুজ ও সাদা অঙ্গরাগ ব্যবহার করত ; তবে এইভাবে নিজেদের চিত্রিত করার পেছনে এই ধরনের কোনও উদ্দেশ্য বর্বর জাতিগুলোর মধ্যে থাকে কি না, সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আছে।

আমাদের নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারেও এই একই নীতি এবং একই

৭০। আমেরিকান গোষ্ঠীর সদস্যদের মাথার খুলি প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, নট এবং গ্লিডন, 'টাইপ্‌স্ অফ ম্যানকাইন্ড', ১৮৫৪, পৃঃ ৪৪০ ; প্রিচার্ড, 'ফিজিক্যাল হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইন্ড', খণ্ড ১, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৩২১ ; আরাখানের অধিবাসীদের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, ঐ, খণ্ড ৪, পৃঃ ৫৩৭ ; উইলসন, 'ফিজিক্যাল অ্যান্‌থ্রোপলজি', স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন, ১৮৬৩, পৃঃ ৮৮ ; ফিজির বাসিন্দাদের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃঃ ২৯০। স্যর জে. লুবক এ-ব্যাপারে একটি চমৎকার সারসংক্ষেপ উপস্থাপিত করেছেন 'প্রিহিস্টোরিক টাইমস', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৬৯, পৃঃ ৫০৬।

৭১। হুনদের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, গড্রন, 'De l'Espece', খণ্ড ২, ১৮৫৯, পৃঃ ৩০০। তাহিতির বাসিন্দাদের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য, ওয়েৎজ, 'ইনট্রোডাকশন টু অ্যান্‌থ্রোপলজি', ইংরেজি অনুবাদ, খণ্ড ১, পৃঃ ৩০৫। মার্সডেন, প্রিচার্ড কর্তৃক উদ্ধৃত, 'ফিজিক্যাল হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইন্ড', তৃতীয় সংস্করণ, খণ্ড ৫, পৃঃ ৬৭। লরেন্স, 'লেকচারস অন ফিজিওলজি', পৃঃ ৩৩৭।

৭২। এই তথ্যটির সমর্থন পাওয়া যায় ডঃ ভাইসবাখ্-এর লেখায়, 'Reise der Novara : Anthropolog. Thiel', ১৮৬৭, পৃঃ ২৬৫।

আকাঙ্ক্ষা কাজ করে : পোশাকের প্রতিটা খুঁটিনাটি বিষয়কেও চূড়ান্ত আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করি আমরা। পোশাকের কেতায় অন্যদের ছাপিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করি। তবে বর্বরদের এইসব কেতা বা ধরনগুলো আমাদের থেকে অনেক বেশি স্থায়ী প্রকৃতির হয়ে থাকে। তারা যে নিজেদের শরীরের কৃত্রিম পরিবর্তন ঘটায়, সে ব্যাপারেও এই একই কথা প্রযোজ্য। নীলনদের উজানি অঞ্চলের আরব রমণীরা কেশবিন্যাস করে প্রায় তিনদিন ধরে। অন্য কোনও গোষ্ঠীকে নকল করে না তারা, 'বরং কেশবিন্যাসের উৎকর্ষতায় একে অপরকে ছাপিয়ে যেতে চেষ্টা করে।' আমেরিকার বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে-চ্যাপটা খুলি দেখা যায়, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডঃ উইলসন মন্তব্য করেছেন, 'এই ধরনের রীতিগুলোর বিলোপ ঘটানো অত্যন্ত কঠিন। যে-সব বিপ্লব ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন ঘটায় এবং অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, সেগুলোর ধাক্কা সামলেও এই রীতিগুলো বহাল তবিয়তে টিকে থাকে।'[৭৩] জীবজন্তু ও গাছপালার বংশবিস্তার করানোর পদ্ধতি সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। নিছক শোভাবর্ধনকারী হিসাবে টিকিয়ে রাখা বিভিন্ন ধরনের পশুপাখি ও লতাপাতার বিস্ময়কর বিকাশের ব্যাপারটা এ থেকেই অনুধাবন করা যায়, যা নিয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি।[৭৪] কল্পনাবিলাসীরা সবসময়েই প্রতিটা বৈশিষ্ট্যকে আরও কিছুটা উন্নত করে তুলতে চায়, কোনওরকম মাঝামাঝি ব্যাপারে তারা আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাদের পোষা জীবজন্তুদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো হঠাৎই আমূল বদলে যাক, তা-ও চায় না তারা। নিজেরা যাতে অভ্যস্ত তা-ই তাদের প্রিয়, কিন্তু সেইসঙ্গেই তারা আন্তরিকভাবে চায় তাদের জীবজন্তুদের প্রতিটা বৈশিষ্ট্যই যেন একটু একটু করে উন্নত হয়ে ওঠে।

মানুষ আর নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের ইন্দ্রিয়গুলো বোধহয় এমনভাবেই গঠিত যাতে করে উজ্জ্বল রঙ, বিশেষ কিছু আকার বা ধাঁচ, এবং সুরেলা ও ছন্দোময় ধ্বনি তাদের আনন্দ দেয় এবং সেগুলোকে সুন্দর বলা হয়। কিন্তু এটা ঠিক কেন হয়, আমাদের জানা নেই। মানবশরীরের সৌন্দর্যের ব্যাপারে মানুষের মনে কোনও বিশ্বজনীন মাপকাঠি যে নেই, সেটা নিঃসংশয়েই বলা যায়। তবে এমনটা হতেও পারে যে সময়ের গতিপথে কিছু কিছু রুচি উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হতে শুরু করে—যদিও এ-ধারণার সপক্ষেও কোনও স্পষ্ট প্রমাণ নেই। তবে ব্যাপারটা যদি সত্যিই তা-ই হয়, তাহলে বলতে হয় সৌন্দর্যের আদর্শ মাপকাঠি সম্বন্ধে প্রতিটি

৭৩। 'স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন', ১৮৬৩, পৃঃ ২৮৯। আরব রমণীদের কেশবিন্যাস প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, স্যর এস. বেকার, 'দ্য নাইল ট্রিবিউটারিস', ১৮৬৭, পৃঃ ১২১।

৭৪। 'দ্য ভ্যারিয়েশন অফ অ্যানিম্যালস অ্যান্ড প্ল্যান্টস আণ্ডার ডোমেস্টিকেশন', খণ্ড ১, পৃঃ ২১৪, খণ্ড ২, পৃঃ ২৪০।

জাতির একটি নিজস্ব ও সহজাত ধারণা থাকে। অনেকে বলেছেন[৭৫] যে নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের শারীরিক গঠনের প্রতি আমাদের যে-মনোভাব, তা থেকেই গড়ে ওঠে অসুন্দর বা কুৎসিত সংক্রান্ত ধারণা। অধিকতর সুসভ্য জাতিগুলোর ক্ষেত্রে কথাটা অংশত সত্য, যাদের কাছে মননশক্তির মূল্য অপরিসীম। তবে সব ধরনের কুৎসিততা সম্বন্ধে এ-কথাটা আদৌ প্রযোজ্য নয়। প্রতিটি জাতির মানুষরা সেইসব জিনিসই পছন্দ করে যাতে তারা অভ্যস্ত, বিরাট কোনও পরিবর্তন তারা বরদাস্ত করতে পারে না। তবে তারা বৈচিত্র্য পছন্দ করে এবং প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে বেশ কিছুটা পর্যন্ত বাড়িয়ে তুলতে ভালবাসে।[৭৬] ডিম্বাকৃতি মুখমণ্ডল, খাড়া নাক এবং উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ দেখতে যারা অভ্যস্ত, তারা এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে আরও বেড়ে উঠতে দেখলে খুশি হয় (যা আমরা ইউরোপীয়রা ভাল করে জানি)। অন্যদিকে, যে-সব জায়গার মানুষরা চওড়া মুখমণ্ডল, উঁচু হনু, খাঁদা নাক আর কালো গাত্রবর্ণ দেখতে অভ্যস্ত, তারা এইসব বৈশিষ্ট্যগুলোকে আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখলেই খুশি হয়। সব ধরনের বৈশিষ্ট্য যে সৌন্দর্যের স্বার্থেই অত্যধিক বিকশিত হয়ে উঠতে পারে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাই প্রত্যেক জাতির মানুষরাই নিখুঁত সুন্দরী নারীদের (যে-সৌন্দর্যের মধ্যে নিহিত থাকে বিশেষ ধরনে পরিবর্তিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য) বিস্ময়ের বস্তু বলে মনে করে। সুবিখ্যাত শারীরস্থানবিদ বিশাট বহুদিন আগেই বলেছিলেন—সব মানুষ যদি একই ছাঁচে গড়া হত, তাহলে সৌন্দর্য বলে কিছু থাকতই না। আমাদের সব নারীরা ভেনাস দ্য মেদিচি-র মতো সুন্দরী হয়ে উঠলে আমরা সাময়িকভাবে মুগ্ধ হতাম ঠিকই, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমরা বৈচিত্র্য খুঁজতে শুরু করতাম এবং বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া মাত্রই আমরা যা চাইতে শুরু করতাম তা হল—সৌন্দর্যের চালু মাপকাঠিকে ছাপিয়ে কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আর-একটু উন্নত হয়ে উঠুক।

৭৫। শ্যাফহউসেন, 'Archiv fur Anthropologie', ১৮৬৬, পৃঃ ১৬৪।

৭৬। সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে প্রায় ডজনখানেক ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব সংগ্রহ করেছেন মিঃ বেইন ('মেন্টাল অ্যান্ড মরাল সায়েন্স', ১৮৬৮, পৃঃ ৩০৪-৩১৪)। তবে এখানে প্রদত্ত ধারণাটির সঙ্গে সেগুলোর কোনওটারই পুরোপুরি মিল নেই।

ডিসেন্ট অফ ম্যান

দ্বিতীয় খণ্ড ❑ দ্বিতীয় ভাগ

❑ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ❑

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

মানুষের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ—পূর্বানুবৃত্তি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ—পূর্বানুবৃত্তি

প্রতিটি জাতির মধ্যে সৌন্দর্যের ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠি অনুযায়ী নারীদের অবিরাম নির্বাচন প্রসঙ্গে—সভ্য ও বর্বর জাতিগুলির মধ্যে যৌন নির্বাচনের ব্যাপারে যে-সব কারণগুলি বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেগুলি প্রসঙ্গে—আদিম যুগে যৌন নির্বাচনের অনুকূল শর্তাবলী—মানবজাতির ক্ষেত্রে যৌন নির্বাচন কীভাবে সক্রিয় হয়—বর্বর জাতিগুলির নারীদের স্বামী-নির্বাচনের কিছু ক্ষমতা থাকে—শরীরে রোমের অনুপস্থিতি এবং দাড়ির বিকাশ—ত্বকের রঙ—সারসংক্ষেপ।

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে সমস্ত বর্বর জাতির কাছে অলংকার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বাহ্যিক অবয়ব অত্যন্ত মূল্যবান। আমরা আরও দেখেছি যে বিভিন্ন জায়গার পুরুষরা তাদের নারীদের সৌন্দর্যের বিচার করে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠিতে। এবার আমরা নজর দেব পরবর্তী প্রশ্নটির দিকে। প্রশ্নটি হল : মানুষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে-সব নারীরা পুরুষদের চোখে সবথেকে আকর্ষণীয়, বহু প্রজন্ম ধরে তাদেরই স্ত্রী হিসেবে নির্বাচন করে চলার ফলে শুধু নারীদেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটেছে, নাকি নারী-পুরুষ উভয়েরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটেছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মটা হল—সব ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই পুরুষ ও নারীরা উত্তরাধিকারসূত্রে সমানভাবেই লাভ করে থাকে। এ থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে মানুষের ক্ষেত্রেও কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্য যদি নারীরা বা পুরুষরা যৌন নির্বাচন মারফত অর্জন করে, তাহলে তা তাদের উভয় লিঙ্গের সন্তানদের মধ্যেই সঞ্চারিত হবে। এইভাবে যদি কোনও পরিবর্তন সত্যিই ঘটে, তাহলে প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে তার ফলে বিভিন্ন জাতি বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হবে, কারণ প্রত্যেক জাতিরই সৌন্দর্য বিচারের নিজস্ব মানদণ্ড আছে।

মানুষের ক্ষেত্রে, বিশেষত বর্বর দশার মানুষদের ক্ষেত্রে, শারীরিক কাঠামো সংক্রান্ত ব্যাপারে যৌন নির্বাচনের সক্রিয় হওয়ার পথে বেশ কিছু কারণ প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে থাকে। সুসভ্য জাতির পুরুষরা কোনও নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় মূলত তার মানসিক গুণের জন্য, তার সম্পদের জন্য, বিশেষত তার সামাজিক অবস্থানের জন্য—কারণ পুরুষরা সাধারণত তাদের থেকে অনেক নিচু স্তরের কোনও নারীকে বিয়ে করতে চায় না। যে-সব পুরুষরা সবথেকে সুন্দরী নারীদের বিয়ে করতে সক্ষম হয়, তারা যে সাদামাটা নারীদের স্বামীদের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক সন্তান-সন্ততি রেখে যেতে সক্ষম হবে, এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই—একমাত্র হাতে-গোনা যে-কয়েকজনের স্ত্রীরা স্বামীর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্ত্রী হিসেবে

পরিগণিত হয়, তাদের কথা আলাদা। এর বিপরীত নির্বাচন, অর্থাৎ নারীদের দ্বারা অধিকতর আকর্ষণীয় পুরুষদের নির্বাচন করার ব্যাপারে বলা যায়—সভ্য দেশগুলোতে মনোমতো পুরুষ নির্বাচনের ব্যাপারে নারীদের অবাধ অথবা প্রায়-অবাধ স্বাধীনতা আছে ঠিকই (বর্বর জাতিগুলোর মধ্যে যা দেখা যায় না), কিন্তু তাদের এই নির্বাচন বহুলাংশেই প্রভাবিত হয় পুরুষদের সামাজিক অবস্থান এবং ধন-সম্পদের দ্বারা। আবার, পুরুষদের সাফল্য বহুলাংশেই নির্ভর করে তাদের বুদ্ধিমত্তা ও কর্মশক্তির ওপর অথবা তাদের পূর্বপুরুষ নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও কর্মশক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে-সম্পদ রেখে যায়, তার ওপর। এই বিষয়টি নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা দরকার, কারণ দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বলেছেন, 'জীবনের অন্য যে-কোনও লক্ষ্যের থেকে প্রেমের চূড়ান্ত লক্ষ্যটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ—তা সে মিলনান্তক বা বিরহাত্মক, যা-ই হোক না কেন। কারণ এ থেকেই গড়ে ওঠে পরবর্তী প্রজন্ম...প্রশ্নটা কোনও ব্যক্তিবিশেষের মঙ্গল-অমঙ্গলের নয়, এবং ভবিষ্যতের সমগ্র মানবসমাজের—যে-ভবিষ্যৎ আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে।'[১]

তবে, কিছু কিছু সভ্য ও অর্ধ-সভ্য জাতির ক্ষেত্রে যৌন নির্বাচন যে তাদের কিছু সদস্যের শারীরিক কাঠামোর পরিবর্তনকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে, তা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। অনেকে মনে করেন, এবং আমার মতে সঠিকভাবেই মনে করেন, যে আমাদের অভিজাততন্ত্র, যার মধ্যে পড়ে সমস্ত বিত্তবান পরিবারগুলি এবং যাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার লাভের বিধি বহুদিন ধরেই চালু আছে, তারা বহু প্রজন্ম ধরে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর সবথেকে সুন্দরী নারীদের বিয়ে করেছে, আর তার ফল হিসেবে সৌন্দর্যের ইউরোপীয় মানদণ্ড অনুযায়ী তারা মধ্যবিত্তদের চেয়ে সুন্দরতর হয়ে উঠেছে। তবে শারীরিক কাঠামোর সুষম বিকাশের জন্য জীবনের যে-অনুকূল পরিবেশ দরকার হয়, তা মধ্যবিত্তদেরও আছে। কুক্ বলেছেন—চেহারার যে-উৎকর্ষতা (প্রশান্ত মহাসাগরের) অন্য সমস্ত দ্বীপের অভিজাতদের মধ্যে দেখা যায়, তা স্যান্ডউইচ দ্বীপেও লক্ষ করা যায়।' তবে তাদের উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং উন্নত জীবনযাপন পদ্ধতিও এর কারণ হতে পারে।

পার্সিয়ানদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রাচীন পর্যটক শার্দা বলেছেন, 'জর্জিয়ান আর সার্কাসিয়ানদের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে এদের বংশধররা এখন রীতিমতো উন্নত হয়ে উঠেছে, কারণ জর্জিয়ান আর সার্কাসিয়ানরা হচ্ছে সৌন্দর্যের বিচারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতি। পারস্যে এমন কোনও মানুষের খোঁজ পাওয়া প্রায় অসম্ভব যার মা জর্জিয়ান অথবা সার্কাসিয়ান নয়।' সেইসঙ্গেই তিনি বলেছেন যে এই সৌন্দর্যটা তারা

১। 'শোপেনহাওয়ার অ্যান্ড ডারউইনইজম'—'জার্নাল অফ অ্যানথ্রোপলজি', জানুয়ারি ১৮৭১, পৃঃ ৩২৩।

তাদের 'পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে লাভ করেনি। কারণ উপরোক্ত দু'টি জাতির সঙ্গে সংমিশ্রণ না-ঘটলে পারস্যের অভিজাত ব্যক্তিরা (যারা আদতে তাতারদের বংশধর) রীতিমতো কুৎসিত দর্শনই হত।'[২] আর-একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। সিসিলির সান-গিউলিয়ানোতে ভেনাস ইরিসিনার একটি মন্দির আছে। সারা গ্রিসের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের নির্বাচন করা হত সেই মন্দিরের পূজারিনী হিসেবে। এই পূজারিনীরা দেবীর কাছে উৎসর্গিত অক্ষতযোনি কুমারী থাকত না। এই তথ্যটি জানা গেছে কাত্রেফাজ-এর লেখা থেকে।[৩] তিনি আরও বলেছেন—সান-গিউলিয়ানোর নারীরা এখন ওই দ্বীপপুঞ্জের সবথেকে সুন্দরী নারী হিসেবেই পরিগণিত হয় এবং নিজেদের মডেল হিসেবে তাদের পাওয়ার জন্য শিল্পীরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। তবে উপরোক্ত কোনও ঘটনাই তথ্যপ্রমাণের দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়নি।

নিম্নোক্ত ঘটনাটি বর্বরদের ব্যাপারে হলেও রীতিমতো চিত্তাকর্ষক। মিঃ উইনউড রিড আমাকে জানিয়েছেন যে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের জোলোফ্ নামক নিগ্রো গোষ্ঠীর 'প্রত্যেককেই দেখতে অত্যন্ত সুন্দর'। তাঁর একজন বন্ধু জনৈক জোলোফ্‌কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচ্ছা, তোমাদের এখানে সকলকেই দেখতে এত সুন্দর, পুরুষদের তো বটেই, সেইসঙ্গে তোমাদের মেয়েদেরও—এটা কী করে হয়?' উত্তরে জোলোফ্‌টি বলেছিল, 'ব্যাপারটা খুব সোজা। আমরা বরাবরই আমাদের কুৎসিতদর্শন ক্রীতদাসীদের বাইরে বিক্রি করে দিই।' বলা নিষ্প্রয়োজন যে সমস্ত বর্বর জাতির মধ্যেই ক্রীতদাসীরা রক্ষিতা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিজেদের গোষ্ঠীর সকলকে দেখতে সুন্দর কেন তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিগ্রোটি, সঠিকভাবেই হোক কিংবা বেঠিকভাবেই হোক, বলল যে কুৎসিতদর্শন নারীদের গোষ্ঠীর বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার চিরাচরিত রীতিই এর কারণ। নিগ্রোটির এই উক্তি শুনে প্রথমটায় আশ্চর্য লাগলেও ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ আশ্চর্যজনক নয়। আমার অন্য একটি রচনায়[৪] আমি দেখিয়েছি নিজেদের গৃহপালিত পশুদের বংশবিস্তার ঘটানোর ব্যাপারে তাদের যথাযথ সঙ্গী-সঙ্গিনী নির্বাচনের গুরুত্ব সম্বন্ধে নিগ্রোরা পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। প্রয়োজনে মিঃ রিড-এর লেখা থেকে এ ব্যাপারে আরও তথ্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

২। এই উদ্ধৃতিগুলি নেওয়া হয়েছে লরেন্স-এর লেখা থেকে ('লেকচারস অন ফিজিওলজি', ১৮২২, পৃঃ ৩৯৩)। ইংল্যান্ডের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের সৌন্দর্যের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে লরেন্স বলেছেন—বহু প্রজন্ম ধরে অধিকতর সুন্দরী নারীদের বিয়ে করার ফলেই এই সৌন্দর্য লাভ করেছে তারা।

৩। 'অ্যান্থ্রোপলজি', 'Revue des Cours Scientifiques', অক্টোবর ১৮৬৮, পৃঃ ৭২১।

৪। 'দ্য ভ্যারিয়েশেন অফ অ্যানিম্যালস অ্যান্ড প্ল্যান্টস আন্ডার ডোমেস্টিকেশন', খণ্ড ১, পৃঃ ২৯৭।

বর্বরদের ক্ষেত্রে যে-সব কারণে যৌন নির্বাচনের ক্রিয়া প্রতিহত অথবা বাধাপ্রাপ্ত হয়

এর প্রধান কারণগুলি হল : এক, অথাকথিত দলগত বিবাহ বা অবাধ যৌনসম্পর্ক ; দুই, কন্যা-শিশু হত্যার ফলাফল ; তিন, বাল্যবিবাহ ; এবং চার, নারীদের প্রতি অশ্রদ্ধা, তাদের নিছক দাসী হিসেবে দেখা। এই চারটি বিষয় নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা দরকার।

যতদিন পর্যন্ত মানুষের অথবা অন্য যে-কোনও পশুর স্ত্রী-পুরুষের জোড়বাঁধাটা নিছকই ঘটনাচক্রের ওপর নির্ভর করে, সঙ্গী-সঙ্গিনী বাছাইয়ের ব্যাপারে কোনও পক্ষেরই কোনও ভূমিকা থাকে না, ততদিন পর্যন্ত যৌন নির্বাচনের কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর সঙ্গী-সঙ্গিনী জোটানোর ব্যাপারে দলের কয়েকজনের থেকে অন্য কয়েকজন বেশি সুবিধা পেলে তাদের সন্তানদের ওপরে তার একটা প্রভাব পড়ে, কিন্তু জোড়বাঁধাটা নেহাতই ঘটনাচক্রে ঘটলে সে-রকম প্রভাব পড়ারও কোনও সম্ভাবনা থাকে না। আমরা জানি এখনও কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে এমন বিবাহপদ্ধতি চালু আছে যে-পদ্ধতিকে স্যর জে. লুবক সৌজন্যবশত দলগত বিবাহপদ্ধতি নামে চিহ্নিত করেছেন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী গোষ্ঠীর প্রতিটি পুরুষ ও নারীই পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী। অনেক বর্বর গোষ্ঠীর সদস্যদের কামলালসা যে রীতিমতো বিস্ময়কর, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে তাদের যৌনসম্পর্ক পুরোপুরি অবাধ কি না, সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য আরও তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করা দরকার। তবে এ ব্যাপারে যাঁরা সবথেকে বেশি অনুসন্ধান করেছেন[৫] এবং যাঁদের মতামতের মূল্য আমার থেকে অনেক বেশি, তাঁদের মতে পৃথিবীর সর্বত্র দলগত বিবাহই (এই অভিধাটি বাছা হয়েছে খুব সতর্কভাবেই) ছিল বিবাহের আদি ও সার্বজনীন রূপ—আপন ভাইবোনদের বিবাহও যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রয়াত স্যর এ. স্মিথ, যিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বহু জায়গায় ঘুরেছিলেন এবং সেখানকার ও অন্য নানান জায়গার বর্বরদের

৫। স্যর জে. লুবক, 'দ্য অরিজিন অফ সিভিলাইজেশন', ১৮৭০, পরিচ্ছেদ ৩, বিশেষত পৃঃ ৬০-৬৭। মিঃ ম্যাক্‌লেনান তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান রচনা 'প্রিমিটিভ ম্যারেজ', ১৮৬৫, পৃঃ ১৬৩-তে নারী-পুরুষের মিলন সম্বন্ধে বলেছেন, 'সুপ্রাচীনকালে এই মিলন ছিল স্বাধীন, অল্পস্থায়ী ও বাছবিচারহীন।' বর্তমান যুগের বর্বরদের চূড়ান্ত কামলালসা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন মিঃ ম্যাক্‌লেনান এবং স্যর জে. লুবক। মিঃ এল. এইচ. মর্গ্যান তাঁর সম্পর্কের শ্রেণীবিভাজন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত স্মৃতিচারণমুলক রচনাটিতে ('প্রসিডিংস অফ আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস', খণ্ড ৭, ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮, পৃঃ ৪৭৫) বলেছেন যে প্রাচীনকালে বহুবিবাহ বা বিবাহের অন্য কোনও ধরন—কিছুই চালু ছিল না। স্যর জে. লুবকের রচনা থেকে মনে হয় যে বাখোফেন-ও এই ধারণারই অংশীদার ছিলেন। অর্থাৎ বাখোফেন-ও বিশ্বাস করতেন—প্রাচীনকালে দলগত বা অবাধ যৌনসম্পর্কই চালু ছিল।

অভ্যাস-আচরণ সম্বন্ধে রীতিমতো ওয়াকিবহাল ছিলেন, তিনি খুব জোর দিয়েই আমাকে জানিয়েছিলেন যে এমন কোনও জাতির অস্তিত্ব নেই যারা নারীদের গোটা দলের সার্বজনীন সম্পত্তি বলে মনে করে। আমার মনে হয় তাঁর এই ধারণাটা গড়ে উঠেছিল বিবাহ শব্দটার মধ্যে যে-অন্তর্নিহিত অর্থটা ফুটে ওঠে, তা থেকেই। পরবর্তী গোটা আলোচনায় বিবাহ শব্দটাকে আমি ঠিক সেই অর্থেই ব্যবহার করব যে-অর্থে প্রকৃতিতত্ত্ববিদরা বলেন—অমুক অমুক পশুরা একগামী বা একবিবাহপন্থী। যার অর্থ হল—পুরুষ-প্রাণীরা একজন স্ত্রী-প্রাণীকে বেছে নেয় অথবা স্ত্রী-প্রাণীটিই তাকে বেছে নেয়, অতঃপর সঙ্গমের মরশুমটা কিংবা গোটা বছরটাই পুরুষ-প্রাণীটি সেই স্ত্রী-প্রাণীটির সঙ্গেই থাকে এবং শক্তির জোরে তার ওপর নিজের আধিপত্য কায়েম রাখে। আবার, প্রকৃতিতত্ত্ববিদরা যখন কোনও প্রজাতির সম্বন্ধে বলেন যে তারা হচ্ছে বহুগামী বা বহুবিবাহপন্থী, তখন তার অর্থ হল—পুরুষ-প্রাণীরা একসঙ্গে বেশ কিছু স্ত্রী-প্রাণীর সঙ্গে বসবাস করে। আমাদের আলোচনায় বিবাহের এই অর্থটিই শুধু প্রাসঙ্গিক, কারণ যৌন নির্বাচনের সক্রিয় হয়ে ওঠার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট। তবে উপরোক্ত লেখকদের মধ্যে কয়েকজন যে বিবাহ বলতে গোষ্ঠী কর্তৃক সুরক্ষিত একটি স্বীকৃত অধিকারকেই চিহ্নিত করে থাকেন, তা আমার অজানা নয়।

প্রাচীনকালে যে দলগত বিবাহই চালু ছিল তার স্বপক্ষে রীতিমতো জোরদার পরোক্ষ প্রমাণ আছে। এই প্রমাণের প্রধান ভিত্তি হল সম্পর্কসূচক সম্বোধনগুলো, যে-সব সম্বোধন একই গোষ্ঠীর সদস্যরা পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করে থাকে। এইসব সম্বোধনের মধ্যে পিতা অথবা মাতার সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ফুটে ওঠে না, ফুটে ওঠে গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কটাই। তবে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও বহুবিস্তৃত বলে এখানে তার কোনও সংক্ষিপ্ত বিবরণও পেশ করা সম্ভব নয়। তাই এ ব্যাপারে সামান্য কয়েকটি কথা বলেই বিরত হতে হবে আমাকে। এটা একান্তই স্পষ্ট যে এই ধরনের বিবাহে অথবা যে-সব ক্ষেত্রে বিবাহবন্ধন নিতান্তই শিথিল সেইসব ক্ষেত্রে কোনও সন্তানের পিতা কে, তা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সন্তানের সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্ককেও পুরোপুরি অগ্রাহ্য করাটা রীতিমতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার, বিশেষত যেখানে বেশির ভাগ বর্বর জাতির মধ্যেই নারীরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের সন্তানদের লালনপালন করে থাকে। অনেক জায়গায় সন্তানের বংশধারা নির্ণয় করা হয় শুধুমাত্র মায়ের দিক থেকেই, বাবার দিকটা পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়। অন্য অনেক জায়গায় সম্পর্কসূচক সম্বোধনগুলোর সাহায্যে শুধুমাত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কটাই বোঝানো হয়, অর্থাৎ এইসব ক্ষেত্রে এমনকী মায়ের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কটাও অস্বীকার করা হয়। এর সম্ভাব্য কারণ হয়তো এই যে একই বর্বর গোষ্ঠীর পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত সদস্যদের (যাদের সারাক্ষণই অসংখ্য বিপদের মোকাবিলা করে বেঁচে থাকতে হয়)

নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্কটা পারস্পরিক প্রতিরক্ষা ও সহায়তার প্রয়োজনেই মা আর তার সন্তানের সম্পর্কের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তার ফলেই তাদের সম্পর্কসূচক সম্বোধনগুলো গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ককেই সূচিত করে। তবে মিঃ মর্গ্যান এই ধারণাটির সঙ্গে একমত হতে পারেননি।

মিঃ মর্গ্যানের মতে, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের সম্পর্কসূচক সম্বোধনগুলোকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায় : শ্রেণীবিন্যাসমূলক ও বর্ণনাত্মক—যার মধ্যে শেষোক্ত পদ্ধতিটা আমরা ব্যবহার করে থাকি। শ্রেণীবিন্যাসমূলক সম্বোধনব্যবস্থার অস্তিত্ব থেকেই ধারণা করা হয় যে প্রাচীনকালে সারা পৃথিবীতেই দলগত বিবাহ এবং যথেচ্ছ যৌনসম্পর্কভিত্তিক অন্যান্য বিবাহপ্রথা চালু ছিল। তবে আমার মতে এ থেকে এমন ধারণা করা চলে না যে প্রাচীনকালে অবাধ ও বাছবিচারহীন যৌনসম্পর্ক চালু ছিল। স্যর জে. লুবক-ও এই ধারণা পোষণ করেন। নিম্নতর শ্রেণীর বিভিন্ন প্রাণীদের মতো মানুষের পুরুষ ও নারীরাও হয়তো একসময় প্রতিটি সন্তানের জন্মের আগে দু'জন সাময়িকভাবে জোড় বাঁধত, এবং এক্ষেত্রেও সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যাপারে প্রায় সেইরকম বিভ্রান্তিই দেখা দিত যে-রকম বিভ্রান্তি দেখা দেয় অবাধ যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে। যৌন নির্বাচনের ব্যাপারে বলা যায়—জোড়বাঁধার আগেই নারী-পুরুষরা পরস্পরকে বাছাই করে থাকলেই যথেষ্ট, তাদের সম্পর্কটা জীবনভর টিকে থেকেছে নাকি এক বছরের মধ্যেই ভেঙে গেছে, সেটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক।

সম্পর্কসূচক সম্বোধন থেকে যে-প্রমাণ পাওয়া যায় তা ছাড়াও অন্য এমন কিছু সূত্রও আছে যা থেকে মনে হয় প্রাচীনকালে সারা পৃথিবীতেই দলগত বিবাহ চালু ছিল। বহির্বিবাহ, অর্থাৎ এক গোষ্ঠীর পুরুষরা অন্য কোনও গোষ্ঠীর নারীদের বিবাহ করবে—এই বিচিত্র ও বহুল-প্রচলিত প্রথাটির কারণ দর্শাতে গিয়ে স্যর জে. লুবক[৬] বলেছেন যে, আদিতে দলগত যৌন-সম্পর্কই চালু ছিল, অর্থাৎ কোনও পুরুষের নিজস্ব কোনও স্ত্রী থাকত না, তবে প্রতিবেশী ও শত্রুভাবাপন্ন কোনও গোষ্ঠীর থেকে কোনও নারীকে ছিনিয়ে আনতে পারলে সেই নারীটি তার নিজস্ব ও মূল্যবান সম্পত্তি হিসেবেই পরিগণিত হত। হয়তো এইভাবেই অন্য জায়গা থেকে স্ত্রী ছিনিয়ে আনার প্রথাটা জন্ম নিয়েছিল, আর পুরুষদের পক্ষে এটা অত্যন্ত সম্মানজনক ব্যাপার ছিল বলেই হয়তো কালক্রমে তা সারা পৃথিবীতেই চালু হয়ে যায়। স্যর জে. লুবকের পূর্বোক্ত রচনাটি। ('অন দ্য সোশ্যাল অ্যান্ড রিলিজিয়াস কন্ডিশন অফ দ্য লোয়ার রেসেস অফ ম্যান', ১৮৭০, পৃঃ ২০) থেকে আমরা আরও বুঝতে পারি, 'গোষ্ঠীগত প্রথাকে উল্লঙ্ঘন করে বিবাহের এই ধরনের খেসারত দেওয়ার রীতিটা কেন চালু

৬। 'অন্য দ্য সোশ্যাল অ্যান্ড রিলিজিয়াস কন্ডিশন অফ দ্য লোয়ার রেসেস অফ ম্যান' প্রসঙ্গে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে প্রদত্ত ভাষণ, ১৮৭০, পৃঃ ২০।

হয়েছিল। কারণ, প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী, যা-কিছু সমগ্র গোষ্ঠীর সার্বজনীন সম্পত্তি, তাকে কেউ তার একার সম্পত্তি বলে দাবি করতে পারত না।' আরও বেশ কিছু তথ্য পেশ করে স্যর জে. লুবক দেখিয়েছেন যে প্রাচীনকালে অত্যধিক কামলালসাসম্পন্ন নারীদের রীতিমতো শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত। তাঁর মতে, যদি মেনে নেওয়া যায় যে অবাধ যৌনসম্পর্কই ছিল গোষ্ঠীর প্রাচীন ও সেহেতু সম্মানজনক প্রথা, তাহলে অত্যধিক কামুক প্রকৃতির নারীদের শ্রদ্ধার চোখে দেখার কারণটা বুঝে নিতে আর কোনও অসুবিধে হয় না।[৭]

মিঃ মর্গ্যান, মিঃ ম্যাক্‌লেনান এবং স্যর জে. লুবক—এই তিনজনই বিবাহপ্রথা প্রসঙ্গে সবথেকে গভীর গবেষণা করেছেন। বিবাহবন্ধন গড়ে ওঠার পদ্ধতির বেশ কিছু প্রশ্নে এঁদের মত পরস্পরের থেকে ভিন্ন। ব্যাপারটা যে রীতিমতো জটিল, তা এ থেকেই বোঝা যায়। তবে উপরোক্ত তথ্যাদি এবং আরও কিছু যুক্তিপ্রমাণ থেকে মনে হয়[৮] যে একেবারে সুনির্দিষ্ট অর্থে বিবাহপ্রথা বলতে যা বোঝায়, তা গড়ে উঠেছে ক্রমান্বয়ে এবং একসময়ে পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায়-অবাধ বা প্রায়-বাছবিচারহীন যৌনসম্পর্কই চালু ছিল। তবে এখানে অন্য একটা ব্যাপারও মনে রাখা দরকার। প্রাণীজগতের সর্বস্তরেই যৌন ব্যাপারে এক ধরনের প্রবল ঈর্ষার দেখা পাই আমরা। নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও এই ঈর্ষা লক্ষ করা যায় এবং আরও বেশি করে লক্ষ করা যায় মানুষের সঙ্গে সবথেকে নিকট সাদৃশ্যযুক্ত প্রাণীদের মধ্যে। এ থেকে আমার মনে হয়েছে—প্রাণীতত্ত্বের বিচারে মানুষ তার বর্তমান স্তরে অর্থাৎ মানুষের স্তরে উন্নীত হওয়ার ঠিক আগের পর্যায়ে তাদের মধ্যে একেবারে অবাধ যৌনসম্পর্ক চালু থাকা সম্ভব ছিল না। আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে বানর-সদৃশ কোনও প্রাণী থেকেই উদ্ভব ঘটেছে মানুষের। বর্তমানের বানর জাতীয় প্রাণীদের আচার-আচরণ সম্বন্ধে যতটুকু জানা গেছে তা থেকে দেখা যায়—এদের কয়েকটি প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীরা একগামী হয়, কিন্তু তারা বছরের মাত্র কিছুটা অংশই স্ত্রী-প্রাণীদের সঙ্গে থাকে। এই ধারার দৃষ্টান্ত হিসেবে ওরাংদের কথা উল্লেখ করা যায়। অন্য কিছু প্রজাতির, যেমন কয়েক ধরনের ভারতীয় ও আমেরিকান প্রজাতির পুরুষ-বানররা পুরোপুরি একগামী হয় এবং সারা বছরই তারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে থাকে। কিছু প্রজাতির বানররা বহুগামী হয়, যেমন

৭। 'অরিজিন অফ সিভিলাইজেশন', ১৮৭০, পৃঃ ৮৬। উপরে যে-সব গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে এমন প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় যা থেকে বোঝা যায় বহু জায়গাতেই সম্পর্ক নির্ধারিত হত কেবলমাত্র স্ত্রী-ধারায় অথবা কেবলমাত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক মারফত।

৮। প্রাচীনকালে প্রায়-অবাধ যৌনসম্পর্ক চালু থাকার ব্যাপারে এই তিনজন লেখকের যুক্তির বিরুদ্ধে জোরদার সওয়াল করেছেন মিঃ সি. স্ট্যানিল্যান্ড ওয়েক। ('অ্যান্‌থ্রোপলজিয়া', মার্চ ১৮৭৪, পৃঃ ১৯৭)। তাঁর মতে, সম্পর্কের শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থাকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়।

গরিলারা এবং কিছু আমেরিকান প্রজাতির বানররা, এবং প্রতিটি পরিবার আলাদা আলাদাভাবে বাস করে। তবে এই শেষোক্ত ক্ষেত্রেও একই অঞ্চলে বসবাসকারী পরিবারগুলোর মধ্যে এক ধরনের সামাজিক বন্ধন লক্ষ করা যায়, যেমন শিম্পাঞ্জিদের মাঝেমধ্যে বিশাল বিশাল দলে একত্রিত হয়ে ঘুরতে দেখা যায়। আবার অন্য কিছু প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীরা বহুগামী হলেও বেশ কিছু পুরুষ-প্রাণী তাদের নিজের নিজের স্ত্রী-প্রাণীদের নিয়ে দলবদ্ধভাবেই বাস করে। কয়েক প্রজাতির বেবুনদের মধ্যে এই ব্যাপারটা লক্ষ করা যায়।[৯] পুরুষ-চতুষ্পদদের পারস্পরিক ঈর্ষা আর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য তাদের অনেকের শরীরেই বিশেষ ধরনের হাতিয়ার থাকা—এই ভিত্তিতে বিচার করলে স্পষ্টতই মনে হয় যে প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকার সময় তাদের মধ্যে অবাধ যৌনসম্পর্ক চালু থাকা একেবারেই অসম্ভব। স্ত্রী-পুরুষের জোড়-বাঁধাটা হয়তো সারা জীবন টেকে না, একটি সন্তানের জন্মের পরই হয়তো জোড় ভেঙে যায়। কিন্তু তথাপি সবথেকে শক্তিশালী পুরুষ-প্রাণীরা, যারা তাদের স্ত্রী-প্রাণীদের এবং সন্তানদের রক্ষা করতে বা অন্যভাবে সাহায্য করতে সব থেকে বেশি সক্ষম, তারা যদি জোড় বাঁধার জন্য সবথেকে আকর্ষণীয় স্ত্রী-প্রাণীদের বেছে নিতে পারে, তাহলে সেটুকুই যৌন নির্বাচনের পক্ষে যথেষ্ট।

তাহলে, সময়ের গতিপথ অনুসরণ করে সুদূর প্রাচীনকালের দিকে তাকালে এবং মানুষের সামাজিক অভ্যাস-আচরণের ভিত্তিতে বিচার করলে সবথেকে সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত হিসেবে যা বেরিয়ে আসে তা হল : মানুষ প্রথমে ছোট ছোট দলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাস করত, প্রতিটি পুরুষের একজনই স্ত্রী থাকত অথবা পুরুষটি শক্তিশালী হলে থাকত কয়েকজন স্ত্রী, যাদেরকে অন্য পুরুষদের দখলদারি থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকত তারা। কিংবা হয়তো সেই পুরুষরা ঠিক সমাজবদ্ধ প্রাণী ছিল না, হয়তো গরিলাদের মতোই একজন পুরুষ কয়েকজন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বসবাস করত। কারণ সমস্ত আদিবাসীরাই 'স্বীকার করেছে যে প্রতিটা দলে মাত্র একজন করেই পূর্ণবয়স্ক পুরুষ থাকে। অল্পবয়সী পুরুষরা বড় হয়ে ওঠার পর দলের কর্তৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সেই দ্বন্দ্বে সবথেকে শক্তিশালী পুরুষটি অন্য পুরুষদের হত্যা করে কিংবা তাড়িয়ে দেয় এবং দলের নেতা হিসেবে নিজেকে নির্বাচিত করে।'[১০] দল থেকে বিতাড়িত অন্য অল্পবয়সী পুরুষরা

৯। ব্রেহ্‌ম্ ('Illust, Theirleben', খণ্ড ১, পৃঃ ৭৭) বলেছেন—সাইনোসেফ্যালাস হামাড্রিয়াস প্রজাতির বানররা বড় বড় দলে একত্রিত হয়ে বাস করে এবং এইসব দলে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ-প্রাণীদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণসংখ্যক পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী-প্রাণী থাকে। আমেরিকান বহুগামী প্রজাতির ব্যাপারে দ্রষ্টব্য রেঙ্গার-এর রচনা এবং আমেরিকান একগামী প্রজাতির ব্যাপারে দ্রষ্টব্য ওয়েন-এর গ্রন্থ ('অ্যানাটমি অফ ভার্টিব্রেটস', খণ্ড ৩, পৃঃ ৭৪৬)। এছাড়া অন্য আরও অনেকেও এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

১০। ডঃ স্যাভেজ, 'বোস্টন জার্নাল অফ ন্যাচরাল হিস্ট্রি', খণ্ড ৫, ১৮৪৫-৪৭, পৃঃ ৪২৩।

এদিক-সেদিক ঘুরতে শেষ পর্যন্ত হয়তো একজন সঙ্গিনী জোটাতে সক্ষম হয়, আর তার ফলে একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যৌনসম্পর্ক ও তা থেকে বংশবিস্তারের সম্ভাবনাও বহুলাংশে প্রতিহত হয়।

আজকের দিনের বর্বর জাতির মানুষদের কামলালসা অত্যন্ত বেশি এবং একসময় হয়তো তাদের মধ্যে দলগত বিবাহ ব্যাপকভাবেই চালু ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক গোষ্ঠীর মধ্যে কোনও-না-কোনও ধরনের বিবাহপদ্ধতি চালু আছে—অবশ্য সুসভ্য জাতিগুলোর তুলনায় সেইসব বিবাহপদ্ধতি অনেকটাই শিথিল ধরনের। একটু আগেই আমরা বলেছি যে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই গোষ্ঠীর প্রধান পুরুষরা বহুগামিতায় অভ্যস্ত। তা সত্ত্বেও বিকাশের একেবারে নিম্নতম অবস্থায় থাকা কিছু গোষ্ঠীর পুরুষদের পুরোপুরি একগামী হতেও দেখা যায়। সিংহলের ভেদ্দাদের মধ্যে এই ব্যাপারটা লক্ষ করা যায়। স্যর জে. লুবক লিখেছেন[১১]—ভেদ্দাদের চালু প্রবচন হল, 'একমাত্র মৃত্যুই পারে স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করতে।' ক্যান্ডির বাসিন্দারা বহুগামী হয়। সেখানকার জনৈক বুদ্ধিমান সর্দারের সম্বন্ধে 'প্রচুর কুৎসা রটেছিল, কারণ তিনি একেবারে বর্বরদের মতো মাত্র একজন স্ত্রীর সঙ্গেই বসবাস করতেন এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেনি।' তাঁর ভাষায়, ব্যাপারটা ছিল 'ঠিক ওয়ান্ডারু বানরদের মতো।' যে-সব বর্বর গোষ্ঠীর মধ্যে (তা তারা বহুগামী হোক কি একগামীই হোক) এখন কোনও-না-কোনও ধরনের বিবাহপদ্ধতি চালু আছে, তা তাদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই চালু আছে নাকি প্রথমে অবাধ যৌনসম্পর্কের পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর এইসব বিবাহপদ্ধতি চালু করেছে তারা—সে ব্যাপারে কোনও অনুমান করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকছি আমি।

শিশুহত্যা

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই প্রথাটা চালু আছে। সঙ্গত কারণেই বিশ্বাস করা যায় যে প্রাচীনকালে এই প্রথাটা আরও ব্যাপকভাবে চালু ছিল।[১২] নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের ভরণপোষণ করাটা বর্বরদের পক্ষে খুব সহজসাধ্য নয়, আর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই চালু হয়েছে এই শিশুহত্যার প্রথা। আজারা-র লেখা থেকে জানা যায়—প্রাচীনকালে দক্ষিণ আমেরিকার কিছু গোষ্ঠীর লোকেরা উভয় লিঙ্গেরই এত বেশি সংখ্যক শিশুকে হত্যা করেছিল যার ফলে তারা প্রায় বিলুপ্তির সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের নারীরা তাদের চার-পাঁচজন, এমনকী

১১। 'প্রিহিস্টোরিক টাইমস', ১৮৬৯, পৃঃ ৪২৪।

১২। মিঃ ম্যাক্‌লেনান, 'প্রিমিটিভ ম্যারেজ', ১৮৬৫। বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য বহির্বিবাহ ও শিশুহত্যা প্রসঙ্গে আলোচনা, পৃঃ ১৩০, ১৩৮, ১৬৫।

দশজন সন্তানকেও হত্যা করে থাকে। ওই দ্বীপপুঞ্জে এলিস এমন একজন নারীরও সন্ধান পাননি যে তার অন্তত একটি শিশুকেও হত্যা করেনি। শিশুহত্যার প্রথা চালু থাকলে টিকে থাকার সংগ্রামের তীব্রতা অনেক কমে যায়, তার ফলে গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যই তাদের অল্পসংখ্যক জীবিত সন্তানদের ভালোভাবে প্রতিপালন করার সুযোগ পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলে-শিশুদের তুলনায় মেয়ে-শিশুদেরই বেশি সংখ্যায় হত্যা করা হয়, কারণ ছেলে-শিশুরা বড় হয়ে গোষ্ঠীকে রক্ষা করতে এবং নিজেদের ভরণপোষণ নিজেরাই চালিয়ে নিতে পারবে বলে গোষ্ঠীর কাছে তাদেরই মূল্য বেশি। কিন্তু সন্তানদের লালনপালন করতে গিয়ে নারীদের নানান সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, তাদের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়, সংখ্যায় কম থাকলে নারীদের মর্যাদাও বেশি হয় আর তারা বেশি সুখেও থাকে—এইসব কারণ যে শিশুহত্যায় বাড়তি উৎসাহ জোগায় তা নারীরা নিজেরাও বলে এবং বিভিন্ন গবেষকও তা লক্ষ করেছেন। অস্ট্রেলিয়ায় মেয়ে-শিশু হত্যার রীতি আজও চালু আছে। স্যর জি. গ্রে হিসেব করে দেখেছেন, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে প্রতি তিনজন পুরুষ-পিছু একজন করে নারী আছে। আবার অন্য অনেকে বলেছেন প্রতি তিনজন পুরুষ-পিছু নারীর সংখ্যা দুই। ভারতের পূর্ব সীমান্তের একটি গ্রামে অনুসন্ধান চালিয়ে একটিও মেয়ে-শিশুর খোঁজ পাননি কর্নেল ম্যাক্‌কুলোক।[১৩]

মেয়ে-শিশু হত্যার ফলে কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে নারীদের সংখ্যা খুব কমে গেলে প্রতিবেশী গোষ্ঠীগুলো থেকে স্ত্রী-দখলের রীতিটা স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে। তবে, আমরা আগেই দেখেছি, স্যর জে. লুবক-এর মতে এই রীতি গড়ে ওঠার প্রধান কারণ দুটো : এক, প্রাচীনকালে গোষ্ঠীর মধ্যে দলগত বিবাহ চালু থাকা ; দুই, পরবর্তীকালে পুরুষরা অন্য গোষ্ঠী থেকে যে-সব নারীদের ছিনিয়ে আনত তাদেরকে নিজেদের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত করা। এর সঙ্গে আরও কিছু কারণও হয়তো যোগ করা যায়। যেমন, কোনও গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা খুব কম হলে তাদের মধ্যে বিবাহযোগ্য স্ত্রীলোকের ঘাটতি দেখা দিতেই পারে। প্রাচীনকালে এই রীতিটা যে ব্যাপকভাবেই চালু ছিল, এমনকী আজকের সুসভ্য জাতিগুলোর পূর্বপুরুষদের মধ্যেও, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় বেশ কিছু বিচিত্র প্রথা ও অনুষ্ঠানের আজও চালু থাকার মধ্যে। এইসব প্রথা ও অনুষ্ঠানের চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায় মিঃ ম্যাক্‌লেনান-এর রচনায়। একসময় অন্য গোষ্ঠী থেকে কোনও

১৩। ডঃ গার্ল্যান্ড ('Ueber das Aussterben der Naturvolker' ১৮৬৮) শিশুহত্যা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন, বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৭, ৫১, ৫৪। শিশুহত্যার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন আজারা ('ভয়েজেস', খণ্ড ২, পৃঃ ৯৪, ১১৬)। ভারতের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য ম্যাক্‌লেনান-এর লেখা (পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৯)।

নারীকে হরণ করে নিয়ে আসার সময় মুখ্য ভূমিকা নিত যে-পুরুষটি, আজকের দিনে আমাদের সমাজের কোনও নারীর বিবাহের ক্ষেত্রে 'সেরা পুরুষ'-টিও অনেকটা সেই ভূমিকাই পালন করে থাকে। যতদিন পর্যন্ত পুরুষরা বলপ্রয়োগ ও শঠতার সাহায্যে স্ত্রী-সংগ্রহ করত, ততদিন পর্যন্ত তারা যে-কোনও স্ত্রীলোককে দখল করতে পারলেই সন্তুষ্ট হত, ফলে অধিকতর আকর্ষণীয় নারীদের বেছে নেওয়ার কোনও অবকাশ তাদের থাকত না। কিন্তু যখন থেকে বিনিময়প্রথার মাধ্যমে কোনও-একটি বিশেষ গোষ্ঠী থেকে তাদের স্ত্রী-সংগ্রহের রীতি চালু হল (যা এখন বহু জায়গাতেই চালু আছে), তখন থেকে খুব স্বাভাবিকভাবেই অধিকতর আকর্ষণীয় নারীদের বেছে নিতে শুরু করল তারা। তবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এই অবিরাম আন্তঃমিশ্রণ, যা এই রীতিরই কোনও-না-কোনও রূপ থেকে চালু হয়েছিল, তা একই অঞ্চলে বসবাসকারী সমস্ত জনগোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নিশ্চয়ই প্রায় সমরূপ করে তুলেছিল আর তার ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক যৌন নির্বাচনের ক্ষমতাও নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

মেয়ে-শিশুহত্যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমাজে নারীদের সংখ্যা কমে যায়, আর তা থেকেই গড়ে ওঠে নারীদের বহুবিবাহ প্রথা। পৃথিবীর নানান জায়গায় আজও টিকে আছে এ-প্রথা এবং মিঃ ম্যাক্‌লেনানের মতে, একসময় পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই প্রথা চালু ছিল। তবে মিঃ ম্যাক্‌লেনানের এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন মিঃ মর্গ্যান এবং স্যর জে. লুবক।[১৪] দুই বা ততোধিক পুরুষ একটিমাত্র নারীকে বিবাহ করতে বাধ্য হলে ধরেই নেওয়া যায় যে সেই গোষ্ঠীর প্রতিটি নারীরই বিবাহ হবে এবং অধিকতর আকর্ষণীয় নারীদের বেছে নেওয়ার কোনও সুযোগ পুরুষদের থাকবে না। তবে এ-অবস্থায় নারীদের সামনে বেছে নেওয়ার সুযোগ অবশ্যই থাকবে এবং তারা অধিকতর আকর্ষণীয় পুরুষদেরই বেছে নেবে। যেমন, আজারা লিখেছেন, এক বা একাধিক পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার আগে প্রতিটা খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে বিস্তর টালবাহানা করে গুয়ানা নারীরা, ফলে পুরুষরা বাধ্য হয় নিজেদের চেহারা সম্পর্কে প্রচুর যত্ন নিতে। ভারতের টোডাদের মধ্যেও একই ব্যাপার লক্ষ করা যায়। টোডাদের মধ্যেও নারীদের বহুবিবাহ প্রথা চালু আছে। মেয়েরা ইচ্ছেমতো যে-কোনও পুরুষকে গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করতে পারে।[১৫] এইসব ক্ষেত্রে খুব কুৎসিতদর্শন

১৪। 'প্রিমিটিভ ম্যারেজ', পৃঃ ২০৮ ; স্যর জে. লুবক, 'অরিজিন অফ সিভিলাইজেশন', পৃঃ ১০০। প্রাচীনকালে নারীদের বহুবিবাহ সম্পর্কে আরও দ্রষ্টব্য—মিঃ মর্গ্যানের পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

১৫। আজারা, 'ভয়েজেস', খণ্ড ২, পৃঃ ৯২-৯৫ ; কর্নেল মার্শাল, 'আমঙ্গস্ট দ্য টোডাস', পৃঃ ২১২।

পুরুষদের পক্ষে স্ত্রী জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব, অনেকটা বেশি বয়সে হলেও হতে পারে। তবে এখানে একটা ব্যাপার লক্ষণীয় : সুদর্শন পুরুষরা স্ত্রী-সংগ্রহ করার ব্যাপারে বেশি সফল হলেও, নিজেদের সৌন্দর্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে একই নারীর কম সুদর্শন স্বামীদের চেয়ে বেশি সংখ্যক সন্তানসন্ততির জন্ম দিতে কিন্তু সক্ষম হয় না তারা।

বাল্যবিবাহ ও নারীদের দাসত্ব

অনেক বর্বর গোষ্ঠীর মধ্যেই নিতান্ত শিশু বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার রীতি চালু আছে। এর ফলে বর বা কনে কেউই অন্যের সৌন্দর্য বিচার করে তাকে বেছে নেওয়ার সুযোগ পায় না। তবে পরবর্তীকালে অধিকতর শক্তিশালী পুরুষরা অধিকতর আকর্ষণীয় নারীদের তাদের স্বামীদের কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে যেতে অথবা গায়ের জোরে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ায়, আমেরিকায় এবং আরও নানান জায়গায় এ-ঘটনা আকছারই ঘটে থাকে। অনেক বর্বর গোষ্ঠীর মধ্যে নারীদের নিছকই ক্রীতদাসী অথবা ভারবহনের জন্তু বলে মনে করা হয়। এক্ষেত্রেও যৌন নির্বাচনের ব্যাপারে প্রায় একই ফলাফল দেখা দিতে বাধ্য। তবে পুরুষরা সর্বদাই তাদের নিজেদের সৌন্দর্যবোধ অনুযায়ী সবথেকে সুন্দরী ক্রীতদাসীটিকেই বেছে নেয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বর্বর সমাজের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা যৌন নির্বাচনের কার্যকলাপকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে কিংবা একেবারেই রুদ্ধ করে দেয়। অন্যদিকে, বর্বররা জীবনের যে-অবস্থার মধ্যে বসবাস করে সেই অবস্থাটা এবং তাদের কতকগুলো অভ্যাস প্রাকৃতিক নির্বাচনের পক্ষে যথেষ্টই অনুকূল। এই ব্যাপারটা একইসঙ্গে যৌন নির্বাচনের ব্যাপারেও সক্রিয় হয়ে ওঠে। বর্বররা প্রায়শই মারাত্মক দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। কৃত্রিম উপায়ে নিজেদের খাদ্য বাড়ানোর চেষ্টা করে না তারা। বিবাহ করতেও তারা প্রায় কখনও নিরস্ত হয় না[১৬] এবং সাধারণত অল্পবয়সেই বিবাহ করে থাকে। এই সবকিছুর ফলে টিকে থাকার জন্য মাঝেমাঝেই কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয় তাদের আর সেই সংগ্রামে শুধুমাত্র অধিকতর সুবিধাবিশিষ্ট মানুষরাই টিকে থাকে।

বহু প্রাচীন কালে, মানুষ তার বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হওয়ার আগে, তার অনেক

১৬। বুর্শেল বলেছেন (ট্র্যাভ্‌ল্‌স্ ইন সাউথ আফ্রিকা, খণ্ড ২, ১৮২৪, পৃঃ ৫৮)—দক্ষিণ আফ্রিকার বন্য জাতিগুলোর কোনও নারী বা কোনও পুরুষই অবিবাহিত থাকে না। দক্ষিণ আমেরিকার বন্য দশার ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কেও প্রায় একই কথা বলেছেন আজারা ('Voyages dans l' Amerique Merid', খণ্ড ২, ১৮০৯, পৃঃ ২১)।

কিছুই আজকের দিনের বর্বরদের থেকে আলাদা ছিল। নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের নজির মনে রেখে বলা যায়—সেই অবস্থায় মানুষ হয় একটিমাত্র নারীকে নিয়েই থাকত অথবা বহুগামী ছিল। সবথেকে শক্তিশালী আর সবথেকে সক্ষম পুরুষরাই সবথেকে আকর্ষণীয় নারীদের লাভ করতে বেশি সফল হত। জীবনধারণের দৈনন্দিন সংগ্রামেও তারা সবথেকে বেশি সফল হত, সেইসঙ্গেই নিজের নারীদের আর সন্তানদের সব ধরনের শত্রুদের হাত থেকে সবথেকে ভালোভাবে রক্ষাও করতে পারত। সেই আদিম অবস্থায় ভবিষ্যতের অনিশ্চিত সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার মতো বুদ্ধিমত্তা নিশ্চয়ই মানুষের পূর্বপুরুষদের ছিল না। সেই অবস্থায় তারা নিশ্চয়ই ভেবে উঠতে পারত না যে তাদের সমস্ত সন্তানদের, বিশেষত কন্যা-সন্তানদের, বড় করে তোলাটা গোষ্ঠীর জীবনসংগ্রামকে আরও কঠিন করে তুলবে। আজকের দিনের বর্বরদের তুলনায় অনেক বেশি করে তারা পরিচালিত হত সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে, যুক্তির তেমন কোনও প্রভাব তাদের জীবনে ছিল না। অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সহজাত প্রবৃত্তি, নিম্নস্তরের সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই যার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়, তা তখনও পর্যন্ত তাদের মধ্যে পুরোপুরিভাবেই টিকে ছিল—অপত্যস্নেহ। এই অপত্যস্নেহের ফলেই তারা কন্যা-সন্তানদের হত্যা করত না। এর ফল হিসেবে সমাজে নারীদের অপ্রতুলতা দেখা দিতে পারেনি এবং নারীদের বহুবিবাহের প্রথাও চালু হয়নি। এই কথাটা যে আমরা বলতে পারছি তার কারণ হল—নারীদের অপ্রতুলতা ছাড়া এমন আর কোনও কারণ নেই যা ঈর্ষার মতো এক স্বাভাবিক ও সর্বত্র বিদ্যমান অনুভূতিকে হঠিয়ে দিতে পারে এবং একজন নারীকে একান্ত নিজের করে পাওয়ার ব্যাপারে পুরুষদের আকাঙ্ক্ষাকে দমন করতে পারে। নারীদের বহুবিবাহ ছিল দলগত বিবাহের দিকে বা প্রায়-অবাধ যৌনসম্পর্কের দিকে এগোনোর একটা ধাপ, যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে নারীদের বহুবিবাহ-প্রথা চালু হওয়ার আগেই চালু ছিল দলগত বিবাহ বা প্রায়-অবাধ যৌনসম্পর্ক। একেবারে আদিম যুগে বাল্যবিবাহ চালু থাকা সম্ভব ছিল না, কারণ বাল্যবিবাহ চালু করার জন্য প্রয়োজন হয় দূরদর্শিতার। নারীদের নিছক প্রয়োজনীয় ক্রীতদাসী কিংবা ভারবাহী জন্তু হিসেবে দেখাটাও সে-যুগে সম্ভবপর ছিল না। সে-যুগে নারীপুরুষ উভয়েরই নিজেদের সঙ্গী-সঙ্গিনী নির্বাচনের অধিকার থেকে থাকলে নির্বাচনের মাপকাঠি হিসেবে নারী-পুরুষ কেউই মানসিক গুণ বা সম্পত্তি বা সামাজিক অবস্থানকে গুরুত্ব দিত না, নির্বাচনের মাপকাঠি হিসেবে কাজ করত শুধুমাত্র বাহ্যিক চেহারাই। প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীই বিবাহ করত বা জোড় বাঁধত এবং প্রতিটি সন্তানকেই যথাসম্ভব লালনপালন করা হত। ফলে টিকে থাকার সংগ্রামটা মাঝেমাঝেই অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠত। আর সেই কারণেই ওই সময়ে যৌন নির্বাচনের যাবতীয় শর্তগুলো পরবর্তী

পর্যায়ের থেকে অনেক বেশি অনুকূল ছিল, কারণ পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের বুদ্ধিমত্তা উন্নত হয়ে উঠলেও তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলো হীনবল হয়ে পড়েছিল। তাই বলা চলে, মানুষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে এবং মানুষের সঙ্গে উচ্চতর শ্রেণীর চতুষ্পদ প্রাণীদের পার্থক্য সৃষ্টির ব্যাপারে যৌন নির্বাচনের যে-ভূমিকাই থেকে থাক, সেই ভূমিকা আজকের দিনের চেয়ে সুদূর অতীতে অনেক বেশি জোরদার ছিল—তবে আজও সে-ভূমিকা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি বোধহয়।

মানুষের ক্ষেত্রে যৌন নির্বাচনের কার্যপদ্ধতি

যে-অনুকূল অবস্থাগুলোর কথা এইমাত্র বলা হল, সেই অবস্থায় আদিম কালের মানুষদের ক্ষেত্রে এবং আজকের দিনের যে-সব বর্বর মানুষরা কোনও-না-কোনও ধরনের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় তাদের ক্ষেত্রে যৌন নির্বাচন খুব সম্ভবত নিম্নলিখিত পদ্ধতিতেই কাজ করেছে (মেয়ে-শিশু হত্যা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি ঘটনাগুলো যে যৌন নির্বাচনের পথে কমবেশি বাধা সৃষ্টি করেছে, তা বলাই বাহুল্য)। সবথেকে শক্তিশালী ও সবথেকে প্রাণবন্ত পুরুষরা, যারা তাদের পরিবারকে সবথেকে ভালোভাবে রক্ষা করতে ও সবথেকে ভালো শিকার সংগ্রহ করতে পারত, যাদের আয়ত্তে ছিল সর্বোত্তম অস্ত্র আর সর্বাধিক পরিমাণ সম্পত্তি (যেমন, প্রচুর কুকুর বা অন্য জীবজন্তু)—তারা তাদের একই গোষ্ঠীর দুর্বলতর ও দরিদ্রতর সদস্যদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক সন্তানকে বড় করে তুলতে পারত। আর এই ধরনের পুরুষরাই যে অধিকতর আকর্ষণীয় নারীদের বেছে নিতে সক্ষম হবে, সে-কথাও নিঃসংশয়েই বলা চলে। বর্তমানে সারা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি গোষ্ঠীর প্রধানরাই নিজেদের জন্যে একাধিক স্ত্রী যোগাড় করতে পারে। মিঃ ম্যান্‌টেল আমাকে জানিয়েছেন—কিছুদিন আগে পর্যন্তও নিউজিল্যান্ডের প্রায় প্রতিটি সুন্দরী কিংবা সম্ভাব্য-সুন্দরী নারীকেই গোষ্ঠীর প্রধানরা স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারত। কাফিরদের সম্বন্ধে মিঃ হ্যামিল্‌টন লিখেছেন,[১৭] 'বহু মাইল ব্যাপী চৌহদ্দির মধ্যে থেকে যে-কোনও নারীকেই বেছে নিতে পারে প্রধানরা এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা বা তাকে দৃঢ়তর করার ব্যাপারে রীতিমতো তৎপর থাকে তারা।' আমরা দেখেছি যে প্রতিটি জাতিরই সৌন্দর্যবোধের নিজস্ব মাপকাঠি আছে। আমরা এ-ও জানি যে নিজেদের গৃহপালিত জীবজন্তু, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার আর বাহ্যিক চেহারার যে-কোনও বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকের চেয়ে একটু উন্নত হলেই সেটাকে খুব প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখাটা মানুষের স্বভাব। উপরোক্ত বক্তব্যগুলোকে সত্য বলে মেনে নিলে (সত্য বলে মেনে না-নেওয়ার কোনও কারণ আছে বলে আমার অন্তত মনে হয় না) আমরা বলতে

১৭। 'অ্যানথ্রোপলজিক্যাল রিভিউ', জানুয়ারি ১৮৭০, পৃঃ ১৬।

পারি—প্রতিটি গোষ্ঠীর অধিকতর আকর্ষণীয় নারীদের অধিকতর শক্তিশালী পুরুষরা (যারা গড়ে অনেক বেশি সংখ্যক সন্তানকে ভালোভাবে বড় করে তুলতে সক্ষম) নিজেদের স্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়ার বহু প্রজন্ম পরেও যদি গোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কোনও পরিবর্তন না ঘটে থাকে, তাহলে থাকে নিতান্তই আশ্চর্য ও দুর্বোধ্য ব্যাপার হিসেবে চিহ্নিত করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না।

কোনও দেশে যখন বিদেশি কোনও গৃহপালিত পশুর বংশবিস্তার ঘটানো হয় কিংবা যখন স্বদেশি কোনও গৃহপালিত পশুকে ব্যবহার করার জন্য বা শোভাবর্ধনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে সযত্নে লালনপালন করা হয়, তখন বেশ কয়েক প্রজন্ম পর দেখা যায় তাদের মধ্যে কিছু-না-কিছু পরিবর্তন ঘটেইছে (সেই প্রজাতির অন্য পশুদের সঙ্গে তুলনা করলেই পরিবর্তনটা লক্ষ করা যায়)। বহু প্রজন্ম ধরে অসচেতন নির্বাচনের ফলেই এটা ঘটে, অর্থাৎ সবথেকে উৎকৃষ্ট প্রাণীরাই সংরক্ষিত হয় এবং তার পেছনে পশুপালনের আকাঙ্ক্ষা বা প্রত্যাশার কোনও ভূমিকা থাকে না। আবার, দু'জন যত্নশীল পশুপালক যদি বেশ কিছু বছর ধরে একই প্রজাতির কিছু প্রাণীকে আলাদা আলাদা ভাবে লালনপালন করে এবং কখনোই তাদের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা কিংবা কোনও সাধারণ মানদণ্ডের সাহায্যে তাদের তুলনা না করে, তাহলে বেশ কিছু বছর পরে দেখা যাবে এবং দেখে তাদের মালিকরা বিস্মিত হবে যে প্রাণীগুলির মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য দেখা দিয়েছে।[১৮] ফন নাথুসিয়াস বলেছেন—প্রত্যেক পশুপালকই তার নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর, তার নিজস্ব রুচিবোধ আর বিচার-বিবেচনার, ছাপ রেখে দেয় তার পোষা প্রাণীদের ওপর। তাহলে, প্রত্যেক গোষ্ঠীর যে-সব পুরুষরা সবথেকে বেশি সংখ্যক সন্তানকে বড় করে তুলতে সক্ষম, তারা বহু প্রজন্ম ধরে গোষ্ঠীর সবথেকে আকর্ষণীয় নারীদের স্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়ে থাকলে তার ফলই বা একইরকম হবে না কেন? একেই বলা হয় অসচেতন নির্বাচন, যেখানে পুরুষরা এই ধরনের কোনও আকাঙ্ক্ষা বা প্রত্যাশা ছাড়াই বিশেষ কিছু নারীকে বেছে নেয় আর তার ফলে তাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবেই ভবিষ্যতের পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত হয়।

ধরা যাক কোনও-একটা গোষ্ঠীর সদস্যরা, যাদের মধ্যে কোনও-না-কোনও ধরনের বিবাহপ্রথা চালু আছে, এক জনবসতিহীন মহাদেশে বসবাস করতে গেল। দেখা যাবে কিছুদিনের মধ্যেই তারা আলাদা আলাদা দলে ভাগ হয়ে গেছে, পরস্পরের মধ্যে দেখা দিয়েছে নানান প্রতিবন্ধক এবং বর্বর জাতিগুলোর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয়ে গেছে তাদের মধ্যে। এইভাবে দলগুলো গিয়ে

১৮। 'দ্য ভ্যারিয়েশন অফ অ্যানিম্যালস অ্যান্ড প্ল্যান্টস আন্ডার ডোমেস্টিকেশন', খণ্ড ২, পৃঃ ২১০-২১৭।

পড়বে জীবনের কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও অভ্যাসের মধ্যে এবং তার ফলে একসময় তাদের পরস্পরের মধ্যে কিছু পার্থক্যও দেখা দেবে। এই পার্থক্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিটি গোষ্ঠীর মধ্যে গড়ে উঠবে সৌন্দর্যের ঈষৎ ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠি।[১৯] তারপর, অধিকতর শক্তিশালী ও বিশিষ্ট পুরুষরা যখন থেকে কিছু নারীকে ছেড়ে অন্য কিছু নারীকে বেছে নিতে শুরু করবে, তখন থেকেই সক্রিয় হয়ে উঠবে অসচেতন নির্বাচন। এই প্রক্রিয়া চলতে চলতে যা ঘটবে তা হল—বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেকার যে-পার্থক্যগুলো একসময় নিতান্তই সামান্য ছিল, সেগুলো একটু একটু করে এবং অনিবার্যভাবেই বেড়ে উঠবে।

প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকা পুরুষ-প্রাণীদের অনেক বৈশিষ্ট্যই, যেমন আকার, শক্তি, বিশেষ অস্ত্র, সাহস আর যুদ্ধপ্রিয়তা, অর্জিত হয়েছে যুদ্ধনীতির পথ বেয়ে। মানুষের অর্ধ-মানব পূর্বপুরুষরা, তাদের সঙ্গে নিকট সাদৃশ্যযুক্ত উন্নত শ্রেণীর বানরদের মতো, অবশ্যই এইভাবে পরিবর্তিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। আর বর্বররা আজও নারীদের দখল করার জন্য নিজেদের মধ্যে লড়াই করে বলে নির্বাচনের একই ধরনের একটা প্রক্রিয়া তাদের মধ্যে কম-বেশি মাত্রায় আজও চালু আছে বলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে। নিম্নতর শ্রেণীর পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে অন্য যে-সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, যেমন উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ এবং নানারকম অঙ্গসজ্জা, সেগুলোও অধিকতর আকর্ষণীয় পুরুষ-প্রাণীরা অর্জন করেছিল স্ত্রী-প্রাণীরা তাদের বেছে নেওয়ার ফলেই। তবে দু'-একটা ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার বদলে নিজেরাই নির্বাচকের ভূমিকা পালন করে থাকে। এইসব ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রাণীদের তুলনায় স্ত্রী-প্রাণীদেরই অঙ্গসজ্জা বেশি থাকে—অর্থাৎ তাদের এই অঙ্গসজ্জাগত বৈশিষ্ট্যটা শুধুমাত্র অথবা প্রধানত তাদের স্ত্রী-সন্তানদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়। মানুষ যে-বর্গের অন্তর্গত সেই বর্গের মধ্যে, অর্থাৎ রিসাস বানরদের মধ্যে, এই ব্যাপারটা লক্ষ করা যায়।

পুরুষমানুষের শরীর ও মনের জোর নারীদের থেকে বেশি হয়। অন্য যে-কোনও শ্রেণীর পুরুষ-প্রাণীদের থেকে বর্বর দশার পুরুষমানুষরা তাদের নারীদের অনেক কঠোরতর দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। অতএব এর ফলে তারা যে নিজেদের স্ত্রী-নির্বাচনের ক্ষমতা অর্জন করবে, তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। সব জায়গায় নারীরাই নিজেদের সৌন্দর্যের মূল্য সম্বন্ধে রীতিমতো সচেতন হয়। উপায় থাকলে তারা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি উপকরণে সাজিয়ে তোলে নিজেদের। অঙ্গসজ্জা

১৯। রাফায়েল, রুবেন্স এবং আধুনিক ফরাসি চিত্রশিল্পীদের ছবির তুলনা করে জনৈক লেখক বলেছেন যে এমনকী ইউরোপের সর্বত্রও সৌন্দর্যের ধারণা হুবহু এক নয়। দ্রষ্টব্য, 'লাইভ্‌স্ অফ হেড্‌ন্ অ্যান্ড মোৎজার্ট', লেখক বম্বেট (অথবা এম. বেইলি), ইংরেজি অনুবাদ, পৃঃ ২৭৮।

হিসেবে পুরুষ-পাখির পালক ব্যবহার করে তারা, যে-পালক প্রকৃতি পুরুষ-পাখিদের দিয়েছে স্ত্রী-পাখিদের আকৃষ্ট করার জন্য। যেহেতু বহু বছর ধরে নারীরা তাদের সৌন্দর্যের সূত্রেই পুরুষদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এসেছে, সেহেতু তাদের কিছু কিছু পরিবর্তন শুধুমাত্র তাদের নারী-সন্তানদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়ে থাকলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এরই ফলে তাদের সৌন্দর্যও তাদের পুরুষ-সন্তানদের তুলনায় নারী-সন্তানদের মধ্যেই বেশি মাত্রায় সঞ্চারিত হয়েছে, এবং, প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, পুরুষদের থেকে নারীরা সুন্দরতর হয়ে উঠেছে। তবে নারীরা নিঃসন্দেহেই সৌন্দর্য-সহ তাদের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য তাদের উভয় লিঙ্গের সন্তানদের মধ্যেই সঞ্চারিত করে থাকে। এর ফলে যা ঘটেছে তা হল—প্রত্যেক জাতির পুরুষরা বরাবরই তাদের নিজেদের রুচিবোধ অনুযায়ী অধিকতর আকর্ষণীয় নারীদের বেছে নিয়েছে আর তাতে করে সেই জাতির উভয় লিঙ্গের সমস্ত সদস্যরা একই ধারায় পরিবর্তিত হয়েছে।

এবার যৌন নির্বাচনের অন্য রূপটির কথায় (যে-রূপটি নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে হামেশাই চোখে পড়ে) অর্থাৎ নারীদের দ্বারা পুরুষদের বেছে নেওয়ার কথায় আসা যাক, যেখানে নারীরা শুধুমাত্র সেইসব পুরুষদেরই বেছে নেয় যারা তাদেরকে সবথেকে বেশি উত্তেজিত বা আকৃষ্ট করে। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে একসময় এই ব্যাপারটা চালু ছিল বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। পুরুষরা তাদের মুখের দাড়ি এবং আরও কিছু বৈশিষ্ট্য খুব সম্ভবত উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে তাদের কোনও সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষের কাছ থেকে, যে এই দাড়ি অর্জন করেছিল অঙ্গলজ্জা হিসেবে। তবে এই ধরনের নির্বাচন পরবর্তীকালেও মাঝেমধ্যে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে থাকতে পারে, কারণ চরম বর্বর গোষ্ঠীগুলোতে নিজেদের প্রেমিক বাছাই করা, তাকে প্রত্যাখ্যান করা ও প্রলুব্ধ করার ব্যাপারে অথবা পরবর্তীকালে স্বামী পরিবর্তনের ব্যাপারে নারীদের যতটা স্বাধীনতা থাকা প্রত্যাশিত ছিল, তার থেকে অনেক বেশি স্বাধীনতা উপভোগ করে তারা। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে এ-ব্যাপারে আমার সাধ্যমতো কিছু তথ্যপ্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করছি।

আমেরিকার মেরু অঞ্চলের একটি গোষ্ঠীর জনৈক নারী কীভাবে তার স্বামীর কাছ থেকে বারবার পালিয়ে গিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হত, তার বিবরণ দিয়েছেন হার্নে। আজারা জানিয়েছেন—দক্ষিণ আমেরিকার চারুয়া-দের মধ্যে ইচ্ছেমতো বিবাহবিচ্ছেদের রীতি চালু আছে। আবিপোন গোষ্ঠীর পুরুষরা স্ত্রী হিসেবে কোনও নারীকে বাছাই করার পর দাম বা কনে-পণের ব্যাপার নিয়ে পাত্রীর বাবা-মার সঙ্গে দর-কষাকষি করে। কিন্তু 'পাত্রীটি প্রায়শই তার বাবা-মা আর পাত্রের মধ্যে হওয়া চুক্তিকে বাতিল করে দেয়, বিয়ে শব্দটা উল্লেখ করলেও তীব্র আপত্তি জানায়।'

অনেক সময় সে পালিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকে এবং এইভাবে ওই পাত্রটিকে এড়িয়ে যায়। ক্যাপ্টেন মুস্টার্স বেশ কিছুদিন পাটাগোনিয়ানদের মধ্যে বসবাস করেছিলেন। তিনি বলেছেন যে এদের বিয়ে সবসময়েই পাত্রপাত্রীর নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ঠিক হয়। 'মেয়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাবা-মা তার বিয়ের কোনও সম্বন্ধ করলে মেয়েটি তা বাতিল করে দেয় এবং এ-ব্যাপারে তাকে জোর করে রাজি করানো যায় না।' টিয়েরা দেল ফুয়েগো-র যুবকরা তাদের পছন্দের পাত্রীটির বাবা-মার কিছু কাজকর্ম করে দিয়ে তাদের সম্মতি আদায় করে নেয়, তারপর চেষ্টা করে মেয়েটির মন জয় করতে। 'কিন্তু মেয়েটির যদি ইচ্ছে না থাকে তাহলে সে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে এবং তার পাণিপ্রার্থীটি তাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে হাল ছেড়ে না-দেওয়া পর্যন্ত লুকিয়েই থাকে। তবে এ-রকম ঘটনা কদাচিৎই ঘটে।' ফিজি দ্বীপপুঞ্জের পুরুষরা তাদের আকাঙ্ক্ষিত স্ত্রীটিকে সত্যিকারের অথবা সাজানো বলপ্রয়োগের সাহায্যে অপহরণ করে। কিন্তু 'এই বিয়েতে মেয়েটির যদি আপত্তি থাকে, তাহলে অপহরণকারীর বাড়িতে পৌঁছনোর পর সে পালিয়ে গিয়ে এমন কারও কাছে আশ্রয় নেয় যে তাকে রক্ষা করতে পারবে। তবে মেয়েটির আপত্তি না থাকলে বিয়েটা তৎক্ষণাৎই হয়ে যায়।' কল্‌মাক্‌দের ক্ষেত্রে বর আর কনের মধ্যে একটা রীতিমতো দৌড়প্রতিযোগিতা হয়। কনেটিই আগে ছুটতে শুরু করে। ক্লার্ক 'নিশ্চিত ছিলেন যে কোনও ক্ষেত্রেই বরটি কনেটিকে ধরতে পারে না, যদি না কনেটি তার অনুসরণকারীর প্রতি পক্ষপাতবশত স্বেচ্ছায় কৌশলে ধরা দেয়।' মালয় দ্বীপপুঞ্জের বন্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও এইরকম দৌড়-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মঁসিয়ে বুরিয়েঁ-র বিবরণের ভিত্তিতে স্যর জে. লুবক মন্তব্য করেছেন যে, "এই প্রতিযোগিতাটা 'দ্রুতগতির পরীক্ষাও নয়, শক্তির লড়াইও নয়', এ-প্রতিযোগিতা হল নিজের আকাঙ্ক্ষিত পাত্রীটিকে খুশি করার জন্য যুবকদের আন্তরিক প্রয়াস।" উত্তর-পূর্ব এশিয়ার কোরাক্‌দের মধ্যেও ঠিক একইরকম রীতি চালু আছে এবং তাদের ক্ষেত্রেও এই প্রতিযোগিতার ফলাফল একই ঘটে থাকে।

এবার একটু আফ্রিকার দিকে তাকানো যাক। কাফিররা তাদের স্ত্রীদের কিনে আনে। কোনও মেয়ে তার জন্য নির্বাচিত পাত্রকে বিয়ে করতে না চাইলে তাদের বাবারা তাদের প্রচণ্ড মারধর করে। তবে, রেভারেন্ড মিঃ শুটার-এর লেখা থেকে মনে হয় যে পাত্র বাছাইয়ের ব্যাপারে মেয়েদের যথেষ্টই ক্ষমতা থাকে। ধনী কিন্তু কুৎসিত পুরুষের বরাতে কোনও স্ত্রী জোটেনি, এমন ঘটনার কথাও জানা গেছে। বাগ্‌দানের আগে মেয়েরা সম্ভাব্য পাত্রটিকে বাধ্য করে প্রথমে তাদের সামনের দিকটা দেখাতে, তারপর পেছনদিকটা, অতঃপর 'হেঁটে-চলেও দেখাতে হয় পাত্রদের।' মেয়েরা প্রায়শই কোনও পুরুষকে প্রেমনিবেদন করে, প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার

ঘটনাও আকছারই ঘটে। মিঃ লেস্‌লি, যিনি কাফিরদের খুব ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন, বলেছেন, 'যেভাবে কোনও গরুকে বিক্রি করা হয়, ঠিক সেইভাবেই এবং সেইরকম কর্তৃত্ব নিয়েই বাবারা তাদের মেয়েদের বিক্রি করে দেয়—এটা ধরে নিলে মস্ত বড় ভুল করা হবে।' দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যানদের মধ্যে 'বাগ্‌দানের আগেই কোনও মেয়ে নারীত্বে উপনীত হলে (যা খুব বেশি ঘটে না) তার প্রেমিককে প্রথমে তার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়, সেইসঙ্গে তার মা-বাবার অনুমতিও নিতে হয়।'[২০] পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে আমার হয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে মিঃ উইনউড রিড দেখেছেন যে, 'মেয়েরা, বিশেষত অধিকতর বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন পেগান (Pagan) গোষ্ঠীগুলোর মেয়েরা, স্বচ্ছন্দেই তাদের পছন্দের পুরুষকে বিয়ে করতে পারে—তবে মেয়েদের পক্ষ থেকে পুরুষদের কাছে যেচে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়াটাকে মেয়েদের পক্ষে অশোভন ব্যাপার বলে মনে করা হয়। মেয়েরা স্বচ্ছন্দেই কারও প্রেমে পড়তে পারে। কোমল, আবেগময় ও বিশ্বস্ত সম্পর্ক গড়ে তুলতেও তাদের কোনও অসুবিধে হয় না।' এ-রকম আরও অনেক উদাহরণই পেশ করা যায়।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিয়ের ব্যাপারে বন্য গোষ্ঠীগুলোর নারীদের অবস্থাকে যতটা শোচনীয় বলে মনে করা হয়, ততটা শোচনীয় অবস্থা তাদের নয়। পছন্দের পুরুষটিকে তারা প্রলুব্ধও করতে পারে আবার অপছন্দের পুরুষকে প্রত্যাখ্যানও করতে পারে, এবং এই দু'টো ব্যাপারই বিয়ের আগে বা পরে উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নারীদের পছন্দ কোনও বিশেষ ধারায় চলতে থাকলে একসময় তা সমগ্র গোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে। কারণ নিজেরা বাছাই করার সুযোগ পেলে নারীরা তাদের রুচিবোধ অনুযায়ী সবথেকে সুন্দর পুরুষদেরই যে শুধু বেছে নেবে এমন নয়, বরং তারা বেছে নেবার চেষ্টা এমন পুরুষদেরই যারা সুন্দর হওয়ার পাশাপাশি তাদের রক্ষা করতে ও ভরণপোষণ করতেও সমর্থ। এই ধরনের

২০। আজারা, 'ভয়েজেস', খণ্ড ২, পৃঃ ২৩। দব্রিজ্‌হফার, 'অ্যান অ্যাকাউন্টস অফ দ্য আবিপোন্‌স্', খণ্ড ১, ১৮২২, পৃঃ ২০৭। ক্যাপ্টেন মুস্টার্স-এর লেখা, 'প্রসিডিংস অফ রয়্যাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি', খণ্ড ১৫, পৃঃ ৪৭। ফিজি দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের সম্বন্ধে উইলিয়ামের লেখা লুবক কর্তৃক উদ্ধৃত 'অরিজিন অফ সিভিলাইজেশন', ১৮৭০, পৃঃ ৭৯। ফুজিয়ানদের প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, কিং এবং ফিৎজ্‌রয়, 'ভয়েজেস অফ দ্য অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড বিগল্', খণ্ড ২, ১৮৩৯, পৃঃ ১৮২। কল্‌মাক্‌দের প্রসঙ্গে বক্তব্য ম্যাক্‌লেনান কর্তৃক উদ্ধৃত, 'প্রিমিটিভ ম্যারেজ', ১৮৬৫, পৃঃ ৩২। মালয়ের বাসিন্দাদের প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য—লুবক, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৬। রেভারেন্ড জে. শুটার, 'অন দ্য কাফিরস অফ নাটাল', ১৮৫৭, পৃঃ ৫২-৬০। মিঃ ডি. লেসলি, 'কাফির ক্যারেক্‌টার অ্যান্ড কাস্টম্‌স্', ১৮৭১, পৃঃ ৪। বুশম্যানদের প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, বুর্শেল, 'ট্র্যাভ্‌ল্‌স্ ইন সাউথ আফ্রিকা', খণ্ড ২, ১৮২৪, পৃঃ ৫৯। কোরাক্‌দের প্রসঙ্গে ম্যাক্‌লেনান-এর বক্তব্য, মিঃ ওয়েক্ কর্তৃক উদ্ধৃত, 'অ্যান্থ্রোপলজিয়া', অক্টোবর ১৮৭৩, পৃঃ ৭৫।

শারীরিক-মানসিক সুবিধাবিশিষ্ট দম্পতিরা স্বাভাবিকভাবেই কম সুবিধাসম্পন্ন দম্পতিদের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক সন্তানকে বড় করে তুলতে সক্ষম হবে। বাছাই করার ব্যাপারটা যদি নারী-পুরুষ উভয়ের তরফ থেকেই চালু থাকে, অর্থাৎ যদি অধিকতর আকর্ষণীয় ও সেইসঙ্গে অধিকতর শক্তিশালী পুরুষরা অধিকতর আকর্ষণীয় নারীদের বেছে নিতে পারে এবং অধিকতর আকর্ষণীয় নারীরাও যদি ওই ধরনের পুরুষদের বেছে নিতে পারে, তাহলেও ফলাফল একই ঘটবে, তবে সেক্ষেত্রে ফলাফলটা আরও বেশি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে দেখা দেবে। মানবসমাজের ইতিহাসে, বিশেষত তার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে, এই দ্বিমুখী নির্বাচন চালু ছিল বলে ধরে নেওয়ার সঙ্গত কারণ আছে।

যে-সব বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষের বিভিন্ন জাতিকে পরস্পরের থেকে এবং নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের থেকে পৃথক করে রেখেছে, তার মধ্যে দু'টো বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটু খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করা যাক। এই বৈশিষ্ট্য দু'টো হল শরীরে রোম বা চুলের কম-বেশি অভাব এবং চামড়ার রঙ। বিভিন্ন জাতির মানুষদের নাক-মুখ এবং করোটির আকারের মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য থাকে, সে সম্পর্কে আর কিছু বলার দরকার আছে বলে মনে হয় না, কারণ পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি এইসব ব্যাপারে বিভিন্ন জাতির সৌন্দর্যের মাপকাঠি কতটা আলাদা হয়ে থাকে। সম্ভবত এই বৈশিষ্ট্যগুলো যৌন নির্বাচন মারফতই অর্জিত হয়েছিল, তবে তা প্রধানত পুরুষদের দিক থেকে হয়েছিল নাকি নারীদের দিক থেকে, তা বলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। মানুষের সাঙ্গীতিক ক্ষমতা নিয়েও আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

শরীরে রোম বা চুলের অভাব এবং মুখে ও মাথায় তার বৃদ্ধি

মানবশিশুর ভ্রূণে পশমের মতো রোম বা লানুগো (lanugo) থাকে এবং বয়ঃসন্ধির সময় থেকে তার শরীরের নানান জায়গায় ছোট ছোট রোম দেখা দিতে শুরু করে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে মানুষ এমন কোনও প্রাণী থেকেই উদ্ভূত হয়েছে যারা রোমাবৃত অবস্থাতেই জন্মাত এবং সারা জীবনই তাদের শরীর রোমাবৃত থাকত। শরীর থেকে রোম হারিয়ে যাওয়াটা মানুষের পক্ষে অসুবিধাজনক এবং খুব সম্ভবত ক্ষতিকরও হয়েছে, এমনকী উষ্ণ জলবায়ুর অঞ্চলেও, কেননা এর ফলে প্রচণ্ড রোদ কিংবা আকস্মিক শৈত্যের সামনে, বিশেষত বৃষ্টিবাদলার সময়, অসহায় হয়ে পড়তে হয়েছে তাকে। মিঃ ওয়ালেস বলেছেন—সব দেশেরই আদিবাসীরা তাদের নগ্ন পিঠ আর অনাবৃত কাঁধকে কোনও পাতলা আচ্ছাদনে আবৃত করতে ভালবাসে। ত্বকের রোমশূন্যতা যে মানুষের পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছে, এমন কথা কেউই বলবেন না। অতএব আমরা ধরেই নিতে পারি যে তার শরীরের এই রোমশূন্যতা

প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত ঘটেনি।[২১] পূর্ববর্তী একটি পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়েছি যে তার শরীরের এই রোমশূন্যতাকে জলবায়ুর প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে কিংবা পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত বিকাশের ফলাফল হিসেবে প্রতিপন্ন করার মতো কোনও প্রমাণও আমাদের হাতে নেই।

শরীরের রোমের অভাব এক ধরনের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্য, কেননা, পৃথিবীর সর্বত্রই নারীদের শরীর পুরুষদের থেকে কম রোমশ হয়। এ থেকে সঙ্গতভাবেই অনুমান করা চলে যে যৌন নির্বাচন মারফতই এই বৈশিষ্ট্যটি অর্জিত হয়েছিল। বানরদের কিছু প্রজাতির মুখে এবং কিছু প্রজাতির পশ্চাদ্দেশের বড় একটা অঞ্চলে কোনও লোম থাকে না। এটাকে যৌন নির্বাচনের ফল বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, কারণ এদের পশ্চাদ্দেশের ওই অঞ্চলটা সুন্দরভাবে রঞ্জিত হয় তো বটেই, সেইসঙ্গেই কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে একটি লিঙ্গের সদস্যদের তুলনায় অন্য লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যে এই বর্ণবৈচিত্র্য অনেক সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়, বিশেষত সঙ্গমের মরশুমে—যার উদাহরণ হিসেবে পুরুষ-ম্যান্‌ড্রিল আর স্ত্রী-রিসাসদের নাম উল্লেখ করা যায়। মিঃ বার্টলেট আমাকে জানিয়েছেন যে এইসব প্রাণীরা যতই বড় হয়ে ওঠে, ততই তাদের পশ্চাদ্দেশের ওই অঞ্চলটাও শরীরের আয়তনের তুলনায় রীতিমতো বৃহদাকার হয়ে উঠতে শুরু করে। এই অঞ্চল থেকে নগ্নতার কারণে লোম বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে হয় না, বরং ওই অঞ্চলের চামড়ার রঙটাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্যেই লোম বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। অনেক জাতের পাখিদের মাথায় আর ঘাড়ে পালক না-থাকাটাকেও যৌন নির্বাচনের ফল বলে ধরে নেওয়া যায়। উজ্জ্বল রঙে রঞ্জিত ত্বককে প্রকাশ করার জন্যই তাদের মাথা আর ঘাড়ের পালক বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

পুরুষদের তুলনায় নারীদের শরীর কম রোমশ হয় এবং পৃথিবীর সব জাতির মধ্যেই বৈশিষ্ট্যটা লক্ষ করা যায়। এ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে আমাদের অর্ধ-মানব নারী-পূর্বজদের শরীরই প্রথম রোমশূন্য হয়েছিল এবং তা ঘটেছিল একই বংশধারা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ার আগে, অর্থাৎ

২১। 'কনট্রিবিউশনস টু দ্য থিয়োরি অফ ন্যাচরাল সিলেকশন', ১৮৭০, পৃঃ ৩৪৬। মিঃ ওয়ালেসের মতে (পৃঃ ৩৫০), 'এক ধরনের বুদ্ধিমত্তাই মানুষের বিকাশকে পরিচালিত অথবা নির্ধারিত করেছে।' মানুষের ত্বকের রোমশূন্যতাকেও তিনি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বুঝতে চেয়েছেন। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে রেভারেন্ড টি. আর. স্টেবিং ('ট্রানজাকশনস অফ ডেভনশায়ার অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স', ১৮৭০) বলেছেন যে মিঃ ওয়ালেস যদি 'মানুষের রোমশূন্য ত্বকের ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ করতেন, তাহলে তিনি হয়তো অন্য একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেতেন। তিনি দেখতে পেতেন যে ত্বকের অধিকতর সৌন্দর্য অথবা শরীরের আরও পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠার পথ বেয়েই অর্জিত হয়েছে এই বৈশিষ্ট্যটি।'

সুপ্রাচীন কালে। আমাদের নারী-পূর্বজরা রোমশূন্যতার এই নতুন বৈশিষ্ট্যটা ক্রমান্বয়ে অর্জন করে চলার পাশাপাশি তাদের উভয় লিঙ্গেরই সন্তানদের মধ্যে অল্প বয়সে সমানভাবে এই বৈশিষ্ট্যটা নিশ্চয়ই সঞ্চারিত করে চলেছিল। তার ফলে এই সঞ্চারণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বা বয়সের কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না, ঠিক যেমনটা দেখা যায় বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পাখিদের নানান অঙ্গসজ্জার ক্ষেত্রে। আমাদের বনমানুষ-সদৃশ পূর্বপুরুষরা যে আংশিক রোমশূন্যতাকে অঙ্গসজ্জা হিসেবে প্রশংসার চোখে দেখত তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ আমরা আগেই দেখেছি সব ধরনের জীবজন্তুরাই অসংখ্য অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যকে অঙ্গসজ্জা হিসেবেই প্রশংসার চোখে দেখত এবং তার ফলস্বরূপই এই বৈশিষ্ট্যগুলো যৌন নির্বাচন মারফত অর্জন করেছে তারা। কিছুটা ক্ষতিকর কয়েকটা বৈশিষ্ট্যও যে এইভাবে অর্জিত হতে পারে তাতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ আমরা জানি কয়েক ধরনের পাখিদের পালক এবং কয়েক ধরনের পুরুষ-হরিণের শৃঙ্গ তাদের পক্ষে কিছুটা ক্ষতিকর হলেও ঠিক এই কারণেই অর্জিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী একটি পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে বলা হয়েছে যে কিছু কিছু নরাকার (anthropoid) বানরদের স্ত্রী-প্রাণীদের শরীরের নীচের দিকটা পুরুষ-প্রাণীদের চেয়ে কিছুটা কম রোমশ হয়। রোমহীনতা বা নিরাবরণতার প্রক্রিয়া হয়তো এভাবেই শুরু হয়েছিল। যৌন নির্বাচন মারফত এই প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার ব্যাপারে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে নিউজিল্যান্ডের সেই চালু প্রবাদটার কথা—'রোমশ পুরুষের বরাতে কোনও নারী জুটবে না।' শ্যামদেশের রোমশ পরিবারের ছবি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে এর ঠিক বিপরীত ব্যাপারটা, অর্থাৎ অত্যধিক রোমশতার ব্যাপারটা, কী হাস্যকর রকম কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে। রাজপরিবারের প্রথম রোমশ নারীটিকে বিয়ে করার জন্য একজন পুরুষকে ঘুষ দিয়ে রাজি করিয়েছিলেন শ্যামদেশের রাজা। সেই নারী তার বৈশিষ্ট্যটা তার উভয় লিঙ্গের সন্তানদের মধ্যেই সঞ্চারিত করে দিয়েছিল।[২২]

কিছু কিছু জাতির সদস্যরা অন্য কিছু জাতির সদস্যদের থেকে বেশি রোমশ হয়, বিশেষত পুরুষরা। তার মানে অবশ্য এই নয় যে বেশি রোমশ জাতির সদস্যরা, যেমন ইউরোপীয়রা, তাদের আদিম অবস্থাকে কল্‌মাক্ বা আমেরিকানদের মতো রোমহীন জাতির সদস্যদের তুলনায় অনেক বেশি করে বজায় রাখতে পেরেছে। ইউরোপীয়দের এই রোমশতা খুব সম্ভবত আদিম অবস্থায় আংশিক পূর্বানুবৃত্তি বা প্রত্যাবর্তনেরই ফল। কারণ প্রাচীনকালে যে-বৈশিষ্ট্যগুলো দীর্ঘদিন

২২। 'দ্য ভ্যারিয়েশন অফ অ্যানিম্যালস অ্যান্ড প্ল্যান্টস আন্ডার ডোমেস্টিকেশন', খণ্ড ২, ১৮৬৮, পৃঃ ৩২৭।

ধরে উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হত, সেগুলো সর্বদাই প্রত্যাবর্তিত হওয়ার চেষ্টা করে। দেখা গেছে জড়বুদ্ধিসম্পন্নরা প্রায়শই অতিরিক্ত রকমের রোমশ হয়। তাদের অন্য অনেক বৈশিষ্ট্যও নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের মতো হয় এবং এ-ও সেই পূর্বানুবৃত্তিরই ফল। ঠান্ডা আবহাওয়া এই ধরনের পূর্বানুবৃত্তিতে কোনও সহায়ক ভূমিকা বলে মনে হয় না—একমাত্র বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী নিগ্রোদের[২৩] এবং জাপানের উত্তরাঞ্চলের দ্বীপভূমির অধিবাসী আইনো-দের এর ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে কোনও বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হওয়ার নিয়ম অত্যন্ত জটিল, তাকে পুরোপুরিভাবে বুঝে ওঠা খুবই কঠিন। কিন্তু কিছু কিছু জাতির অধিক রোমশতা যদি পূর্বানুবৃত্তির ফল হয় এবং কোনও ধরনের নির্বাচনই যদি এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে না থাকে, তাহলে এর চূড়ান্ত পরিবর্তনশীলতাটাকে—এমনকী একই জাতির মধ্যে হলেও—আর মোটেই কোনও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হিসেবে গণ্য করা যায় না।[২৪]

মানুষের মুখে দাড়ি দেখা যায়। এ ব্যাপারে কিছু বলার আগে আমরা যদি আমাদের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক অর্থাৎ চতুষ্পদ বানরদের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে এদের অনেক প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মুখেই সম পরিমাণ দাড়ি দেখা যায়, কিন্তু কয়েকটি প্রজাতির শুধু পুরুষ-বানরদের মুখেই দাড়ি থাকে অথবা স্ত্রী-বানরদের তুলনায় পুরুষ-বানরদের দাড়ি অধিক বিকশিত অবস্থায় থাকে। এই

২৩। 'ইনভেস্টিগেশনস ইনটু মিলিটারি অ্যান্ড অ্যানথ্রোপলজিক্যাল স্ট্যাটিসটিকস অফ আমেরিকান সোলজারস', বি. এ. গোল্ড, ১৮৬৯, পৃঃ ৫৬৮। স্নানরত ২১২৯ জন কৃষ্ণাঙ্গ ও অশ্বেতকায় সৈনিকের শরীরের রোমশতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। প্রকাশিত সারণিটির দিকে তাকালে এক নজরে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এ ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ জাতির মানুষদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই. আর যদিও থাকে তাহলে তা নিতান্তই সামান্য। তবে নিগ্রোদের আদি বাসভূমি হল আফ্রিকা এবং তা অনেক উষ্ণতর স্থান। আফ্রিকার নিগ্রোদের শরীর যে অত্যন্ত মসৃণ বা রোমহীন হয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মনে রাখা দরকার, উপরোক্ত অনুসন্ধানটিতে খাঁটি কৃষ্ণাঙ্গ ও বর্ণসংকর (mulatto)—উভয়দেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বিশেষ একটি নিয়ম অনুযায়ী (যে-নিয়মের সত্যতা অন্যত্র প্রমাণ করেছি আমি)—সংকর জাতির মানুষদের মধ্যে তাদের বনমানুষ-সদৃশ পূর্বপুরুষদের সেই আদিম রোমশতায় প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা খুব প্রকটভাবেই বিদ্যমান থাকে।

২৪। যৌন নির্বাচন মারফত মানুষের শরীর রোমহীন হওয়া সংক্রান্ত অভিমতটি যতটা বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে (দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য, স্পেন্সেল, 'Die Fortschritte des Darwinismus', ১৮৭৪, পৃঃ ৮০), ততটা বিরোধিতা এই গ্রন্থে উপস্থাপিত আর কোনও অভিমতকে সইতে হয়নি। তবে ত্বকের রোমহীনতা যে মানুষ ও কয়েক ধরনের বানরদের ক্ষেত্রে কিছুদূর পর্যন্ত একটা অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্য হিসেবেই কাজ করেছে তার স্বপক্ষে প্রভূত তথ্য আছে এবং সেইসব তথ্যের পাশে বিরোধী যুক্তিগুলিকে নিতান্তই গুরুত্বহীন বলে মনে হয়েছে আমার।

তথ্যটি এবং তাদের দাড়ির অদ্ভুত বিন্যাস থেকে, সেইসঙ্গে বেশ কয়েক ধরনের বানরদের মাথার চারপাশের চুলের উজ্জ্বল রঙ থেকে বিচার করলে মনে হয় যে যৌন নির্বাচন মারফত পুরুষ-বানররাই দাড়ি নামক বস্তুটা তাদের অঙ্গসজ্জা হিসেবে প্রথমে অর্জন করেছিল, তারপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বৈশিষ্ট্যটা তারা তাদের উভয় লিঙ্গের সন্তানদের মধ্যে সমানভাবে বা প্রায় সমানভাবে সঞ্চারিত করেছে। এশ্‌রিশ্‌ট্‌[২৫] বলেছেন যে মানুষের ক্ষেত্রে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের ভ্রূণেরই মুখমণ্ডলে প্রচুর চুল থাকে, বিশেষত মুখের চারপাশে। এ থেকে অনুমান করা যায়—আমরা যে-পূর্বজদের থেকে উদ্ভূত হয়েছি, তাদের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মুখেই দাড়ি ছিল। সেই সঙ্গেই এই অনুমানটাকেও অত্যন্ত সঙ্গত বলেই মনে হয় যে বহু প্রাচীনকাল থেকেই পুরুষদের মুখে দাড়ি ছিল এবং তা রয়ে গেছে, আর নারীদের শরীর যখন থেকে প্রায় রোমহীন হয়ে উঠেছে তখন থেকেই তাদের দাড়িও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমনকী আমাদের দাড়ির রঙটাও কোনও বানর-সদৃশ পূর্বপুরুষের কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বলে মনে হয়। কারণ মাথার চুলের রঙে আর দাড়ির রঙে কোনও পার্থক্য থাকলে সমস্ত বানরদের মধ্যে আর মানুষের মধ্যে সর্বদাই দাড়ির রঙটাই হালকা হতে দেখা যায়। যে-সব বানরদের পুরুষ-সদস্যদের দাড়ি স্ত্রী-বানরদের থেকে বড় হয়, তাদের সবার ক্ষেত্রেই দাড়িটা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে বয়ঃপ্রাপ্তির সময়, ঠিক যেমনটা দেখা যায় মানুষের ক্ষেত্রেও। এমনটাও অসম্ভব নয় যে মানুষের ক্ষেত্রে দাড়ির বিকাশের শেষ পর্যায়গুলোই শুধু টিকে থেকেছে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই যে মানুষের মুখে দাড়ি ছিল—এই অভিমতটির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করা যেতে পারে বিভিন্ন জাতির মধ্যে, এমনকী একই জাতির মধ্যেও, দাড়ির বিকাশে ব্যাপক তারতম্য থাকার ঘটনাটিকে। এটা আসলে পূর্বানুবৃত্তিকেই সূচিত করে—দীর্ঘকাল আগে হারিয়ে যাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলো যখন পুনরাবির্ভূত হয়, তখন তাদের মধ্যে প্রায়শই নানান তারতম্য দেখা দেয়।

পরবর্তী পর্যায়ে যৌন নির্বাচন যে-ভূমিকাটা পালন করে থাকতে পারে, সেটার কথাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। কারণ আমরা জানি বন্য জাতিগুলোর মধ্যে দাড়িহীন জাতির পুরুষরা তাদের মুখের যে-কোনও চুলকে ঘৃণ্য বলে মনে করে এবং প্রভূত যন্ত্রণা সহ্য করেও সেগুলো তুলে ফেলে, আবার দাড়িবিশিষ্ট বন্য জাতির পুরুষরা তাদের দাড়ির জন্য বিপুল গর্ব অনুভব করে। তাদের নারীরাও যে এই ধরনের মনোভাবই পোষণ করে, তাতে কোনও সন্দেহই নেই। এই ব্যাপারটা মনে রেখে আমরা বলতেই পারি যে পরবর্তী পর্যায়ে দাড়ির ব্যাপারে যৌন নির্বাচন

২৫। 'Ueber die Richtung der Haare am Memschlichen Korper', মুলার-এর 'Archiv fur Anat. und phys'., ১৮৩৭, পৃঃ ৪০-এ উদ্ধৃত।

অবশ্যই কিছু-না-কিছু প্রভাব বিস্তার করেছে। এমনটাও অসম্ভব নয় যে মুখের চুল তুলে ফেলার অভ্যাসটা সুদীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকার ফলে সেটা হয়তো উত্তরাধিকারসূত্রেও সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে। ডঃ ব্রাউন-সেকোয়ার্ড দেখিয়েছেন যে কয়েক ধরনের প্রাণীদের শরীরে বিশেষ পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার চালালে তাদের সন্তানদের ওপরেও তার প্রভাব পড়ে। অঙ্গচ্ছেদের প্রভাব যে উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তায়, তার স্বপক্ষে আরও প্রমাণ পেশ করা যায়। তবে সম্প্রতি মিঃ স্যালভিন্[২৬] এমন একটি ব্যাপার প্রমাণ করেছেন যা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। তিনি দেখিয়েছেন যে মোমো-রা (Motmots), যারা তাদের লেজের মধ্যবর্তী পালক দু'টোর তন্তুগুলোকে সারাক্ষণই চিবোতে অভ্যস্ত, তাদের ওই পালক দুটোর তন্তুগুলো আকারে কিছুটা ছোট হয়ে গেছে।[২৭] তথাপি মানুষের ক্ষেত্রে দাড়ি আর শরীরের অন্যান্য জায়গায় লোম তুলে ফেলার অভ্যাসটা ততদিন পর্যন্ত বোধহয় দেখা দেয়নি, যতদিন না অন্য কোনও উপায়ে ওই চুলগুলো আপনা থেকেই কিছুটা ছোট হয়ে গেছে।

বহু জাতির মানুষদের মাথার চুল কীভাবে রীতিমতো দীর্ঘ হয়ে উঠল, তা বলা কঠিন। এশ্‌রিশ্‌ট্‌[২৮] বলেছেন যে মানবশিশুর ভ্রূণের পঞ্চম মাসে মুখের চুলের দৈর্ঘ্য মাথার চুলের থেকে বেশি হয়। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে আমাদের অর্ধ-মানব পূর্বপুরুষদের মাথায় দীর্ঘ চুল থাকত না, অর্থাৎ এটি নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে অর্জিত বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন জাতির মানুষদের মাথার চুলের দৈর্ঘ্যে যে অস্বাভাবিক পার্থক্য লক্ষ করা যায়, তা-ও এই অনুমানের দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে : নিগ্রোদের মাথার চুলকে কোঁকড়ানো জটা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না, আমাদের (অর্থাৎ ইউরোপীয়দের) মাথার চুল রীতিমতো লম্বা, আবার আমেরিকার আদিবাসীদের মাথার চুল প্রায়শই মাটিতে ঠেকে যায়। সেমনোপিথেকাসদের কয়েকটি প্রজাতির প্রাণীদের মাথা মোটামুটি লম্বা চুলে ঢাকা থাকে। খুব সম্ভবত এটা তাদের অঙ্গসজ্জা হিসেবেই কাজ করে এবং যৌন নির্বাচনের সাহায্যেই এই অঙ্গসজ্জাটি অর্জন করেছিল তারা। মানুষের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য হতে পারে, কারণ

২৬। 'অন দ্য টেইল-ফেদার্স অফ মোমোস, 'প্রসিডিংস অফ দ্য জুলজিক্যাল সোসাইটি', ১৮৭৩, পৃঃ ২৯।

২৭। মিঃ স্প্রোট-ও এই একই কথা বলেছেন ('মিন্‌স্ অ্যান্ড স্টাডিজ অফ স্যাভেজ লাইফ', ১৮৬৮, পৃঃ ২৫)। কয়েকজন বিশিষ্ট জাতিতত্ত্ববিদ, জেনেভার এম. গস যাঁদের অন্যতম, মনে করেন যে করোটিকে কৃত্রিমভাবে পরিবর্তিত করা হলে সেই পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্যটি উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

২৮। 'Ueber die Richtung', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৪০।

আমরা জানি মানবসমাজে দীর্ঘ চুলের কদর এখনও আছে এবং আগেও ছিল। প্রায় সমস্ত কবির রচনাতেই এই ধারণার অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। সেন্ট পল লিখেছেন, 'নারীর দীর্ঘ কেশ, সে তো তার গৌরব।' উত্তর আমেরিকার জনৈক গোষ্ঠী-প্রধানকে যে শুধুমাত্র তার চুলের দৈর্ঘ্যের দরুনই প্রধান পদে নির্বাচিত করা হয়েছিল, তা তো আমরা আগেই দেখেছি।

ত্বকের রঙ

মানুষের ত্বকের রঙ বা গাত্রবর্ণ যে যৌন নির্বাচনের সাহায্যেই পরিবর্তিত হয়েছে, সে ব্যাপারে পেশ করার মতো জোরদার প্রমাণ নিতান্তই অল্প। কারণ অধিকাংশ জাতির ক্ষেত্রেই ত্বকের রঙের ব্যাপারে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না, কয়েকটি জাতির ক্ষেত্রে সামান্য কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। তবে, ইতিমধ্যেই প্রদত্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে সব জাতির মানুষরাই ত্বকের রঙকে তাদের সৌন্দর্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করে। সেক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যটি নির্বাচন মারফত পরিবর্তিত হওয়াটাই স্বাভাবিক, নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে যার অসংখ্য দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যার। নিগ্রোদের নিকষ কালো রঙটা যৌন নির্বাচনের সাহায্যেই অর্জিত হয়েছে বললে প্রথমটায় কথাটাকে একেবারেই আজগুবি কল্পনা বলে মনে হয়। কিন্তু অনুরূপ বিভিন্ন নজির এই অনুমানকে সমর্থনই করে আর নিগ্রোরাও তাদের গাত্রবর্ণকে প্রশংসার দৃষ্টিতেই দেখে। যে-সব স্তন্যপায়ী প্রাণীর স্ত্রী-পুরুষের গাত্রবর্ণে পার্থক্য থাকে, তাদের ক্ষেত্রে প্রায়শই পুরুষ-প্রাণীরা কালো হয় কিংবা স্ত্রী-প্রাণীদের চেয়ে গাঢ়তর রঙের হয়। এটা নির্ভর করে উত্তরাধিকারের ধরনের ওপর, অর্থাৎ গাত্রবর্ণটা উভয় লিঙ্গের সন্তানদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয় নাকি কোনও-একটা লিঙ্গের সন্তানদের মধ্যেই শুধু সঞ্চারিত হয়, তার ওপর। পিথেকিয়া স্যাটানাস-এর কোনও ক্ষুদ্রাকার প্রতিরূপ, যার ত্বক নিকষ কালো, অক্ষিগোলক সাদা এবং মাথার ওপরদিকে চুলগুলো দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, তার সঙ্গে নিগ্রোদের সাদৃশ্যকে হাস্যকরই বলা চলে।

বিভিন্ন জাতির মানুষদের মুখের রঙে যতটা পার্থক্য থাকে, বিভিন্ন ধরনের বানরদের মুখের রঙে তার চেয়ে অনেক বেশি পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তাদের ত্বকের লাল, নীল, কমলা, প্রায় সাদা এবং কালো রঙ (এমনকী তা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে এক হলেও), তাদের গায়ের লোমের উজ্জ্বল বর্ণ, মাথায় কেশগুচ্ছের অঙ্গসজ্জা—এ-সবই যে যৌন নির্বাচনের সাহায্যেই অর্জিত হয়েছে, তা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। বেড়ে-ওঠার সময় বিকাশটা কীভাবে ঘটছে তা থেকে বোঝা যায় কোনও প্রজাতির প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো পূর্ববর্তী প্রজন্মসমূহে কীভাবে বিকশিত ও পরিবর্তিত হয়েছি।

আবার, মানুষের বিভিন্ন জাতির সদ্যোজাত শিশুদের শরীর পুরোপুরি রোমহীন হওয়া সত্ত্বেও তাদের গায়ের রঙে বড়দের মতো অতটা পার্থক্য থাকে না। এই দু'টো তথ্য মাথায় রাখলে মনে হয় যে বিভিন্ন জাতির মানুষদের ত্বকের রঙটা অর্জিত হয়েছিল তাদের শরীর রোমহীন হয়ে ওঠার পরবর্তী পর্যায়ে, যা মানবজাতির ইতিহাসের কোনও সুপ্রাচীন সময়ের ঘটনা।

সারসংক্ষেপ

ধরে নেওয়া যায় যে নারীদের তুলনায় পুরুষদের বৃহত্তর আকার, অধিকতর শক্তি, সাহস, যুদ্ধপ্রিয়তা ও কর্মশক্তি অর্জিত হয়েছিল সুপ্রাচীন কালেই এবং পরবর্তীকালে মূলত নারীদের দখল করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ বেয়ে তাদের এই গুণগুলো আরও বেড়ে উঠেছে। পুরুষদের মননগত ক্ষমতা ও উদ্ভাবনীশক্তি বেশি হওয়াটা খুব সম্ভবত প্রাকৃতিক নির্বাচন আর অভ্যাসের বংশানুক্রমিক প্রভাবের সম্মিলিত ফল হিসেবেই গড়ে উঠেছে, যোগ্যতম পুরুষরাই নিজেদেরকে এবং নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে সবথেকে ভালোভাবে রক্ষা করতে ও ভরণপোষণ জোগাতে সক্ষম হয়। অত্যন্ত জটিল বিষয়টিকে যথাসম্ভব বিচার-বিবেচনা করে আমার মনে হয়েছে যে আমাদের বানর-সদৃশ পুরুষ-পূর্বজরা বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের মুগ্ধ অথবা উত্তেজিত করার অঙ্গসজ্জা হিসেবেই দাড়ি অর্জন করেছিল এবং সেই বৈশিষ্ট্যটা তারা শুধুমাত্র তাদের পুরুষ-সন্তানদের মধ্যেই সঞ্চারিত করেছিল। শরীরের রোমহীনতা খুব সম্ভবত নারীদের মধ্যেই প্রথম দেখা দিয়েছিল এবং এটা তাদের এক ধরনের যৌন অঙ্গসজ্জা হিসেবেই কাজ করত, তবে এই বৈশিষ্ট্যটা তারা তাদের উভয় লিঙ্গের সন্তানদের মধ্যে সমানভাবেই সঞ্চারিত করেছিল। অন্য আরও কিছু ব্যাপারেও নারীদের মধ্যে এই একই উদ্দেশ্যে এবং একই উপায়ে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকতে পারে, যার ফলে পুরুষদের তুলনায় নারীদের কণ্ঠস্বর অনেক মিষ্টি হয়ে উঠেছে আর পুরুষদের থেকে অনেক বেশি সুন্দরও হয়ে উঠেছে তারা।

মানুষের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার আমাদের বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। একেবারে প্রারম্ভিক পর্যায়ে, অর্থাৎ মানুষ যখন সবেমাত্র সঠিক অর্থে মানুষ হয়ে উঠেছে, তখন বহু ব্যাপারেই যৌন নির্বাচনের পক্ষে পরবর্তী পর্যায়ের তুলনায় অনেক বেশি অনুকূল অবস্থায় ছিল সে। কারণ তখন সে দূরদৃষ্টি বা যুক্তি-বিবেচনার দ্বারা যতটুকু পরিচালিত হত, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিচালিত হত সহজাত আবেগের দ্বারা। তখন সে তার স্ত্রীকে বা স্ত্রীদেরকে সতর্কভাবে রক্ষা করত, শিশুহত্যা করত না, স্ত্রীদের নিছকই প্রয়োজনীয় দাসী বলে মনে করত না, এবং এই স্ত্রীদের সঙ্গে বাল্যবিবাহও হত না

তাদের। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে যৌন নির্বাচনের বিচারে মানুষের বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলো অত্যন্ত সুপ্রাচীন কালেই গড়ে উঠেছিল। এই সিদ্ধান্ত আর-একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেও বুঝতে সাহায্য করে—সেই সুপ্রাচীন কালে, যখনকার কোনও নথিই আমাদের হাতে নেই, তখনই মানুষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে, আজকের বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার পার্থক্যের সমান বা প্রায়-সমান পার্থক্য গড়ে উঠেছিল।

মানুষের ইতিহাসে যৌন নির্বাচনের ভূমিকা সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যে-দৃষ্টিভঙ্গীটি উপস্থাপিত করেছি আমরা, তাতে বিজ্ঞানসম্মত যথাযথতার কিছু অভাব আছে। নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে যৌন নির্বাচনের ভূমিকাকে যিনি স্বীকার করবেন না, তাঁর পক্ষে এই গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদগুলিতে মানুষের ক্ষেত্রে যৌন নির্বাচনের ভূমিকা সম্বন্ধে আমি যা-কিছু বলেছি, তার কোনওটাই মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না। মানুষের ঠিক কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য এইভাবে পরিবর্তিত হয়েছে আর কোন্‌গুলো হয়নি, তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে মানুষের বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে এবং নিকটতম সাদৃশ্যযুক্ত প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের নানান পার্থক্য আছে, এই পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয় এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে যেগুলো তাদের দৈনন্দিন জীবনে কোনও কাজে লাগে না এবং খুব সম্ভবত যৌন নির্বাচন মারফতই এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের মধ্যে পরিবর্তিত রূপ নিয়েছে। আমরা দেখেছি যে সবথেকে পিছিয়ে-থাকা বন্যদের প্রতিটি গোষ্ঠীর মানুষরাই তাদের নিজেদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে রীতিমতো গর্বের চোখে দেখে থাকে। যেমন, মাথা আর মুখমণ্ডলের আকার, হনুর চওড়া হাড়, নাক খাড়া বা খাঁদা হওয়া, ত্বকের রঙ, মাথার চুলের দৈর্ঘ্য, মুখমণ্ডলে ও শরীরে চুল বা লোমের অনুপস্থিতি অথবা মুখে লম্বা দাড়ি থাকা ইত্যাদি। প্রতিটি জাতির অধিকতর শক্তিশালী ও সক্ষম পুরুষরা, যারা সবথেকে বেশি সংখ্যক সন্তানের ভরণপোষণ জোগাতে পারে, তারা বহু প্রজন্ম ধরে সবথেকে বেশি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং সেহেতু সবথেকে আকর্ষণীয় নারীদের নিজেদের স্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়ার ফলে এইসব বৈশিষ্ট্য এবং অন্য আরও অনেক বৈশিষ্ট্যই ধীরে ধীরে ও ক্রমান্বয়ে আরও স্পষ্ট, আরও সুচিহ্নিত হয়ে ওঠে। আমার মতে—বিভিন্ন জাতির মানুষদের বাহ্যিক চেহারায় এবং কিছু মাত্রায় মানুষ ও নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের বাহ্যিক চেহারায় যে-পার্থক্য দেখা যায়, তা গড়ে ওঠার যাবতীয় কারণের মধ্যে সবথেকে কার্যকরী কারণ হল যৌন নির্বাচন।

ডিসেন্ট অফ ম্যান

দ্বিতীয় খণ্ড ❑ দ্বিতীয় ভাগ

❑ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ❑

সারসংক্ষেপ ও উপসংহার

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সারসংক্ষেপ এবং উপসংহার

আমাদের প্রধান সিদ্ধান্ত হল, নিম্নতর কোনও জীব থেকেই উদ্ভূত হয়েছে মানুষ—বিকাশের ধরন—মানুষের বংশবৃত্তান্ত—মননগত ও নৈতিক গুণ—যৌন নির্বাচন—উপসংহার।

এই গোটা বইটার একটা ছোট্ট সারসংক্ষেপ হাজির করা গেলে এর মূল বিষয়গুলি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। এখানে যে-সমস্ত মত অভিব্যক্ত হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলি নিছকই অনুমানভিত্তিক, এবং কোনও কোনওটা ভুল বলেও প্রমাণিত হবে। তবে, গোটা বইতে আমি যখনই কোনও-একটা বিশেষ মতের পক্ষে দাঁড়িয়েছি, তখন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কেন আমি সেই মত সমর্থন করছি তার কারণও দেখানোর চেষ্টা করেছি। মানুষের ইতিহাসের কিছু জটিল সমস্যার ওপরে কতটা আলোকপাত করতে পারে বিবর্তনবাদ, তা খুঁজে দেখা দরকার ছিল। বিজ্ঞানের অগ্রগতির পক্ষে ভ্রান্ত তথ্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, কেননা এগুলি দীর্ঘদিন ধরে চালু থেকে ভ্রান্তি ছড়ায়। কিন্তু কিছুটা যুক্তিপ্রমাণবিশিষ্ট কোনও ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী খুব-একটা ক্ষতিকর হয়ে ওঠে না, কারণ সেই দৃষ্টিভঙ্গীর ভ্রান্তি প্রমাণের ব্যাপারে অনেকেই উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ভ্রান্তিটা প্রমাণ করা গেলে ভুল ঠিকানায় যাওয়ার একটা পথ বন্ধ হয়ে যায় আর সেইসঙ্গেই অনেক সময় খুলে যায় সত্যের ঠিকানামুখী পথের দুয়ার।

কোনও নিম্নতর জৈবিক রূপ থেকে বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই মানুষ উদ্ভূত হয়েছে—এটাই এ বইয়ের প্রধান সিদ্ধান্ত, এবং বহু অভিজ্ঞ প্রাণিতত্ত্ববিদই এখন এই দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করেন। যে-বনিয়াদের ওপর সিদ্ধান্তটি গড়ে উঠেছে, তা কখনোই নাকচ হয়ে যেতে পারে না। কারণ মানুষ ও নিম্নতর প্রাণীদের ভ্রূণগত বিকাশের মধ্যেকার এবং শারীরিক গঠন-কাঠামোর অসংখ্য বিষয়ের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য (যেগুলির কোনওটা হয়তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আবার কোনওটা নিছকই মামুলি), তার শরীরের মধ্যে এখনও পর্যন্ত টিকে থাকা নানান লুপ্তপ্রায় অংশ, এবং তার মধ্যে মাঝেমাঝে পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের যে-অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা যায়—এই বিষয়গুলিকে কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। এগুলি সম্বন্ধে অনেকদিন আগে থেকেই নানান তথ্য জানা গেছে, কিন্তু মানুষের উদ্ভবের সঙ্গে এগুলির সম্পর্ক কী, তা কিছুদিন আগে পর্যন্ত জানা যায়নি। সমগ্র জীবজগৎ সম্বন্ধে আজ আমরা যে-জ্ঞান অর্জন করেছি, তার আলোকে বিচার করলে এগুলির তাৎপর্য দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বিষয়গুলিকে অন্যান্য কিছু বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করে বিশ্লেষণ

করলে, যেমন একই প্রজাতির সদস্যদের পারস্পরিক সাদৃশ্য, অতীতে এবং বর্তমানে তাদের ভৌগোলিক বিন্যাস এবং তাদের ভূতাত্ত্বিক পারম্পর্যের সঙ্গে যুক্ত করে বিশ্লেষণ করলে, সবকিছুর মধ্যে বিবর্তনবাদের অমোঘ নীতিটাই আমাদের সামনে একান্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। এই সবক'টি বিষয়ই ভ্রান্ত, এমন ভাবাটা নিতান্তই অর্থহীন। প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাবলীকে যারা কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টিমাত্র বলে দেখতে (বন্যরা যেভাবে দেখে) রাজি নয়, তারা আর কোনওমতেই মেনে নেবে না যে মানুষ পুরোপুরি এককভাবে, সবার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে, সৃষ্টি হয়েছে। মানবশিশুর ভ্রূণের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর, যেমন কুকুরের, ভ্রূণের সাদৃশ্য ; অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের করোটি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সমগ্র দৈহিক কাঠামোর সঙ্গে মানুষের করোটি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দৈহিক কাঠামোর মিল (এ-সব অঙ্গ যে-কাজেই ব্যবহৃত হোক না কেন) ; শারীরগঠনের বিভিন্ন অংশ যা চতুষ্পদ স্তন্যপায়ীদের মধ্যেই দেখা যায় অথচ সাধারণত মানুষের শরীরে থাকে না এমন কিছু অংশ, যেমন বেশ কিছু পেশী, কখনও কোনও মানুষের শরীরে হঠাৎ দেখতে পাওয়া, এবং এ-রকম আরও অনেক বিষয় থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়—যে-আদি পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীরা, সেই একই পূর্বপুরুষ থেকেই উদ্ভব হয়েছে মানুষেরও।

আমরা দেখেছি, শরীরের সমস্ত অংশের ব্যাপারে এবং মানসিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে হরেক ফারাক থাকে। নিম্নতর প্রাণীদের মধ্যে যে-সব কারণে এ-ধরনের পার্থক্য বা বিভিন্নতা সৃষ্টি হয় এবং সেগুলির ব্যাপারে যে-সব নিয়ম ক্রিয়াশীল থাকে, মানুষের ক্ষেত্রেও সেইসব কারণ ও নিয়মগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য। নিম্নতর প্রাণী এবং মানুষ, উভয়ের ক্ষেত্রেই বংশগতির একই নিয়ম কাজ করে। হাতের কাছে জীবনযাপনের যতটুকু উপকরণ থাকে, তার পরিধি ছাড়িয়ে দ্রুত বেড়ে চলে মানুষের সংখ্যা। ফলে দেখা দেয় অস্তিত্বরক্ষার জন্য কঠোর সংগ্রাম, আর সুযোগ পেলেই সক্রিয় হয়ে ওঠে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম। একই ধরনের বেশ কিছু সুস্পষ্ট পার্থক্য বা বিভিন্নতা বংশপরম্পরাক্রমে চলতে থাকাটা এ ব্যাপারে মোটেই অত্যাবশ্যক নয়। মানুষের একের সঙ্গে অপরের যে-সামান্য পার্থক্য থাকে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠার জন্য সেটুকুই যথেষ্ট। আবার এমনটা মনে করারও কোনও কারণ নেই যে একই প্রজাতির অন্তর্গত প্রতিটি প্রাণীর শরীরের প্রতিটি অংশের সঙ্গে অন্য প্রজাতির প্রাণীদের শরীরের অংশগুলির পার্থক্য হুবহু একইরকম। দীর্ঘকাল ধরে কোনও অঙ্গ ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত হতে থাকলে তার বংশানুক্রমিক প্রতিক্রিয়াও অনেকটা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতোই একটা ভূমিকা নেয়। শরীরের যে-সমস্ত পরিবর্তন একসময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল অথচ আজ আর যেগুলির বিশেষ কোনও তাৎপর্য নেই, সেগুলি বহুদিন ধরে বংশপরম্পরাক্রমে সঞ্চারিত হয়ে চলে।

শরীরের কোনও-একটা অংশ পরিবর্তিত হলে অন্যান্য অংশগুলিও আন্তঃসম্পর্কের নিয়মের দরুন পরিবর্তিত হয়। আন্তঃসম্পর্কযুক্ত অঙ্গবিকৃতির নানান ঘটনার মধ্যে এর নজির আমরা পেয়েছি। জীবনযাপনের পারিপার্শ্বিক, যেমন সুপ্রচুর খাদ্য, উষ্ণতা ও আর্দ্রতা ইত্যাদির প্রত্যক্ষ ও সুনির্দিষ্ট প্রভাবেরও একটা ভূমিকা আছে বলে ধরে নেওয়া যায়। আর শেষত, শারীরিকভাবে খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ এবং কয়েকটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়েছে যৌন নির্বাচনের সাহায্যে।

মানুষ এবং অন্যান্য প্রতিটি প্রাণীর শরীরেই এমন কিছু অংশ থাকে, আমাদের সীমিত জ্ঞানে মনে হয় যেগুলি এখন তার কোনও কাজেই লাগে না বা আগেও লাগত না, এবং এই কাজে না-লাগার কারণ হয়তো জীবনযাপনের সাধারণ অবস্থা কিংবা একের সঙ্গে অন্যদের যৌন সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত। কোনও-একটি বিশেষ ধরনের নির্বাচন অথবা অঙ্গগুলির ব্যবহার বা অব্যবহারের বংশানুক্রমিক প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে এইসব অপ্রয়োজনীয় অংশগুলির উদ্ভবের ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে, আমরা আমাদের গৃহপালিত পশুদের শরীরে কখনও কখনও যে-সব অদ্ভুত ও সুস্পষ্ট গঠনকাঠামোগত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই, সেগুলির অজানা কারণসমূহ যদি তাদের সকলকার মধ্যে সমানভাবে কাজ করত, তাহলে ওই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্ভবত ওই প্রজাতির সকল সদস্যের মধ্যেই ফুটে উঠতে দেখা যেত। এ-ধরনের পরিবর্তনের কারণ কী, ভবিষ্যতে তা জানতে পারার আশা করতে পারি আমরা, বিশেষত অঙ্গবিকৃতির ব্যাপারটার সাহায্যে এই কারণগুলো বোঝা যেতে পারে। বহু পর্যবেক্ষক, যেমন মঁসিয়ে কামিল দারেস্ত, যে-কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন, তা ভবিষ্যতে খুবই সম্ভাবনাময় ভূমিকা নিতে পারে। সাধারণভাবে আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে প্রতিটা ছোটখাটো বিভিন্নতা এবং প্রতিটা অঙ্গবিকৃতির কারণ চারপাশের অবস্থার চরিত্রের মধ্যে যতটা না নিহিত থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশি নিহিত থাকে প্রাণীদের শারীরিক কাঠামোর মধ্যেই। অবশ্য বহু ধরনের শারীরিক পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে নতুন ও পরিবর্তিত অবস্থা নিঃসন্দেহেই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

যে-সব উপায়ের কথা এইমাত্র বলা হল সেগুলির সাহায্যে এবং সম্ভবত এখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত আরও কিছু উপায়ের সাহায্যেই মানুষ তার আজকের অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। কিন্তু মানুষ যখন থেকে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠল, তখন থেকেই গড়ে উঠতে থাকল বিভিন্ন পৃথক পৃথক জাতি, বা আরও সঠিক অর্থে বললে, বিভিন্ন উপ-প্রজাতি। এ-রকম কোনও কোনও উপ-প্রজাতির মধ্যে, যেমন নিগ্রো ও ইউরোপীয়দের মধ্যে, পার্থক্য এতই বেশি যে এই দুই শাখার দু'জন মানুষকে কোনও প্রাণিতত্ত্ববিদের কাছে হাজির করলে এবং তাদের সম্বন্ধে আর কোনও তথ্য তাঁকে

না জানালে তিনি নির্ঘাত এদের দু'জনকে দু'টি পৃথক প্রজাতির সদস্য বলে চিহ্নিত করে দেবেন! তা সত্ত্বেও, সমস্ত জাতির মানুষদের দৈহিক কাঠামোর অসংখ্য ছোটখাটো বিষয় এবং মানসিক বহু বৈশিষ্ট্য একইরকম। এর কারণ একমাত্র এ-ই হতে পারে যে, তারা প্রত্যেকেই কোনও-এক সাধারণ পূর্বপুরুষের কাছ থেকে এগুলি অর্জন করেছে উত্তরাধিকারসূত্রে। আর এইসব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সেই আদি পূর্বপুরুষকে মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করাই শ্রেয়।

একটা জাতির থেকে আর-একটা জাতির পার্থক্য এবং মূল বংশের থেকে প্রত্যেক জাতির পার্থক্যের উৎস কোনও-এক আদি মানব-মানবীর মধ্যেই নিহিত ছিল, এমনটা ভাবলে ভুল হবে। আসলে পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে জীবনযাপনের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পক্ষে যারা অধিকতর উপযুক্ত ছিল (কেউ কিছুটা বেশি, কেউ কিছুটা কম), তারা ওই অবস্থার পক্ষে অনুপযুক্তদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় টিকে থাকতে পেরেছিল। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিল রয়েছে সেই প্রক্রিয়ার, যেখানে মানুষ মিলনের জন্য কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বেছে নেয় না, বরং শুধু উৎকৃষ্টতর ব্যক্তিদের সাহায্যেই সন্তান উৎপাদন করায় এবং নিকৃষ্টতরদের অবহেলা করে। এইভাবে ধীরে ধীরে অথচ সুনিশ্চিতভাবে সে তার নিজের বংশ বা গোষ্ঠীকে পরিবর্তিত করে এবং অসচেতনভাবেই গড়ে তোলে এক নতুন বংশধারা। কাজেই, কোনওরকম নির্বাচন ব্যতীতই অর্জিত পরিবর্তনের ব্যাপারে, এবং নির্দিষ্ট জীবটির প্রকৃতি ও চারপাশের অবস্থার প্রভাবের ফলে অথবা জীবনযাপনের পরিবর্তিত আচার-অভ্যাসের ফলে উদ্ভূত বিভিন্নতাসমূহের দরুন কোনও একজোড়া নারী-পুরুষ ওই একই দেশে বসবাসকারী অন্য নার-পুরুষদের চেয়ে বেশি পরিমাণে পরিবর্তিত হতে পারে না, কেননা এদের সকলকার মধ্যে অবাধ যৌনমিলনের দরুন অবিরাম একটা সংমিশ্রণ ঘটেই চলে।

মানুষর ভ্রূণাবস্থার গঠন-কাঠামো, নিম্নতর প্রাণীদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য, তার শরীরের বিভিন্ন লুপ্তপ্রায় অঙ্গ এবং মাঝেমাঝে তার মধ্যে পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের যে-প্রবণতা দেখা যায়—এগুলি থেকে আমরা আমাদের আদি পূর্বপুরুষদের অবস্থা কিছুটা অনুমান করতে পারি এবং জীবজগতের সমগ্র সারিতে তাদের সঠিক স্থানটাও মোটামুটি নির্ধারণ করতে পারি। আমরা জেনেছি যে কোনও-এক রোমশ, লেজবিশিষ্ট চতুষ্পদ প্রাণী থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল, মানুষ, যে-প্রাণীটি খুব সম্ভবত বৃক্ষবাসী ছিল এবং বসবাস করত পূর্ব গোলার্ধে। কোনও প্রাণিতত্ত্ববিদ যদি এই প্রাণীটির সমগ্র দৈহিক-কাঠামো পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পেতেন, তাহলে খুব সম্ভবত তিনি এদের ঠিক পূর্ব গোলার্ধের এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বানরদের আরও প্রাচীন পূর্বপুরুষদের মতো চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী প্রাণী (quadrumana) হিসেবেই চিহ্নিত

করতেন। চতুষ্পদ স্তন্যপায়ীরা এবং যাবতীয় উন্নততর স্তন্যপায়ীরাই সম্ভবত উদ্ভূত হয়েছে কোনও-এক প্রাচীন ক্যাঙারু জাতীয় প্রাণী থেকে, এই ক্যাঙারু জাতীয় প্রাণী উদ্ভূত হয়েছিল কোনও উভচর-সদৃশ জীব থেকে বহু বিচিত্র রূপের মধ্যে দিয়ে বিবর্তনের ধারায়, আবার এই উভচর-সদৃশ জীবের উদ্ভব ঘটেছিল মাছের মতো কোনও জীব থেকে। সুদূর অতীতের ধূসর কুয়াশা সরালে বোঝা যায়—সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আদি পূর্বপুরুষ ছিল নিঃসন্দেহেই কোনও জলচর প্রাণী, তাদের শরীরে ফুলকা থাকত, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গই একই শরীরে বিদ্যমান থাকত, এবং শরীরের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি (যেমন মস্তিষ্ক বা হৃদপিণ্ড) ছিল অসম্পূর্ণভাবে বিকশিত বা একেবারেই অবিকশিত। ওইসব প্রাণীদের সঙ্গে সবথেকে বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায় বর্তমানের সামুদ্রিক জীব অ্যাসিডিয়ানের শূককীটের।

মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে সামনে এসে দাঁড়ায় আমাদের মননগত ক্ষমতা ও নৈতিক প্রবণতার প্রশ্নটা। কিন্তু বিবর্তনবাদে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা সহজেই বুঝে নিতে পারেন যে উন্নততর জীবজন্তুদের বুদ্ধিবৃত্তিগত ক্ষমতাও (যে-ক্ষমতার ধরনটা কী মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিগত ক্ষমতারই মতো, যদিও মাত্রাগত পার্থক্য বিপুল) বিকশিত হয়ে চলে। তাই দেখা যায় উন্নততর জাতের বানর বা বনমানুষদের সঙ্গে মাছেদের, কিংবা পিঁপড়েদের সঙ্গে ক্ষুদ্র কোনও কীটের মানসিক ক্ষমতার পার্থক্য বিপুল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের মানসিক ক্ষমতার বিকাশের প্রশ্নটা খুব-একটা জটিল নয়, কেননা আমাদের গৃহপালিত জীবজন্তুদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে তাদের মানসিক ক্ষমতা পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তনগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। প্রকৃতির কোলে স্বাধীন অবস্থায় থাকার সময় এগুলি যে জীবজন্তুদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কাজেই এই ব্যাপারটা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে তাদের অগ্রগতির অনুকূল। মানুষের সম্বন্ধেও এই একই সিদ্ধান্ত করা চলে : অত্যন্ত সুপ্রাচীন কালেও মননশক্তি তার পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এই শক্তির সাহায্যেই সে উদ্ভাবন করেছিল ভাষা এবং ব্যবহার করেছিল সেই ভাষাকে, তৈরি করেছিল নানান হাতিয়ার, উপকরণ, ফাঁদ ইত্যাদি ; আর নিজের সামাজিক আচার-অভ্যাসের দৌলতে বহুদিন আগেই সমস্ত সজীব প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণীর স্থান অর্জন করেছিল সে।

আধা-উদ্ভাবন এবং আধা-সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে ভাষাকে মানুষ যখন থেকে ব্যবহার করতে শুরু করল, তখন থেকে তার মননশক্তির বিকাশও ঘটে চলল দ্রুত তালে। কারণ ভাষার অবিরাম ব্যবহার প্রতিক্রিয়া ঘটাত মস্তিষ্কে এবং তা সঞ্চারিত হত উত্তরাধিকারসূত্রে। এটা আবার ছাপ ফেলত ভাষার অগ্রগতির ওপরে। মিঃ

চন্‌সি রাইট চমৎকারভাবে বলেছেন, নিম্নতর প্রাণীদের তুলনায় মানুষের মাথা যে তার শরীরের থেকে অপেক্ষাকৃত বড় হয়, সম্ভবত তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, সেই প্রাচীনকালে কোনও সাদামাটা ধরনের ভাষা ব্যবহার করার দরুনই তারা মাথাটা শরীরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে গিয়েছিল। ভাষা হচ্ছে এক আশ্চর্য সৃষ্টি, যা সমস্ত জিনিস ও গুণ বা ক্ষমতার জন্য আলাদা আলাদা সংকেতের জন্ম দিয়েছে, মানুষের মধ্যে গড়ে তুলেছে সুশৃঙ্খল চিন্তাধারা, যা নিছক ইন্দ্রিয়গত অনুভূতি থেকে কখনোই গড়ে উঠতে পারত না বা গড়ে উঠলেও তাকে টিকিয়ে রাখা যেত না। মানুষের উন্নতর মননগত ক্ষমতাসমূহ—যেমন যুক্তিপ্রয়োগ, বিভিন্ন ঘটার সারসংকলন, আত্মসচেতনতা প্রভৃতি—সম্ভবত গড়ে ওঠে অন্যান্য মানসিক ক্ষমতার অবিরাম অগ্রগতি ও অনুশীলনের ফলেই।

নৈতিক গুণাবলীর বিকাশের প্রশ্নটা আরও চিত্তাকর্ষক। এর বনিয়াদ নিহিত থাকে সামাজিক প্রবৃত্তির মধ্যে, পারিবারিক বন্ধনও যার অন্তর্ভুক্ত। এই প্রবৃত্তিগুলি অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির এবং নিম্নতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই প্রবৃত্তিগুলি কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজের দিকে বিশেষ প্রবণতা সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু ভালবাসা আর সহানুভূতির সুনির্দিষ্ট বোধ হচ্ছে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন জীবজন্তুরা পরস্পরের সাহচর্যে আনন্দ পায়, বিপদের সময় একে অপরকে সতর্ক করে দেয় এবং একে অপরকে নানাভাবে রক্ষা ও সাহায্য করে। এই প্রবৃত্তিগুলি কিন্তু একই প্রজাতির সকল সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না, এগুলি প্রযোজ্য হয় কেবলমাত্র একই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের মধ্যেই। যেহেতু এগুলি প্রজাতির পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক, তাই ধরে নেওয়া যায় যে খুব সম্ভবত প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই এগুলি অর্জিত হয়েছিল।

নৈতিক গুণসম্পন্ন প্রাণী একমাত্র তাকেই বলা চলে, যে তার নিজের অতীত কার্যকলাপ ও সেগুলির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করতে এবং সেইসব কাজের কোনও কোনওটাকে সঠিক ও কোনও কোনওটাকে বেঠিক বলে চিহ্নিত করতে সক্ষম। এ-কথা অনস্বীকার্য যে একমাত্র মানুষই এইসব ক্ষমতার অধিকারী, আর নিম্নতর প্রাণীদের সঙ্গে তার যাবতীয় পার্থক্যের মধ্যে এটাই হচ্ছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে নৈতিক বোধ সৃষ্টি হয়, প্রথমত, সামাজিক প্রবৃত্তিসমূহের চিরস্থায়ী ও সদা-বর্তমান প্রকৃতির দরুন ; দ্বিতীয়ত, কোনও কাজ সম্বন্ধে নিজের প্রতিবেশীদের অনুমোদন বা অননুমোদনকে মানুষ মূল্য দেয় বলে ; এবং তৃতীয়ত, তার মানসিক ক্ষমতার উন্নততর কার্যকলাপের দরুন, যেখানে অতীতের স্মৃতি তার মনের পর্দায় ফুটে থাকে নিখুঁতভাবে। এই শেষোক্ত বিষয়টিতেই সে নিম্নতর প্রাণীদের থেকে পুরোপুরি আলাদা। মনের এই ক্ষমতার

দরুন মানুষ বাধ্য হয় অতীত আর ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে এবং অতীতের ঘটনাগুলির মূল্যায়ন করতে। তাই দেখা যায় কোনও সাময়িক আকাঙ্ক্ষা বা আবেগ মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তিকে কিছুক্ষণ বা কিছুদিনের জন্য দমিয়ে রাখার পর বিষয়টা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে সে এবং ওই প্রশমিত হয়ে আসা তাড়নাটিকে তুলনা করে সদা-বর্তমান সামাজিক প্রবৃত্তির সঙ্গে। তখন তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে একটা অসন্তুষ্টির ভাব—আসলে অতৃপ্ত যে-কোনও প্রবৃত্তিই মানুষের মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দেয়। অতঃপর সে সিদ্ধান্ত নেয় যে ভবিষ্যতে আর ও-রকম কাজ করবে না। এটাকেই আমরা বিবেকবোধ বলে থাকি। অন্য কোনও প্রবৃত্তির থেকে অধিকতর জোরদার বা দীর্ঘস্থায়ী কোনও প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে এমন এক অনুভূতি সৃষ্টি করে, যে-অনুভূতিকে আমরা প্রকাশ করে থাকি 'এ-কাজটা করা অবশ্যই উচিত' বলে। কোনও শিকারি কুকুর যদি তার নিজের অতীত কার্যকলাপ সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারত, তাহলে সে হয়তো নিজেকে বলত (যেমনটা আমরা তার সম্বন্ধে বলে থাকি)—আমার উচিত ছিল ওই খরগোশটার দিকে ভালো করে নজর রাখা, ওটাকে শিকার করার তাৎক্ষণিক উত্তেজনার তাড়নায় অমন করে ছুটে যাওয়াটা ঠিক হয়নি আমার।

সমাজবদ্ধ প্রাণীদের একটা আকাঙ্ক্ষা তাদের আংশিকভাবে অনুপ্রাণিত করে সাধারণভাবে নিজের গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের সাহায্য করতে, কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা তাকে অনেক বেশি করে অনুপ্রাণিত করে কয়েকটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করতে। মানুষও তার আশপাশের অন্যান্য মানুষদের সাহায্য করার ব্যাপারে একই সাধারণ আকাঙ্ক্ষার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়, কিন্তু তার কোনও বিশেষ প্রবৃত্তি নেই বা থাকলেও তা খুবই কম। কথার সাহায্যে নিজের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার ব্যাপারে তার যে-ক্ষমতা রয়েছে, সেক্ষেত্রেও সে নিম্নতর প্রাণীদের থেকে আলাদা। কথার দ্বারা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার এই ক্ষমতা সাহায্য চাওয়ার বা দেওয়ার অন্যতম নির্দেশকের ভূমিকা দখল করেছে। সাহায্য দেওয়ার উদ্দেশ্যটাও অনেক পালটে গেছে মানুষের মধ্যে। এখন আর এটা শুধু এক প্রবৃত্তি-সঞ্জাত ব্যাপার নয়। অন্যান্য মানুষদের প্রশংসা বা নিন্দা এখন এই উদ্দেশ্যকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে থাকে। প্রশংসা ও নিন্দা করা বা তা উপলব্ধি করার ভিত্তি হল সহানুভূতি। আমরা দেখেছি যে এই সহানুভূতিবোধটা হচ্ছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রবৃত্তিসমূহের অন্যতম। সহানুভূতি ব্যাপারটা একটা সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে অর্জিত হলেও, অনুশীলন ও অভ্যাসের দ্বারা তা আরও জোরদার হয়ে ওঠে। যেহেতু মানুষ মাত্রেই খোঁজে তার নিজের সুখ, তাই কোনও কাজ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তার প্রশংসা বা নিন্দাও নির্ভর করে সেই কাজ বা উদ্দেশ্য তাকে সুখ দিতে পারছে কি না, তার ওপরেই। আর সুখ যেহেতু সার্বজনীন মঙ্গলের এক অপরিহার্য উপাদান, তাই সর্বাধিক মানুষকে সুখী করতে পারার নীতিটা

সঠিক-বেঠিক নির্ধারণের একটা নিরাপদ মানদণ্ড হিসেবে পরোক্ষভাবে কাজ করে থাকে। মানুষের যুক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতা যত উন্নত হয় এবং যতই সে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, ততই ব্যক্তির চরিত্রের ওপর এবং সার্বজনীন মঙ্গলের ওপর কিছু-কিছু আচার-আচরণের সুদূরপ্রসারী ফলাফল তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন মানুষের এই উপলব্ধিপ্রসূত গুণগুলিকে জনমতের দ্বারা যাচাই করার অবস্থা সৃষ্টি হয়, সেগুলি প্রশংসা লাভ করে এবং তার বিপরীত ব্যাপারগুলিকে নিন্দা করে মানুষ। কিন্তু অনুন্নত জাতিগুলি প্রায়শই যুক্তি-প্রয়োগে ভুল করে থাকে, অনেক কুপ্রথা ও কুসংস্কারকেও তারা ওই ভুল যুক্তি দিয়ে বিচার করে। ফলে সেগুলি তাদের কাছে উচ্চ গুণের মর্যাদা পায় আর তা ভঙ্গ করাকে তারা দারুণ অপরাধ বলে মনে করে।

মননগত ক্ষমতার থেকে মানুষের নৈতিক গুণাবলীকে সঙ্গতভাবেই অধিক মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু মনে রাখা দরকার অতীতের স্মৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্মরণ করতে পারার ব্যাপারে মনের যে-শক্তি আছে, তা হচ্ছে বিবেকবোধের অন্যতম মৌলিক (যদিও গৌণ) বনিয়াদ। প্রতিটি মানুষের মননগত ক্ষমতাকে সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে সুশিক্ষিত ও উদ্দীপিত করে তোলার সবথেকে জোরদার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় এই ঘটনার মধ্যেই। কোনও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে যদি কিছুটা সামাজিক অনুভূতি ও সহানুভূতিবোধ থাকে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সে ভালো কাজই করার চেষ্টা করে এবং তার মধ্যে যথেষ্ট সংবেদনশীল বিবেকবোধও থাকতে পারে। তবে, যা-কিছু আমাদের কল্পনাকে আরও বিশদ করে তোলে এবং অতীতের স্মৃতিকে স্মরণ করায় ও আজকের ঘটনার সঙ্গে তার তুলনা করার অভ্যাসকে জোরদার করে তোলে, তা আমাদের বিবেকবোধকেও করে তোলে আরও সংবেদনশীল, আর এমনকী সামাজিক অনুভূতি ও সহানুভূতির ঘাটতিকেও কিছুটা পূরণ পারে।

মানুষের নৈতিক প্রকৃতি আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছতে পেরেছে অংশত তার যুক্তিপ্রয়োগের শক্তি উন্নত হওয়া এবং তার ফলস্বরূপ একটা যুক্তিসঙ্গত জনমত গড়ে ওঠার সাহায্যে। কিন্তু অভ্যাস, দৃষ্টান্ত, নির্দেশ ও চিন্তাভাবনার সাহায্যে তার সহানুভূতিবোধ আরও কোমল এবং আরও পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠাটা এর পিছনে আরও বড় কারণ হিসেবে কাজ করেছে। বিভিন্ন সদ্‌গুণসম্পন্ন প্রবণতাগুলি যদি মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ক্রিয়াশীল থাকে, তাহলে এক-সময় সেগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হতেও পারে। কোনও-এক সর্বদ্রষ্টা দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে সুসভ্য জাতিগুলি, আর এই বিশ্বাসটা তাদের নীতিবোধকে অনেক উন্নত করে তুলেছে। শেষ বিচারে মানুষ তার আশপাশের অন্যান্য লোকজনের প্রশংসা বা নিন্দাকে কার্যকলাপের একমাত্র পথপ্রদর্শক বলে মেনে নেয় না (যদিও এই প্রশংসা বা নিন্দার

প্রভাব থেকে প্রায় কেউই মুক্ত নয়), বরং তার পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে যুক্তিসম্মত প্রত্যয়। তখন সে নিজের বিবেকবোধ দিয়েই সবকিছু বিচার করে, পরিচালিত করে। তা সত্ত্বেও, নৈতিক বোধের প্রধান ভিত্তি বা উৎস হল সামাজিক প্রবৃত্তি, এবং সহানুভূতিবোধও এই প্রবৃত্তির অন্তর্গত। আর ঠিক নিম্নতর প্রাণীদের মতো মানুষও এইসব প্রবৃত্তি অর্জন করেছিল মূলত প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফতই।

অনেকেই বলে থাকেন যে মানুষ ও নিম্নতর প্রাণীদের মধ্যে সবথেকে পূর্ণাঙ্গ পার্থক্য হচ্ছে ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকা ও না-থাকা। তবে এই বিশ্বাসটা যে মানুষের সহজাত বা প্রবৃত্তিগত হতে পারে না, তা আমরা আগেই দেখেছি। আবার অন্যদিকে, সর্বব্যাপী কোনও-এক ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাসটা সারা পৃথিবী জুড়েই ছড়িয়ে আছে। আপাতভাবে এই বিশ্বাসটা গড়ে ওঠে মানুষের যুক্তিসম্মত চিন্তাভাবনার অগ্রগতির ফলে, এবং আরও বেশি করে তার কল্পনাশক্তি, কৌতূহল ও বিস্ময়বোধ বেড়ে ওঠার ফলে। ঈশ্বর-বিশ্বাসকে মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে দেখিয়ে যে অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, তা আমি জানি। কিন্তু এ যুক্তিটা একেবারেই অচল। তাহলে তো আমাদের বেশ কিছু নির্দয় ও ক্ষতিকর ভূত-প্রেতের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করতে হয়, কেননা কোনও মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের থেকে এইসব ভূত-প্রেতে বিশ্বাসটা আরও সার্বজনীন। দীর্ঘদিনের চর্চার মধ্যে দিয়ে মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত উন্নত না-হয়ে ওঠা পর্যন্ত কোনও সর্বব্যাপী ও মঙ্গলময় সৃষ্টিকর্তার ধারণা তার মাথায় আসেনি।

যাঁরা বিশ্বাস করেন নিম্নশ্রেণীর কোনও প্রাণী থেকে বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই উদ্ভব হয়েছে মানুষের, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করতে পারেন যে আত্মার অবিনশ্বরতা সংক্রান্ত ধারণার ক্ষেত্রে এটা কীভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। স্যর জে. লুবক দেখিয়েছেন, বর্বর জাতিগুলির মধ্যে এ-রকম কোনও সুস্পষ্ট ধারণার অস্তিত্ব নেই। তবে, আমরা দেখেছি বন্য মানুষদের আদিম বিশ্বাস থেকে আহরিত যুক্তিগুলি আমাদের প্রায় কোনও সাহায্যই করে না। অতি ক্ষুদ্র একটা কোষ থেকে বিবর্তিত হতে হতে বিকাশের ঠিক কোন্ পর্যায়ে এসে মানুষ এক অবিনশ্বর প্রাণীর মর্যাদা পেল, তা নির্ধারণ করা অসম্ভব এবং তা নিয়ে খুব কম জনেরই মাথাব্যথা আছে। তাছাড়া এই প্রশ্নটা নিয়ে মাথা থামিয়ে কোনও লাভও নেই, কেননা ধাপে ধাপে এগিয়ে-চলা জৈবিক শৃঙ্খলার বিশাল পরিধির মধ্যে ঠিক কখন ওই পর্যায়টা এসেছিল, তা নির্ধারণ করা সম্ভবও নয়।

আমি জানি এই গ্রন্থের সিদ্ধান্তগুলিকে অনেকেই চরম অধার্মিক ব্যাপার বলে মনে করবেন। কিন্তু এইসব সিদ্ধান্তকে যাঁরা অস্বীকার করবেন, তাঁদেরও প্রমাণ করতে হবে যে মানুষের জন্মকে সাধারণ জননক্রিয়ার ফল হিসেবে দেখানোর চেয়ে

কোনও নিম্নতর জৈবিক রূপ থেকে রূপান্তর ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে মানুষের উদ্ভব সংক্রান্ত ব্যাখ্যাটা কেন বেশি অধার্মিক ব্যাপার হিসেবে বিবেচিত হবে। কোনও প্রজাতি এবং তার প্রতিটি সদস্যের জন্মের প্রশ্নটা সেই সুদীর্ঘ ঘটনা-পরম্পরারই অঙ্গ, তাকে নিছক আকস্মিক কিছু সুযোগের ফল বলে মেনে নিতে আমরা রাজি নই। দৈহিক কাঠামোর প্রতিটি ছোটখাটো পরিবর্তন, বিবাহের মধ্য দিয়ে প্রতিটি নারী-পুরুষের মিলন, প্রতিটি শুক্রাণুর বিস্তার এবং এ-ধরনের অন্যান্য যাবতীয় ঘটনা আসলে কোনও-না-কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যই সাধন করে, আমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে তার কিছু যায়-আসে না। আর আমাদের প্রচলিত ধ্যানধারণা স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে রাজি হয় না।

যৌন নির্বাচন সম্বন্ধে অনেক কিছুই যে আজও অজানার কুয়াশায় ঢাকা, তা আমি জানি। তবু আমি গোটা ব্যাপারটা সম্বন্ধে যথাসম্ভব স্বচ্ছ একটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রাণীজগতের নিম্নতর ধাপগুলিতে এই যৌন নির্বাচনের প্রায় কোনও ভূমিকাই নেই। এইসব নিম্নতর প্রাণীরা অনেক সময় জীবনভর একই জায়গায় থেকে যায়, বা একই শরীরে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গই বিদ্যমান থাকে, কিংবা (যা আরও গুরুত্বপূর্ণ) তাদের উপলব্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তিগত ক্ষমতা এতটা উন্নত হয় না যা দিয়ে তারা ভালবাসা বা ঈর্ষা অনুভব করতে অথবা ভালো-মন্দ বাছাই করতে পারে। তবে, সন্ধিপদ ও মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে, এমনকী এই দুই বিরাট উপ-পর্বের নিম্নতম প্রাণীদের ক্ষেত্রেও, যৌন নির্বাচন এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জীবজগতের বড় বড় শ্রেণীগুলিতে, অর্থাৎ স্তন্যপায়ী, পক্ষী, সরীসৃপ, মাছ, কীটপতঙ্গ, এমনকী কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের (কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি) মধ্যেও স্ত্রী ও পুরুষের পার্থক্যগুলি প্রায় একইরকম। এদের সবার ক্ষেত্রেই পুরুষরাই সাধারণত প্রণয়প্রার্থী হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য শুধু তাদেরই শরীরে থাকে অস্ত্রের মতো ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন অঙ্গ। সাধারণত তারা নারীদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও আকারে বড় হয়, আর সেইসঙ্গে তাদের মধ্যে থাকে সাহস ও সংগ্রামপ্রিয় মেজাজ। গান গাওয়া বা শিস্ দেওয়ার ক্ষমতাও শুধু পুরুষদেরই থাকে বা অন্ততপক্ষে নারীদের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে থাকে। তাছাড়া পুরুষদের শরীরেই থাকে সুগন্ধ-উৎপাদক গ্রন্থি। নানা ধরনের অসংখ্য উপাঙ্গের অধিকারী হয় পুরুষরা, তাদের শরীরে দেখা যায় চোখ-জুড়োনো কিংবা অদ্ভুত ধরনের রঙের কারুকাজ, আর নারীরা থাকে এ-সব থেকে বঞ্চিত। আর যে-সব প্রজাতির প্রাণীদের স্ত্রী ও পুরুষের শারীরিক কাঠামোর মধ্যে আরও গুরুতর পার্থক্য থাকে, তাদের ক্ষেত্রেও শুধু পুরুষদের শরীরেই থাকে স্ত্রী-প্রাণীদের চিনে নেওয়ার মতো বিশেষ ইন্দ্রিয় আর সেইসঙ্গেই থাকে স্ত্রী-প্রাণীদের কাছে পৌঁছনোর উপযুক্ত সঞ্চরণ অঙ্গ, এমনকী সঙ্গিনীকে আঁকড়ে ধরার মতো বিশেষ অঙ্গও থাকে

কারও কারও মধ্যে। স্ত্রী-প্রাণীদের মোহিত করা বা করায়ত্ত করার এই উপাদানগুলি পুরুষ-প্রাণীদের শরীরে প্রায়শই বছরের বিশেষ একটা সময়ে, অর্থাৎ সঙ্গমের মরশুমে, সৃষ্টি হয়ে থাকে। অনেক সময় এগুলি স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যেও কমবেশি সঞ্চারিত হয়, তবে তাদের ক্ষেত্রে এগুলি একেবারেই প্রাথমিক দশায় থাকে। পুরুষ-প্রাণীদের নির্বীর্য করে দিলে তাদের এই উপাদানগুলি নষ্ট হয়ে যায় কিংবা আর কোনওদিনই তারা এগুলি অর্জন করতে পারে না। এইসব উপাদান কিন্তু অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় না, এগুলি তাদের শরীরে দেখা দেয় তারা জননক্ষম হয়ে ওঠার কিছুদিন আগে থেকে। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই প্রজাতির অল্পবয়সী স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীদের দেখতে অনেকটাই একরকম হয় এবং স্ত্রী-প্রাণীদের সঙ্গে তাদের সন্তানদের প্রচুর সাদৃশ্য থাকে। আবার, জীবজগতের প্রতিটা বড় বড় শ্রেণীর মধ্যেই কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনার সন্ধান মেলে। এইসব ক্ষেত্রে পুরুষদের বৈশিষ্ট্যগুলি কোনও কোনও স্ত্রী-প্রাণীর মধ্যে ফুটে উঠতে দেখা যায়। একেবারে ভিন্ন ভিন্ন এতরকম প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেকার পার্থক্যকে নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মের এই বিস্ময়কর সমরূপতাকে উপলব্ধি করা যায় এদের সকলকার মধ্যে একটা সাধারণ কারণের সক্রিয়তার কথা স্বীকার করে নিলে। এই কারণটাই হচ্ছে যৌন নির্বাচন।

কোনও প্রজাতির বংশবিস্তারের ব্যাপারে একই লিঙ্গভুক্ত সদস্যদের মধ্যে অন্যান্যদের চেয়ে কয়েকজনের বেশি সফল হওয়ার ওপরেই নির্ভর করে যৌন নির্বাচন। অন্যদিকে, প্রাকৃতিক নির্বাচন সর্বদাই নির্ভর করে জীবনযাপনের সাধারণ অবস্থার ব্যাপারে উভয় লিঙ্গের সদস্যদের সাফল্যের ওপর। যৌন নির্বাচন দু' ধরনের হয়ে থাকে : প্রথম ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের তাড়িয়ে দেওয়া বা হত্যা করার জন্য একই লিঙ্গভুক্ত সদস্যদের মধ্যে, সাধারণত পুরুষদের মধ্যেই, নির্বাচনটা ঘটে থাকে, আর মেয়েরা থাকে নিষ্ক্রিয় ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও সংগ্রামটা ঘটে একই লিঙ্গভুক্ত সদস্যদের মধ্যে, যার উদ্দেশ্য থাকে বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের, সাধারণত মেয়েদের, উত্তেজিত বা মোহিত করে তোলা, এবং মেয়েরাও তখন আর নিষ্ক্রিয় থাকে না, নিজেদের মনোমতো সঙ্গী বেছে নেয়। এই শেষোক্ত ধরনের নির্বাচনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে অন্য একটা ঘটনার, যেখানে মানুষ কোনও উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অথচ কার্যকরীভাবে তার গৃহপালিত জীবজন্তুদের মধ্যে একটা নির্বাচন ঘটিয়ে থাকে। এই নির্বাচনের ঘটনাটা তখনই ঘটে, যখন মানুষ তার গৃহপালিত জীবজন্তুর বংশধরদের মধ্যে কোনও পরিবর্তন ঘটানোর কথা না ভেবেই দীর্ঘদিন ধরে কোনও প্রজাতির সবথেকে চমৎকার বা সবথেকে উপযোগী প্রাণীদের পুষে রেখে দেয়।

যৌন নির্বাচন মারফত স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীরা যে-সব বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, তা তাদের নিজ লিঙ্গের বা উভয় লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে কি না এবং

কোন্ বয়সে তাদের মধ্যে এইসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে—সেটা নির্ধারিত হয়ে থাকে বংশগতির নিয়মের সাহায্যে। দেখা গেছে কোনও প্রাণীর জীবনের উত্তরপর্বে যে-সব পরিবর্তন তার মধ্যে ফুটে ওঠে, সেগুলি সাধারণত তার নিজ লিঙ্গের উত্তরপুরুষদের মধ্যেই (পুরুষ হলে পুরুষ-সন্তানদের মধ্যে, স্ত্রী হলে স্ত্রী-সন্তানদের মধ্যে) সঞ্চারিত হয়। নির্বাচনক্রিয়ার আবশ্যিক বনিয়াদ পরিবর্তনশীলতা এবং এই পরিবর্তনশীলতা পুরোপুরিভাবেই নির্বাচন-নিরপেক্ষ। এর কারণ হল এই যে, প্রজাতির বংশবিস্তারের ব্যাপারে একই ধরনের পরিবর্তনগুলি প্রায়শই যৌন নির্বাচন মারফত অর্জিত হয়েছে বা তাকে কাজে লাগিয়েছে, আবার জীবনের বিভিন্ন সাধারণ উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তা অর্জিত হয়েছে প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত। তাই কোনও লিঙ্গের গৌণ বৈশিষ্ট্যগুলি যখন উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সমানভাবে সঞ্চারিত হয়ে যায়, তখন এইসব বৈশিষ্ট্যকে অন্যান্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির থেকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায় কেবলমাত্র তুলনার সাহায্যেই। যৌন নির্বাচন মারফত অর্জিত পরিবর্তনগুলি প্রায়শই এত সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে যে একই প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীদের পৃথক পৃথক প্রজাতির বা পৃথক পৃথক বর্গের প্রাণী বলে মনে হয়। এই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত পার্থক্যগুলি নিশ্চয়ই কোনও-না-কোনওভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর আমরা তো জানিই যে এইসব পরিবর্তন অর্জন করার জন্য তাদের নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তো বটেই, এমনকী মুখোমুখি হতে হয়েছে অনেক বিপদেরও।

যৌন নির্বাচনের শক্তি সংক্রান্ত বিশ্বাসটা গড়ে উঠেছে মূলত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ভিত্তিতে। কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য যে-কোনও একটা লিঙ্গের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকে আর এ থেকেই বোঝা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি জননক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অসংখ্য ঘটনায় দেখা গেছে যে এইসব বৈশিষ্ট্য পুরোপুরিভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে বয়ঃপ্রাপ্তির পর, এবং প্রায়শই বছরের একটা বিশেষ সময়ে, অর্থাৎ সঙ্গমের মরশুমে। প্রেম-নিবেদনের ব্যাপারে অধিকতর অগ্রণী ভূমিকা পুরুষরাই নিয়ে থাকে (কিছু কিছু ব্যতিক্রম অবশ্য আছেই)। তারা বেশি শক্তিমান তো বটেই, তাছাড়াও নানা দিক থেকে তারা অনেক বেশি আকর্ষণীয়ও। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে মেয়েরা সামনে থাকলে পুরুষরা তাদের সৌন্দর্যকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অত্যন্ত সচেষ্ট হয়ে ওঠে। তাছাড়া, সঙ্গমের মরশুম বাদে অন্য সময়ে কিন্তু তারা এভাবে নিজেদের আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করে না বা বড়জোর কালে-ভদ্রে করে থাকে। এইসব ব্যাপারকে একেবারেই উদ্দেশ্যহীন কাণ্ডকারখানা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শেষত, কিছু কিছু চতুষ্পদ প্রাণী ও পাখিদের মধ্যে একটি লিঙ্গের সদস্যরা যে অপর লিঙ্গের কিছু সদস্যের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ কিংবা বিশেষ পক্ষপাতিত্ব অনুভব করতে পারে, তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

এইসব তথ্যকে মাথায় রেখে এবং গৃহপালিত জীবজন্তু ও চাষ-করা গাছপালার ক্ষেত্রে মানুষের দ্বারা সংঘটিত অসচেতন নির্বাচনের সুস্পষ্ট ফলাফলগুলির কথা বিবেচনা করে আমি এ-ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত হয়েছি যে কোনও-একটি লিঙ্গের সদস্যরা যদি বেশ কিছু প্রজন্ম ধরে বিপরীত লিঙ্গের কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে চলে, তাহলে তাদের সন্তানদের মধ্যেও ধীরে ধীরে অথচ সুনিশ্চিতভাবে ফুটে উঠবে ওই বৈশিষ্ট্যগুলি। আমি এ-কথা গোপন করার চেষ্টা করিনি যে (একমাত্র যেখানে নারীদের চেয়ে পুরুষদের সংখ্যা অনেক বেশি অথবা যেখানে পুরুষদের বহুবিবাহ চালু আছে, সে-সব ক্ষেত্র বাদে) কম আকর্ষণীয় পুরুষদের চেয়ে অধিকতর আকর্ষণীয় পুরুষরা কীভাবে নিজেদের বিভিন্ন চমৎকার বৈশিষ্ট্য বা অন্যান্য মোহিনীশক্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে অনেক বেশি সংখ্যক সন্তান-সন্ততি রেখে যেতে পারে, তা খুব-একটা স্পষ্ট নয়। তবে আমি দেখিয়েছি যে এর কারণটা সম্ভবত নারীদের মধ্যেই নিহিত থাকে, এবং মূলত অধিক প্রাণশক্তিসম্পন্না নারীদের মধ্যেই, যারা অন্যদের থেকে আগেই সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম। আসলে এইসব নারীরা বেছে নেয় সেইসব পুরুষদেরই যারা অধিকতর আকর্ষণীয় তো বটেই, সেইসঙ্গেই অধিক প্রাণশক্তিসম্পন্ন এবং জীবনযুদ্ধে জয়ীর আসনেও অধিষ্ঠিত। পাখিরা (যেমন অস্ট্রেলিয়ার নিকুঞ্জ পাখিরা) যে উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট ও সৌন্দর্যময় জিনিস পছন্দ করে আর তারা যে গান গাওয়ার ক্ষমতাকে যথেষ্ট মূল্য দেয়, তার কিছু নির্দিষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তা সত্ত্বেও আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে বেশ কিছু জাতের পাখি এবং কয়েক ধরনের স্তন্যপাখী প্রাণীর নারীদের মধ্যে মনোহর অঙ্গসজ্জার প্রতি দারুণ আকর্ষণ থাকাটা (যাকে যৌন নির্বাচনের ফল হিসেবেই ধরে নেওয়া যায়) বেশ বিস্ময়কর। সরীসৃপ, মাছ এবং কীট-পতঙ্গদের ক্ষেত্রে এ-ব্যাপারটা আরও বিস্ময়জনক। তবে, নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের মনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা জানি! যেমন, পুরুষ জাতীয় বার্ড অফ প্যারাডাইস (সুন্দর ডানাওয়ালা জাতীয় পাখি) বা ময়ূররা যে একেবারে বিনা উদ্দেশ্যেই বিপুল কষ্ট স্বীকার করেও স্ত্রী-পাখিদের সামনে নিজেদের পেখম খাড়া করে ছড়িয়ে দেয় ও নাচতে থাকে, তা মোটেই বিশ্বাস্য নয়। বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ কর্তৃক উল্লেখিত একটা বিষয়ের কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। তাঁরা বলেছেন, কাঙ্ক্ষিত পুরুষটিকে না পেলে অনেক ময়ূরী পুরো একটা মরশুম সঙ্গীহীন অবস্থায় কাটিয়ে দেয়, তবু অন্য কোনও ময়ূরের সঙ্গে জোড় বাঁধে না।

তা সত্ত্বেও, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের ইতিকথায় আমার জানা সবথেকে আশ্চর্যজনক ঘটনা হল আর্গাস-ফেজ্যান্ট জাতীয় পুরুষ-পাখিদের ডানার পালকের মনোরম নকশা ও চক্রাকার অঙ্গসজ্জার আলো-ছায়াময় বর্ণচ্ছটা সম্বন্ধে স্ত্রী-পাখিদের তীব্র প্রীতি।

যাঁরা মনে করেন এই জাতীয় পুরুষ-পাখিরা তাদের সৃষ্টির সময় থেকেই এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল, তাঁদের অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে—যে-বড় বড় পালকগুলি তাদের ডানাকে ওড়ার কাজে সাহায্য করে না এবং যেগুলি একমাত্র এই প্রজাতির পাখিদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রেমনিবেদনের সময় বিচিত্রভাবে প্রদর্শিত হয়ে থাকে, সেই পালকগুলি তারা পেয়েছিল অঙ্গসজ্জা হিসেবেই। তাই যদি হয়, তাহলে সেইসঙ্গে তাঁদের এ-ও স্বীকার করে নিতে হবে যে ওই প্রজাতির স্ত্রী-পাখিরাও একেবারে প্রথম থেকেই এই ধরনের অঙ্গসজ্জাকে মূল্য দেওয়ার ক্ষমতা নিয়েই সৃষ্টি হয়েছিল। আমার আপত্তি শুধু একটা জায়গাতেই। আমি মনে করি, আর্গাস-ফেজ্যান্ট জাতীয় পুরুষ-পাখিরা তাদের সৌন্দর্য অর্জন করেছে ক্রমান্বয়ে এবং বহু প্রজন্ম ধরে স্ত্রী-পাখিরা সুন্দরতর অঙ্গসজ্জাবিশিষ্ট পুরুষদের পছন্দ করার ফলেই তা ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে। স্ত্রী-পাখিদের এই সৌন্দর্যচেতনা ক্রমান্বয়ে উন্নত হয়ে উঠেছে অনুশীলন বা অভ্যাস মারফত—ঠিক আমাদের রুচিবোধের মতোই। পুরুষ-পাখিদের শরীরের কয়েকটি পালক ঘটনাচক্রে অপরিবর্তিত রয়ে গেলে দেখা যায় তার একদিকের কিছু ফিকে দাগ ধীরে ধীরে চমৎকার অঙ্গসজ্জায় পরিণত হতে পারে, এবং সম্ভবত এভাবেই তাদের শরীরের অঙ্গসজ্জাগুলি সৃষ্টি হয়েছিল।

যাঁরা বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করেও এটা মেনে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, সরীসৃপ ও মাছেদের স্ত্রী-প্রাণীরা তাদের নিজ নিজ প্রজাতির পুরুষদের সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার মতো রুচি অর্জন করতে পারে (যে-রুচির সঙ্গে আমাদের রুচিও প্রায়শই মিলে যায়), তাঁদের একটু ভেবে দেখতে বলব যে মেরুদণ্ডী শ্রেণীর উচ্চতম প্রাণী থেকে শুরু করে নিম্নতম প্রাণী পর্যন্ত সকলেরই মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ গড়ে উঠেছে এই মেরুদণ্ডী শ্রেণীর আদি সাধারণ পূর্বপুরুষের কাছ থেকেই। এই দিক থেকে বিচার করলে বোঝা যায় কীভাবে কতকগুলি মানসিক ক্ষমতা বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তুর মধ্যে প্রায় একইভাবে ও একই মাত্রায় গড়ে উঠতে পেরেছে।

যৌন নির্বাচনের নীতিকে যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁরা এই উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে স্নায়ুতন্ত্র শুধু অধিকাংশ শারীরিক কার্যকলাপকেই নিয়ন্ত্রণ করে না, সেইসঙ্গেই শরীরের বিভিন্ন গঠন-কাঠামোর এবং কিছু কিছু মানসিক ক্ষমতার বিকাশকেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। সাহস, যুদ্ধপ্রিয়তা, ধৈর্য, শারীরিক শক্তি ও আয়তন, সব ধরনের হাতিয়ার, সাঙ্গীতিক অঙ্গ (গান গাওয়া ও শিস্ দেওয়া উভয়েরই), উজ্জ্বল বর্ণ এবং অঙ্গসজ্জামূলক উপাঙ্গ—এই সবকিছুই কোনও-একটি লিঙ্গের সদস্যরা পরোক্ষভাবে অর্জন করেছে পছন্দ-অপছন্দের প্রয়োগ, ভালবাসা ও ঈর্ষার প্রভাব এবং ধ্বনি, বর্ণ বা আকারের ব্যাপারে সুন্দরকে চিনে নিতে পারার

সাহায্যে। আর মনের এইসব ক্ষমতা স্পষ্টতই নির্ভর করে মস্তিষ্কের বিকাশের ওপর।

গৃহপালিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও কুকুরদের মধ্যে যৌনমিলন ঘটানোর আগে মানুষ তাদের প্রকৃতি ও বংশবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিস্তর খোঁজখবর নেয়। কিন্তু নিজেদের বিবাহের ক্ষেত্রে তারা খুব কম সময়েই এ-রকম যত্ন নেয় বা আদৌ নেয় না। প্রকৃতির কোলে স্বাধীন অবস্থায় থাকার সময় জোড়-বাঁধার ব্যাপারে নিম্নতর প্রাণীরা যে-প্রেরণার দ্বারা চালিত হয়, বিবাহের ব্যাপারে মানুষও চালিত হয় প্রায় সেই একই প্রেরণার দ্বারা—যদিও সে ওইসব প্রাণীদের থেকে উন্নত, কেননা মানসিক আকর্ষণ ও গুণকে সে বিপুল মূল্য দিয়ে থাকে। অন্যদিকে, সম্পদ বা সামাজিক মর্যাদাও মানুষকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। তবুও, উপযুক্ত সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচন করতে পারলে সে তার সন্তানদের শারীরিক গঠন ও কাঠামোকে উন্নত করতে পারে তো বটেই, সেইসঙ্গেই উন্নত করতে পারে তাদের মননগত ও নৈতিক গুণাবলীকেও। শারীরিক বা মানসিকভাবে যথেষ্ট অক্ষম নারী বা পুরুষদের বিবাহ করা উচিত নয়। কিন্তু তাই বলে তারা যে সত্যিসত্যিই বিবাহ করা থেকে বিরত থাকবে, এমনটা আশা করা নেহাতই আকাশকুসুম কল্পনা, এবং বংশগতির নিয়মকে পুরোপুরিভাবে না-জানলে এই আশা কোনওদিনই আংশিকভাবেও বাস্তবায়িত হবে না। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা সমাজের মঙ্গলই করে চলেছেন। সন্তানের জন্ম দেওয়া এবং বংশগতির নিয়মকে ভালোভাবে বুঝতে পারলে আমাদের অজ্ঞ আইনপ্রণেতারা আর রক্তসম্পর্কযুক্ত নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর কি না, তা নির্ধারণ করার প্রচেষ্টাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না।

কীভাবে মানবজাতির আরও বেশি মঙ্গল করা যায়, তা এক জটিল সমস্যা। যারা নিজেদের সন্তানদের চরম দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারবে না, তাদের কারুরই বিবাহ করা উচিত নয়। কারণ দারিদ্র্য শুধু একটা দারুণরকম ক্ষতিকর ব্যাপারই নয়, সেইসঙ্গেই দেখা যায় দারিদ্র্য যতই বেড়ে চলে, বিবাহের ব্যাপারে মানুষও ততই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, মিঃ গ্যাল্টন যেমন বলেছেন, দূরদর্শী ব্যক্তিরা যদি বিবাহ করা থেকে বিরত থাকে আর বেপরোয়ারা বিবাহ করে চলে, তাহলে একসময় সমাজের উৎকৃষ্টতর সদস্যদের চেয়ে নিকৃষ্টতরদের সংখ্যা বেশি হয়ে যেতে পারে। অন্য সব জীবজন্তুর মতো মানুষও আজকের উন্নত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের পথ বেয়েই, যে-সংগ্রাম ছিল মানুষের সংখ্যা দ্রুত হারে বেড়ে চলারই অনিবার্য পরিণাম। মানুষ যদি আরও উন্নত হতে চায়, তাহলে তাকে এক ভয়ংকর সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলতে হবে। নাহলে সে ক্রমে ক্রমে শ্রমবিমুখ হয়ে পড়বে এবং অধিকতর গুণসম্পন্ন মানুষরা জীবনযুদ্ধে

কম গুণসম্পন্ন মানুষদের থেকে বেশি সাফল্যও অর্জন করতে পারবে না। তাই মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির স্বাভাবিক হারকে (তার বেশ কিছু সুস্পষ্টভাবে ক্ষতিকর দিক থাকলেও) কোনওভাবেই ভীষণরকম কমিয়ে দেওয়া উচিত নয়। সমস্ত মানুষেরই অবাধ প্রতিযোগিতার অধিকার পাওয়া উচিত, আর যোগ্যতম ব্যক্তিদের জীবনযুদ্ধে সবথেকে সফল হওয়া এবং সবথেকে বেশি সংখ্যক সন্তান-সন্ততি রেখে যাওয়ার পথে কোনও আইনগত বা রীতিপ্রথামূলক প্রতিবন্ধকও স্থাপন করা উচিত নয়। অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণই ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মানবপ্রকৃতির উচ্চতম অংশের ওপর আরও কিছু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। কেননা মানুষের নৈতিক গুণাবলী প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ততটা অগ্রসর হয়নি, যতটা অগ্রসর হয়েছে অভ্যাস, যুক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতা, নির্দেশ, ধর্ম ইত্যাদির প্রভাবের সাহায্যে। অবশ্য মানুষের নীতিবোধের বিকাশের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে যে-সামাজিক প্রবৃত্তি, তা গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফতই—এ-কথা অনস্বীকার্য।

কোনও নিম্নতর জৈবিক রূপ থেকে ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে মানুষ—এটাই এ-গ্রন্থের মূল সিদ্ধান্ত। কিন্তু, দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হচ্ছে, এ-সিদ্ধান্ত অনেকেই ঠিক মন থেকে মেনে নিতে পারবেন না। তা সত্ত্বেও, আমরা যে বর্বরদের থেকেই উদ্ভূত হয়েছি, তাতে কোনও সন্দেহই নেই। এক জঙ্গলাকীর্ণ ও ভাঙাচোরা সমুদ্রতটে একদল ফুজিয়ানকে প্রথম দেখার সময় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম আমি, সে-স্মৃতি আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না। ওই ফুজিয়ানদের দেখামাত্রই আমার মধ্যে যে-চিন্তাটা ঝলক দিয়ে উঠেছিল তা হচ্ছে—এ-রকমই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষরা! ওই লোকগুলি ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন, সর্বাঙ্গে রঙ দিয়ে আঁকা নকশা, জট-পড়া দীর্ঘ চুল, মুখে উত্তেজনার ছাপ, চাউনিতে হিংস্রতা, বিস্ময় এবং অবিশ্বাসের ছোঁয়া। প্রায় কোনওরকম কলাকৌশলই জানা ছিল না তাদের। যা-কিছু শিকার করত, তাই দিয়েই জীবনধারণ করত বন্য জীবজন্তুদের মতো। তাদের কোনও শাসনব্যবস্থা বা সরকার ছিল না এবং নিজেদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বাইরের সকলকার প্রতিই তারা ছিল একান্ত নির্মম। কোনও বন্য মানুষকে তার নিজের বাসভূমিতে দেখলে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, কেননা মনে রাখা দরকার আরও নিম্নতর কোনও জীবের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তার শিরায় শিরায়। সেই ছোট্ট বীর বানরটি, যে তার প্রতিপালকের জীবন রক্ষা করার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিল এক ভয়ংকর দুশমনের সামনে, কিংবা সেই বৃদ্ধ বেবুনটি, যে পাহাড় থেকে নেমে এসে একপাল বিস্মিত কুকুরের মাঝখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল নিজের তরুণ সাথীকে—এদের থেকে উদ্ভূত হয়েছি বলতে আমি যতটা গর্ববোধ করি, ততটা গর্ব আমি অনুভব করি

না কোনও বন্য মানুষের থেকে সৃষ্টি হয়েছি বলতে, যে-মানুষটি তারা শত্রুদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে উৎফুল্ল হয়, রক্তরঞ্জিত বলি দিয়ে উল্লসিত হয়, অনুশোচনাহীনভাবে চালিয়ে যায় শিশুহত্যা, নিজের স্ত্রীদের সঙ্গে ক্রীতদাসীর মতো আচরণ করে, যার ব্যবহারে কোনওরকম নম্রতা নেই এবং যে নানান কুসংস্কারে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

নিজের প্রচেষ্টায় না হলেও, জৈবিক-পরম্পরার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করার জন্য মানুষ কিছুটা গর্ব নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারে। সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে মানুষ এই শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল না, ধাপে ধাপে সে উঠে এসেছে এখানে। এই ঘটনাটা তাকে সুদূর ভবিষ্যতে আরও উঁচুতে ওঠার আশা জোগাতে পারে। কিন্তু এখানে আমরা আশা বা আশঙ্কা নিয়ে আলোচনা করছি না, আলোচনা করছি আমাদের যুক্তির পরিসরে আবিষ্কৃত সত্যটুকু নিয়ে। আমার সাধ্যমতো প্রমাণ উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে। তবে, আমার মতে, এ-কথা অনস্বীকার্য যে মানুষের যাবতীয় মহৎ গুণ সত্ত্বেও, চরম হীন অবস্থায় থাকা ব্যক্তিদের জন্য তার সহানুভূতি, অন্যান্য মানুষের প্রতি এবং এমনকী নিম্নতম শ্রেণীর প্রাণীদের প্রতিও তার সদাশয়তা, তার আকাশছোঁয়া মননশক্তি যা সৌরজগতের গতিপ্রকৃতিকেও আয়ত্ত করতে শুরু করছে—এইসব সুউন্নত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, মানুষের শারীরিক কাঠামোয় আজও রয়ে গেছে কোনও নিম্নতর জীব থেকে উদ্ভূত হওয়ার অনপনেয় ছাপ।

ডিসেন্ট অফ ম্যান

দ্বিতীয় খণ্ড ❑ দ্বিতীয় ভাগ

❑ সংযোজন ❑

বানরদের ক্ষেত্রে যৌন নির্বাচন প্রসঙ্গে

সংযোজন

বানরদের ক্ষেত্রে যৌন নির্বাচন প্রসঙ্গে

(নেচার, ২ নভেম্বর ১৮৭৬, পৃঃ ১৮ থেকে গৃহীত)

'ডিসেন্ট অফ ম্যান' গ্রন্থে যৌন নির্বাচন প্রসঙ্গে আলোচনা করার সময় যে-ঘটনাটি আমাকে সবথেকে বেশি আকৃষ্ট এবং বিমূঢ় করেছিল তা হচ্ছে কয়েক ধরনের বানরদের পশ্চাদ্দেশের ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের উজ্জ্বল রঙ। একটি লিঙ্গের সদস্যদের তুলনায় অন্য লিঙ্গের সদস্যদের এই অঞ্চলগুলোর রঙ উজ্জ্বলতর বলে এবং সঙ্গমের মরশুমে এই রঙটা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বলে আমি অনুমান করেছিলাম—যৌন আকর্ষণের উপাদান হিসেবেই এই রঙটা অর্জন করেছে তারা। এই কথাটা বলে আমি যে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলছি, তা আমি জানতাম। কিন্তু কোনও ময়ূরের চমৎকার পুচ্ছ প্রদর্শনের থেকে কোনও বানরের উজ্জ্বল-লাল পশ্চাদ্দেশ প্রদর্শন কোনও অর্থেই বেশি বিস্ময়কর নয়। তবে প্রেমনিবেদনের সময় বানররা যে তাদের শরীরের এই অংশটা প্রদর্শন করে, তার স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ তখন আমার হাতে ছিল না। পাখিরা এইভাবে নিজেদের কিছু অঙ্গসজ্জা প্রদর্শন করে। স্ত্রী-প্রাণীদের আকৃষ্ট অথবা উত্তেজিত করার ব্যাপারে এই অঙ্গসজ্জাগুলো যে পুরুষ-প্রাণীদের কাজে লাগে, এটা তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি 'Der Zoologische Garten' পত্রিকার এপ্রিল ১৮৭৬ সংখ্যায় গোথার অধিবাসী জো ফন ফিশার-এর লেখা একটি প্রবন্ধ পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। বিভিন্ন আবেগের অভিঘাতে বানরদের অভিব্যক্তি কেমন হয়, তা নিয়েই প্রবন্ধটি লেখা। এ-বিষয়ে উৎসাহী প্রত্যেকেরই প্রবন্ধটি পড়া উচিত। প্রবন্ধটি পড়লে বোঝা যায় এর লেখক একজন সতর্ক ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন পর্যবেক্ষক। একটি অল্পবয়সী পুরুষ-ম্যান্‌ড্রিল যখন নিজেকে প্রথম আয়নায় দেখেছিল, তখন তার অভিব্যক্তির বর্ণনা আছে প্রবন্ধটিতে। আয়নায় কিছুক্ষণ নিজেকে দেখার পর পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে নিজের লাল পশ্চাদ্দেশটি আয়নার দিকে মেলে ধরেছিল সে। হের জে. ফন ফিশারের কাছে চিঠি লিখে আমি জানতে চেয়েছিলাম ম্যান্‌ড্রিলটির এই অদ্ভুত আচরণের অর্থ কী বলে তিনি মনে করেন। উত্তরে আমাকে দু'টি দীর্ঘ চিঠি দিয়েছেন তিনি। নতুন ও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যে ঠাসা এই চিঠি দু'টি কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হবে বলে আমি আশা করি। তিনি

জানিয়েছেন, ম্যান্‌ড্রিলটির ওই আচরণ দেখে তিনি নিজেও প্রথমটায় রীতিমতো বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিপালিত বিভিন্ন প্রজাতির অন্য কিছু বানরের ওপর পরীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। পরীক্ষার দেখা যায় যে শুধু ম্যান্‌ড্রিলরাই (cynocephalus mormon) নয়, ড্রিল (C. leucophaeus) এবং অন্য তিন ধরনের বেবুনরা (C. hamadrayas, sphinx এবং babouin), সেইসঙ্গে সাইনোপিথেকাস নাইগার, ম্যাকাকাস রিসাস এবং নেমেস্ট্রিনাস প্রজাতির বানররাও খুশি হলে তাদের পশ্চাদ্দেশটি (এই সব প্রজাতির বানরদেরই শরীরের এই অংশটি কম-বেশি উজ্জ্বল রঙের হয়) তাঁর দিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং অন্য মানুষদের অভিনন্দন জানানোর জন্যও একই কাজ করে। তাঁর বাড়িতে পাঁচ বছর ধরে প্রতিপালিত ম্যাকাকাস রিসাস প্রজাতির একটি বানরের এই অশোভন অভ্যাসটা দূর করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেন তিনি এবং শেষ পর্যন্ত সফল হন। নতুন কোনও বানরকে প্রথমবার দেখার সময়েও এই বানররা একই কাজ করে আর সেইসঙ্গে দাঁত খিঁচোয়, আবার পুরনো বানর-বন্ধুদের সঙ্গেও এ-রকম আচরণ প্রায়শই করে থাকে তারা। সদ্য-পরিচিত বানররা এইভাবে পরস্পরকে পশ্চাদ্দেশ প্রদর্শনের পর একসঙ্গে খেলতে শুরু করে দেয়। উপরোক্ত অল্পবয়সী ম্যান্‌ড্রিলটি কিছুদিন পর থেকে তার প্রভু ফন ফিশারকে নিজের পশ্চাদ্দেশ প্রদর্শনের ব্যাপারটা বন্ধ করে দেয়, কিন্তু অপরিচিত মানুষ আর নতুন বানরদের প্রতি এই আচরণ সে করেই চলে। সাইনোপিথেকাস নাইগার প্রজাতির একটি অল্পবয়সী বানর মাত্র একবার ছাড়া আর কখনও তার প্রভুর সঙ্গে এ-রকম আচরণ করেনি, কিন্তু অপরিচিতদের সঙ্গে এ-রকম আচরণ সে প্রায়শই করত এবং আজও তার সে-অভ্যাস অপরিবর্ততই আছে। এ থেকে ফন ফিশার এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে আয়নার সামনে যে-সব বানররা এ-রকম আচরণ করে (ম্যান্‌ড্রিল, ড্রিল, সাইনোপিথেকাস নাইগার, ম্যাকাকাস রিসাস এবং নেমেস্ট্রিনাস), তারা আসলে আয়নায় নিজেদের প্রতিচ্ছবিকে কোনও অপরিচিত বানর বলেই মনে করে। অন্যান্য প্রজাতির বানরদের থেকে ম্যান্‌ড্রিল এবং ড্রিল প্রজাতির বানররা, যাদের পশ্চাদ্দেশ বিশেষরকম উজ্জ্বল, অনেক বেশি করে এবং অনেক জাঁকালো ভাবে নিজেদের পশ্চাদ্দেশ প্রদর্শন করে থাকে, এমনকী নিতান্ত অল্প বয়সেও। এদের পরেই নাম করতে হয় সাইনোসেফ্যালাস হামাড্রিয়াস প্রজাতির বানরদের। অন্যান্য প্রজাতির বানরদের এ-অভ্যাস এদের তুলনায় অনেক কম। তবে একই প্রজাতির বিভিন্ন বানরের মধ্যেও এ-ব্যাপারে কিছু তারতম্য লক্ষ করা যায়। অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির কিছু বানর কখনোই তাদের পশ্চাদ্দেশ প্রদর্শন করে না। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, যে-সব জাতির বানরদের পশ্চাদ্দেশে কোনও রঙ নেই, তাদের কখনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পশ্চাদ্দেশ প্রদর্শন করতে

দেখেননি ফন ফিশার। এদের মধ্যে আছে ম্যাকাকাস সাইনোমোল্‌গাস এবং সার্কোসেবুস রেডিয়েটাস প্রজাতির) যাদের সঙ্গে ম্যাকাকাস রিসাস প্রজাতির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে) বেশ কিছু বানর, সার্কোপিথেকাসদের তিনটি প্রজাতি এবং বেশ কিছু আমেরিকান বানর। পুরনো কোনও বন্ধু অথবা কোনও সদ্য-পরিচিতকে স্বাগত জানানোর জন্য পশ্চাদ্দেশ ঘুরিয়ে ধরার এই অভ্যাসটা আমাদের চোখে খুব বিসদৃশ লাগলেও বন্য দশার বেশ কিছু মানবগোষ্ঠীর অভ্যাসের তুলনায় এ-অভ্যাস এমন-কিছু বিসদৃশ নয়। বন্য দশার অনেক গোষ্ঠীর লোকেরা কাউকে স্বাগত জানানোর জন্য হাত দিয়ে নিজেদের পেট ঘষে কিংবা পরস্পরের নাকে নাক ঠেকিয়ে ঘষতে থাকে। ম্যান্‌ড্রিল ও ড্রিল প্রজাতির বানরদের এই অভ্যাসটা খুব সম্ভবত সহজাত প্রবৃত্তিমূলক কিংবা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, কারণ তা না হলে এদের নিতান্ত অল্পবয়সী সদস্যদের মধ্যে অভ্যাসটা দেখা যেত না। তবে অন্য অনেক প্রবৃত্তির মতো এই প্রবৃত্তিটাও সুদীর্ঘ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে পরিবর্তিত অথবা পরিচালিত হয়, কারণ ফন ফিশার জানিয়েছেন যে পশ্চাদ্দেশটা পুরোপুরিভাবে মেলে ধরার জন্য বিস্তর মেহনত করে এরা। দর্শক হিসেবে সামনে দু'জন থাকলে এরা তার দিকেই পশ্চাদ্দেশটা ঘুরিয়ে ধরে যে তাদের দিকে বেশি মনোযোগ দেয়।

এই অভ্যাসের উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে ফন ফিশার বলেছেন যে তাঁর বানরগুলি তাদের নগ্ন পশ্চাদ্দেশে আদর বা কোমল চাপড় পেতে ভালবাসে এবং তা পেলে খুশিতে ঘোঁত্‌ঘোঁত্ করে। পশ্চাদ্দেশের কোনও ধুলো বা নোংরা তুলে দেবার জন্যও মাঝেমাঝে অন্য বানরদের দিকে নিজেদের পশ্চাদ্দেশটা ঘুরিয়ে ধরে এরা। ফুটে-যাওয়া কোনও কাঁটা তুলে দেওয়ার জন্যও যে তারা একই কাজ করবে, সেটা ধরেই নেওয়া যায়। তবে প্রাপ্তবয়স্ক বানরদের এ-ধরনের আচরণের মধ্যে কিছুটা যৌন অনুভূতিও থাকে। কাচের দরজার আড়াল থেকে সাইনোপিথেকাস নাইগার প্রজাতির একটি স্ত্রী-বানরকে লক্ষ করেছিলেন ফন ফিশার। কয়েকদিন ধরেই স্ত্রী-বানরটি 'undrehte und dem Mannchen mit gurgelnden Tonen die stark gerothete Sitzflache zeigte, was ich fruher vie an diesem Thier bemerkt hatte. Beim Anblick dieses Gegenstandes erregte sich das Mannchen sichtlich, denn es polterte heftig an den Staben, ebenfalls gurgelnde Laute ausstossend.' ফন ফিশারের মতে, যে-সব প্রজাতির বানরদের পশ্চাদ্দেশ কম-বেশি উজ্জ্বল রঙের, তারা সকলেই খোলামেলা পাহাড়ি অঞ্চলে বাস করে। এ থেকে তিনি অনুমান করেছেন যে এই রঙটা আসলে একটি লিঙ্গের সদস্যদের অন্য লিঙ্গের সদস্যরা যাতে দূর থেকে চিনে নিতে পারে, সেই কাজেই সাহায্য করে। কিন্তু বানররা রীতিমতো যূথচর প্রাণী, ফলে তাদের পক্ষে দূর থেকে পরস্পরকে চিনে নেওয়ার তেমন-কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার মতে,

তাদের মুখের অথবা পশ্চাদ্দেশের কিংবা ম্যান্‌ড্রিলদের ক্ষেত্রে এই উভয় অংশেরই উজ্জ্বল রঙটা আসলে এক ধরনের যৌন অঙ্গসজ্জা ও আকর্ষণ হিসেবেই কাজ করে থাকে। আমরা জেনেছি যে অন্য বানরদের দিকে নিজেদের পশ্চাদ্দেশ ঘুরিয়ে ধরায় অভ্যাস বানরদের আছে। কাজেই তাদের শরীরের ওই অংশটা যে কম-বেশি চাকচিক্যময় বা অলংকৃত হবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এখনও পর্যন্ত আমরা যতদূর জানি তাতে দেখা যাচ্ছে—যে-সব বানরদের পশ্চাদ্দেশ উজ্জ্বল রঙের শুধু তারাই অন্য বানরদের স্বাগত জানানোর জন্য নিজেদের পশ্চাদ্দেশ ঘুরিয়ে ধরে। এ থেকে একটা সংশয় দেখা দেয়। সংশয়টা হল—এরা কি প্রথমে অন্য কোনও কারণে এই অভ্যাসটা অর্জন করেছিল এবং পরে তাদের শরীরের ওই অংশটা যৌন অঙ্গসজ্জা হিসেবে বর্ণময় হয়ে উঠেছে, নাকি ওই অংশের বর্ণময় হয়ে ওঠা ও পশ্চাদ্দেশ ঘুরিয়ে ধরার অভ্যাসটা প্রথমে পরিবৃত্তি (variation) এবং যৌন নির্বাচন মারফত অর্জিত হয়ে, উত্তরাধিকারমূলক অনুষঙ্গের নীতির পথ বেয়ে, স্বাগত জানানোর বা আনন্দ প্রকাশের লক্ষণ হিসেবে পরবর্তীকালেও বজায় থেকেছে। উত্তরাধিকারমূলক অনুষঙ্গের এই নীতিটিকে বহু ব্যাপারেই সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায়। যেমন, এটা মোটামুটি স্বীকৃত যে পাখিদের গান গাওয়ার ব্যাপারটা মূলত সঙ্গমের মরশুমে একটা আকর্ষণ হিসেবেই কাজ করে, আবার লেক (lek) বা কৃষ্ণবর্ণ জংলি হাঁসেদের (black-grouse) বড় বড় দলে একত্রিত হওয়াটা তাদের প্রেমনিবেদনের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু কয়েক ধরনের পাখিদের, যেমন সাধারণ রবিন পাখিদের, গান গাওয়ার অভ্যাসটা তাদের অন্য সময়ের খুশি প্রকাশ করার জন্যেও বজায় থেকেছে এবং কৃষ্ণবর্ণ জংলি হাঁসেদের বড় বড় দলে একত্রিত হওয়ার অভ্যাসটা বছরের অন্যান্য মরশুমের জন্যও টিকে থেকেছে।

যৌন নির্বাচন প্রসঙ্গে আর-একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করতে চাই আমি। পুরুষ-প্রাণীদের অঙ্গসজ্জার ব্যাপারে আপত্তি তুলে কেউ কেউ বলেছেন—এটা যদি যৌন নির্বাচনের ফল হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সমস্ত স্ত্রী-প্রাণীর রুচিবোধ হুবহু এক এবং তার প্রকাশও এক। কিন্তু, প্রথমত, মনে রাখা দরকার, কোনও প্রজাতির পরিবৃত্তির সীমা অনেক বড় হতেই পারে, কিন্তু কখনোই অনির্দিষ্ট হতে পারে না। অন্যত্র আমি এ-ব্যাপারে ঘুঘুপাখিদের একটা দৃষ্টান্ত পেশ করেছি। প্রকৃতিতে অন্তত একশো রকমের ঘুঘুপাখি দেখা যায় যাদের পরস্পরের গায়ের রঙে বিপুল পার্থক্য থাকে, আবার অন্তত কুড়ি রকমের মুরগি দেখা যায় যাদেরও গায়ের রঙে বিপুল পার্থক্য থাকে, কিন্তু এই উভয় প্রজাতিরই গাত্রবর্ণের বৈচিত্র্যের সীমা পুরোপুরি সুনির্দিষ্ট। তাই স্বাভাবিক প্রজাতিগুলির স্ত্রী-প্রাণীদের সামনে রুচিবোধ গড়ে তোলার অন্তহীন সুযোগ থাকে না। দ্বিতীয়ত, যৌন নির্বাচনের

নীতির সমর্থকরা মনে করেন যে স্ত্রী-প্রাণীরা পুরুষ-প্রাণীদের সৌন্দর্যের বিশেষ কয়েকটি বিষয়কেই বেছে নেয়। একজন পুরুষ-প্রাণীর তুলনায় অপর কোনও পুরুষ-প্রাণীকে দেখে তারা বেশি উত্তেজিত অথবা বেশি আকৃষ্ট হয় এবং এই ব্যাপারটা প্রায়শই নির্ভর করে উজ্জ্বল গাত্রবর্ণের ওপর, বিশেষত পাখিদের ক্ষেত্রে। এমনকী মানবজাতির পুরুষরাও (একমাত্র শিল্পীদের হয়তো বাদ দেওয়া যেতে পারে) তাদের ভালবাসার নারীদের সঙ্গে অন্য নারীদের মুখের আদলের সামান্য পার্থক্যগুলো বিশ্লেষণ করে দেখে না, যদিও মুখের আদলের ওপরেই নির্ভর করে নারীর সৌন্দর্য। পুরুষ-ম্যান্‌ড্রিলদের পশ্চাদ্দেশটাই যে শুধু বর্ণময় হয় তা-ই নয়, তাদের মুখমণ্ডলও চমৎকার বর্ণময় হয়, তাতে থাকে কিছু তির্যক রেখা, হলুদ রঙের দাড়ি এবং আরও কিছু অঙ্গসজ্জা। গৃহপালিত অবস্থায় জীবজন্তুদের মধ্যে সংঘটিত পরিবৃত্তি সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জেনেছি, তার ভিত্তিতে অনুমান করা যেতে পারে যে ম্যান্‌ড্রিলদের উপরোক্ত অঙ্গসজ্জাগুলো একটি ম্যান্‌ড্রিল ক্রমান্বয়ে অর্জন করেছিল অন্য ধরনের কিছু পার্থক্য-সহ। যে-সব পুরুষ-প্রাণীরা কোনও-না-কোনও দিক থেকে স্ত্রী-প্রাণীদের চোখে সবথেকে সুন্দর বা সবথেকে আকর্ষণীয় ছিল, তারাই স্ত্রী-প্রাণীদের সঙ্গে সবথেকে বেশি জোড়বাঁধার সুযোগ পেয়েছে আর তার ফলে অন্য পুরুষ-প্রাণীদের থেকে বেশি সংখ্যক সন্তান-সন্ততি রেখে যেতেও সক্ষম হয়েছে। সুন্দরতর পুরুষ-প্রাণীদের সন্তানরা—তাদের মধ্যে নানারকম আন্তঃমিশ্রণ ঘটা সত্ত্বেও—হয় তাদের জনকদের বৈশিষ্ট্যগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করবে অথবা একই ধারায় পরিবর্তিত হওয়ার একটা ক্রমবর্ধমান প্রবণতা সঞ্চারিত করে দেবে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে। তার ফলে একই অঞ্চলে বসবাসকারী সমস্ত পুরুষ-প্রাণীরা অবিরাম আন্তঃমিশ্রণের প্রতিক্রিয়ায় প্রায় একইভাবে পরিবর্তিত হতে শুরু করবে, তবে এই পরিবর্তনটা কখনও কোনও-একটা বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে একটু বেশি করে ঘটবে, কখনও-বা ঘটবে অন্য-কোনও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে—তবে যাবতীয় পরিবর্তনই ঘটবে অত্যন্ত মন্থর গতিতে। আর এই পুরো প্রক্রিয়াটার ফলে সমস্ত পুরুষ-প্রাণীরাই শেষ পর্যন্ত স্ত্রী-প্রাণীদের কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। যে-প্রক্রিয়াকে আমি মানুষের দ্বারা অসচেতন নির্বাচন নামে চিহ্নিত করেছি এবং যার বেশ কিছু দৃষ্টান্তও উপস্থাপিত করেছি, এই প্রক্রিয়াটাও ঠিক সেইরকমই একটা প্রক্রিয়া। কোনও দেশের লোকেরা হয়তো দ্রুতগামী বা হালকা কুকুর কিংবা ঘোড়াকে বেশি মূল্যবান মনে করে, আবার অন্য কোনও দেশের লোকেরা হয়তো তাগড়াই আর বেশি শক্তিশালী কুকুর বা ঘোড়াকেই বেশি মূল্য দেয়। দু'টো দেশের কোনওটাতেই হয়তো হালকা অথবা তাগড়াই চেহারা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট প্রাণীদের বিশেষভাবে নির্বাচন করা হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশ কিছুদিন পর দেখা যাবে ওইসব প্রাণীরা সেখানকার

মানুষদের পছন্দ অনুযায়ী প্রায় একইভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে—তবে দু'টো দেশে পরিবর্তনটা ঘটবে দু'টো ভিন্ন পন্থায়। সম্পূর্ণ পৃথক দু'টো দেশে যদি একই প্রজাতির প্রাণীরা বসবাস করে, যারা বহু বছরের মধ্যে কখনোই নিজের দেশ থেকে অন্য দেশটিতে যেতে পারেনি এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনওরকম আন্তঃমিশ্রণও ঘটেনি, অধিকন্তু এই উভয় দেশের প্রাণীদের পরিবৃত্তি বা পরিবর্তনগুলি হুবহু একই ধরনেরও ঘটেনি—চিত্রটা এ-রকম হলে যৌন নির্বাচনের ফলে দু'জায়গার পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা দেবে বলেই মনে হয়। আবার একই প্রজাতির কিছু স্ত্রী-প্রাণীকে যদি দু'ভাগে ভাগ করে সম্পূর্ণ পৃথক দু'টো পরিবেশে রাখা হয়, তাহলে দৈহিক অবয়ব, শব্দ বা রঙ সংক্রান্ত রুচির ব্যাপারে দু'টো দলের সদস্যদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা দেওয়াটাও এমন কিছু আশ্চর্য নয়। তা সে যা-ই হোক, আমার 'ডিসেন্ট অফ ম্যান', গ্রন্থে আমি একই অঞ্চলে বসবাসকারী ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত এমন বেশ কিছু পাখির উদাহরণ দিয়েছি যাদের অল্পবয়সী সদস্য আর প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পাখিদের মধ্যে কোনও পার্থক্য চোখে পড়ে না, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ-পাখিদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। খুব সম্ভবত যৌন নির্বাচনের ফলেই এই পার্থক্যগুলো সৃষ্টি হয়ে থাকে।

পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁরা মানুষের চিন্তার জগতে বৈপ্লবিক
পরিবর্তন ঘটিয়েছেন চার্লস ডারউইন
তাঁদের অন্যতম। মানুষের উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তন এবং অন্যান্য
প্রাণীকুলের সাথে তার সম্পর্ক বিষয়ে ডারউইনের তত্ত্ব
আজ আর পরিচিতির অপেক্ষা রাখে না।
তাঁর ঐ-সব যুগান্তকারী সিদ্ধান্তগুলি মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে
তৎকালে প্রচলিত ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে
অবৈজ্ঞানিক ও অসার বলে প্রমাণ করেছিল।
'ডিসেন্ট অফ ম্যান' বইটিতে তিনি মানুষের
উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তনের ধারায় তার বিকাশের বিবরণসমূহ
এবং মানুষের সাথে তার অতিনিকট সম্বন্ধযুক্ত
বিভিন্ন শ্রেণীর বাঁদর ও অন্যান্য
মেরুদণ্ডী প্রাণীকুলের সম্পর্ককে বিচার করেছেন।
সহজ বোধগম্য ভাষায় ঐ সমস্ত বিষয়ের
একটি সামগ্রিক চিত্র তিনি
ফুটিয়ে তুলেছেন এই বইয়ে। আজ থেকে প্রায়
একশ পঁচিশ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল এই বই,
কিন্তু ডারউইনের পর্যবেক্ষণে
এবং আলোচিত বিষয়ের প্রামাণিকতায় কোন ঘাটতি
আজও তেমনভাবে চোখে পড়ে না।
মানব জ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই বই এখনও
নৃতত্ত্ব ও জীববিদ্যা বিষয়ে উৎসাহী পাঠকদের মনোযোগ
সমানভাবেই আকর্ষণ করে থাকে।